KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication কবিতা ভবন, 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher বুদ্ধদেব বসু
Title বৈশাখী	Size 5"x8" 12.70x 20.32 c.m.
Vol. & Number :	Year of Publication ১৩৪৮ ১৩৬৪ || 1957
	Condition : Brittle ✓ Good ✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রতিভা বসু	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

বৈশা[illegible]
বার্ষিকী

বাংলার গ্রীষ্ম বার্ষিকী

প্রথম সংখ্যা, ১৩৪৮

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র
স্থাপিত-১৯৭৮

বুদ্ধদেব বসু
অজিত দত্ত
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
কবিতা-ভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
দাম এক টাকা

[illegible] উন্মত্ত[illegible] [illegible]দিকে স্বদেশে গৃহযুদ্ধ এ[illegible] [illegible] পুড়ছে, তখন ব'সে বেহা[লা] বাজানো ! কি[ন্তু বে]হালা বাজিয়েদের কথা লোকে য[দি শু]নতো তাহ'লে রোম হয়তো পুড়তো না।

আমরা মনে করি বেহালা-বাজানোর কাজটা খুব[ই] দরকার ; এই উন্মাদ ও উন্মর্দ-শাসিত জগতে মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রধান উপায় বেহালায় কান পাতা। ছবি ও কবিতা, গান ও গল্প—এরা আমাদের বাঁচতে শেখায়, আর বাঁচতে না-শিখলে সভ্যতার সমস্ত উপকরণ ব্যর্থ।

অতএব ঘরে আগুন লাগলেও বেহালা যেন না থামে। দল বেঁধে আগুন নেবাবার, তারপর নতুন শান্তির ঘর গড়বার [উদ্দী]পনা, তারই সুর লাগবে ছবিতে গল্পে গানে কবিতায় : যে-কোনো সংকটে, যে-কোনো সর্বনাশের মুখে বেহালা চুপ ক'রে থাকে না, আমাদের মনের কথা বেহালাই আমাদের ব'লে দেয়।

আ[মা]দের এই বৈশাখী বার্ষিকী তাই অবান্তর নয়। [illegible] ভুলে সহজ আনন্দ পাবেন এখানে, আবার ভাববার মতো কিছু কথাও পাবেন আশা করি। 'বৈশাখী' খুশি করতে চায়, কিন্তু শিক্ষা ও সুরুচিকে স্থান দেয় খুশি-হওয়ার উপরে।

'বৈশাখী' বের করার কাজে অনেকেই আন্তরিক সাহায্য করেছেন ; তার মধ্যে শ্রীযুক্ত শম্ভু সাহা ও শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। জ্যোতির্ময়বাবুর অকৃপণ সহযোগিতা না-পেলে 'বৈশাখী'র অনেক দিক দিয়েই অসম্পূর্ণতা থেকে যেতো সন্দেহ নেই। অবশ্য অসম্পূর্ণতা [এ]খনিও হয়তো আছে, কিন্তু তার জন্যে সম্পাদকেরা ছাড়া কেউ দায়ী নয়। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত সুধীর গুপ্ত ও আরো অনেকে—নানাভাবে আমা[দে]র সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকেই ধন্যবাদ [illegible] [illegible]র যে-সব লেখক ও চিত্রশিল্পী তাঁদের বিবিধ [illegible] [illegible]কে গড়েছেন তাঁদের কাছে তো আমরা

THE SARADA [illegible] INSTITUTION
LIBRARY & READING ROOM
CALCUTTA

বৈশাখী, ১৩৪৮

সূচীপত্র

অপরিসমাপ্ত (কবিতা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১
সারদা দাদার সন্ন্যাস (গল্প) প্রমথ চৌধুরী ... [illegible]
তিনটি কবিতা অমিয় চক্রবর্তী ... [illegible]
অবশেষে (কবিতা) জীবনানন্দ দাশ ... ১২
কাঠঠোকরা (নাটিকা) বুদ্ধদেব বসু ... ১৩
সোনালি-রূপালি (গল্প) লীলা মজুমদার ... ৪২
বই (প্রবন্ধ) বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ... ৪৯
ত্রিশঙ্কু (কবিতা) প্রমথনাথ বিশী ... [illegible]
ফাঁদ (গল্প) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ... [illegible]
হাইনে অবলম্বনে (কবিতা) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ... [illegible]
চক্রান্ত ([illegible]) স[ম]র সেন ... ৮০
বিয়ে (নাটিকা) কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ... ৮১
পদ্মনাভ (গল্প) জ্যোতির্ময় রায় ... ৯৪
শোভাযাত্রা (কবিতা) বিষ্ণু দে ... ১০৫
বস্[illegible] („) „ ... ১০৬
মিশ্র-রাগিণী („) বিমলচন্দ্র ঘোষ ... ১০৭
মাধবীর জন্য (গল্প) প্রতিভা বসু ... ১১[illegible]
ব্ল্যাক-আউটে বিপত্তি (গল্প) শিবরাম চক্রবর্তী ... ১৩২
[অ]সময়ে (কবিতা) সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ... ১৩৯
চতুর্দশপদী („) চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১৪২
শেষ বসন্ত („) কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ... [illegible]
চিঠির কথা (প্রবন্ধ) লীলাময় [illegible] ... ১৪৬
ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা (প্রবন্ধ) অজিত দ[ত্ত] ... [illegible]

Poor Copy of Original

রাস্তা (কবিতা)	সুভাষ মুখোপাধ্যায় ...	১৫২
গান („)	বীরেন্দ্রকুমার মল্লিক ...	১৫২
ছোট কবিতা	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ...	১৫৩

আলোচনা

সাহিত্য		
আধুনিক বাংলা সাহিত্য	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ...	১৫৪
ছবি—ছাপের ছবির কথা	রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	১৬৮
সাম্প্রতিক চিত্রকলা	জ্যোতির্ম্ময় রায় ...	১৭২
সঙ্গীত	হিমাংশুকুমার দত্ত ...	১৭৮
থিয়েটার	বুদ্ধদেব বসু ...	১৮০
সিনেমা	জ্যোতির্ম্ময় রায় ...	১৮৫
রেডিও	বুদ্ধদেব বসু ...	১৯০
সংবাদপত্র ও পত্রিকা	অজিত দত্ত ...	১৯৮

চিত্র

Midnight cry	মুকুল দে
নাচ	রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
কাঠখোদাই	সত্যেন্দ্রনাথ বিশী
একটি ছবি	যামিনী রায়
„	নন্দলাল বসু
তিনটি মেয়ের নাচের ভঙ্গি	মুকুল দে
কোপাই নদী	রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

আগামী ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে 'কবিতা'র একটি রবীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা আলোচনা করবেন, তাছাড়া থাকবে সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে কবির নিজের একটি প্রবন্ধ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী, যামিনী রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর, অমিয় চক্রবর্তী, নীহাররঞ্জন রায়, ও আরো অনেকেই এই সংখ্যায় লিখছেন। সংখ্যাটি আকারে প্রায় দ্বিগুণ হবে, দাম হবে এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ,
বালিগঞ্জ, কলকাতা

দোকান রবিবার বন্ধ থাকে এবং অন্যান্যদিন সকাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড আটটা হইতে রাত্রি আটটা ও শনিবার বেলা ২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

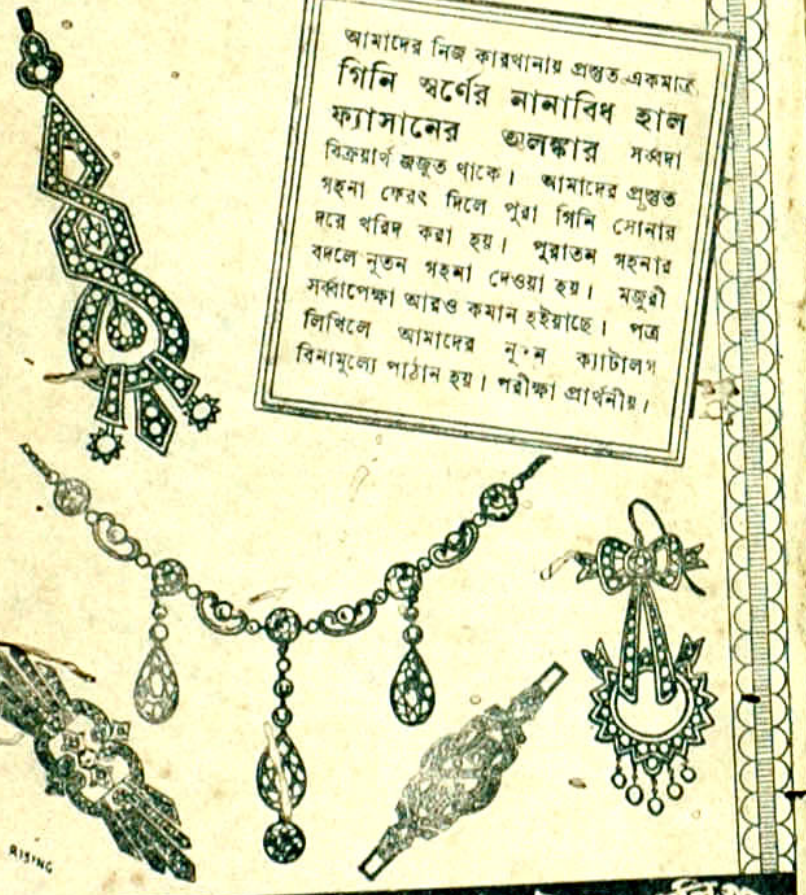

THE SANSKRIT INSTITUTION LIBRARY & READING ROOM CALCUTTA

অপরিসমাপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।
একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে
মোরে এনেছিল বহি
তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে,
দিক হতে যেথা দিগন্তরে
শূন্য নীলিমার পরে শূন্য নীলিমায়
তটকে করিছে অস্বীকার।
সেদিন দেখিনু ছবি অবিচিত্র ধরণীর
সৃষ্টির প্রথম রেখাপাতে
জলমগ্ন ভবিষ্যৎ যবে
প্রতিদিন সূর্যোদয় পানে
আপনার খুঁজিছে সন্ধান।
প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা 'পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম
এখনো হয়নি খোলা আমার জীবন-আবরণ,
সম্পূর্ণ যে-আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।
শুধু করি অনুভব
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে॥

উদয়ন
২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১
বিকাল

সারদা দাদার সন্ন্যাস

প্রমথ চৌধুরী

১

ফার্ষ্ট ক্লাস ভূতের গল্প শোনবার দু'চারদিন পরে সারদা দাদাকে জিজ্ঞেস করলুম "আপনি ভূতের গল্প ছাড়া আর কোনও গল্প কি জানেন না? ভূতের গল্প নিত্য শুনলে তা আর অদ্ভুত ঠেকে না।"

আমার এ প্রশ্নের কারণ—আমার ছোট্‌দা ছিলেন বিজ্ঞপ্রকৃতির লোক। যে গল্পের ভিতর কোনও শিক্ষা নেই, সে গল্প তাঁর মতে বাজে গল্প। ছোট্‌দা পড়তেন শুধু Smilesএর 'Self-help'। ঐ বইটিই ছিল তাঁর বিলেতি হিতোপদেশ।

সারদা দাদা উত্তর করলেন—"আমি ত আর বঙ্কিম চাটুয্যে নই যে, দেশি নি, শুনিনি, এমন গল্প মন থেকে বানিয়ে বলব আর হিজিবিজি জগৎসিংহ লিখব। আমি যা নিজে দেখেছি, তাই তোমাদের শোনাতে পারি। থাকি পাড়াগাঁয়ে, বাঁশ ও বেতের বনে আর জমিদারদের দলে—সেখানে ভূত ছাড়া আর কি দেখব?

"তবে জেল থেকে বেরিয়ে আর একটা বিপদে পড়েছিলুম, তারই গল্প বলতে পারি।" আমি বললুম, "তাই বলুন। মানুষের গল্পমাত্রই ত বিপদের গল্প আর প্রেমের গল্প। আর মাষ্টার মহাশয় আমাদের বলেছেন কারো যেন প্রেমে পড়ো না; কেননা প্রেমে পড়ার মানেই বিপদে পড়া।" ছোট্‌-দা বল্লেন—বিপদের গল্প তিনিও শুনতে চান, কারণ বিপদ কাটাবার একমাত্র উপায় Self-help.

২

ছোট্‌দা অভয় দেবার পর, সারদা দাদা তাঁর বিপদের কথা বলতে সুরু করলেন। তিনি বল্লেন—শ্রবণ করো। আমার অপূর্ব্ব কারাবাসের কথা আর কিছু বলব না। অপূর্ব্ব বলছি এই কারণে যে, কারাবাস ইতিপূর্ব্বে আর কখনো ভোগ করিনি।

সে যাই হোক্, আমার ছেড়বার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, ততই ভয় হতে লাগল; জেল থেকে বেরব কি পরে', এই কথা ভেবে। বর্দ্ধমানে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনুগ্রহ করে' যে পাছাপেড়ে শাড়ীখানা দিয়েছিলেন—যেখানি পরে' জেলে আসি—সেখানি জেলেই চুরি গিয়েছিল। আর জেলের উর্দ্দি ত জেলেই রেখে আসতে হবে। একবার বিবস্ত্র হয়ে রেল থেকে নেবে জেলে গিয়েছিলুম, আবার বিবস্ত্র হয়ে রাজপথে বেরলে পাগলা গারদে যেতে হবে—এই ভয়ে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেল। ভেবেচিন্তে কোনও কূলকিনারা না পেয়ে শেষটা "জেলদার" বাবুর কাছে গিয়ে আমার বস্ত্রের অভাব জানালুম। জেলার বাবুর পিতৃদত্ত নাম জলধর; কয়েদীরা তাঁকে জেলদার বাবু বলেই জানে। জেলদার বাবু অতি সুহৃদয় লোক। তিনি আমার কথা শুনে বললেন—"এর জন্য আর ভাবনা কি? বাড়ী থেকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা আনান, আমার স্ত্রী সব কিনেকেটে দেবেন। কয়েদীদের টাকা আনবার নিয়ম নেই—তাই লুকিয়ে আনতে হবে। আমার স্ত্রী যে-সে স্ত্রী নয়, শিক্ষিতা মহিলা ও হিসেবে পাকা। শুভঙ্করী তাঁর মুখস্থ; আর তা ছাড়া তাঁর রুচিও পয়লা নম্বরের। সাহেব সুবোরাও তাঁর রুচির তারিফ করেন। আমার ধর্ম্মপত্নী আদরিণী আণ্ডরাণীর নামে যেন মনিঅর্ডার আসে।" আমি এ প্রস্তাব শুনে আশ্বস্ত হলুম। কেননা কয়েদীদের মধ্যে আমি জেল-গৃহিণীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলুম। এতদূর প্রিয়পাত্র যে, আমি ভয় পেয়েছিলুম হয়ত তিনি কবে বলে বসবেন—"আবার বলি জেলদার! এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!"—ভয় পাবার কারণ, এই যে, আদরিণী ছিল রূপে বাঁদরিণী।

সুখদাকে চিঠি লিখলুম, টাকা এল। তারপর জেলদার বাবু আমাকে রেলির লাট্টুমার্কা আট-হেতো কোরা ধুতি, জেলেবোনা ঝাড়নের একটি কুর্ত্তা, আর পাঁচহাতি একখানি গামছা এনে দিলেন; সেই সঙ্গে কাশীর একখানি থার্ডক্লাসের টিকিট এবং খোরাকির জন্য চার আনা দিলেন। শিক্ষিতা মহিলার রুচি দেখেই আমার চক্ষুস্থির। তবে বুঝলুম যে, শিক্ষিতা মহিলা স্বয়ং শুভঙ্করী। আর তখন আমার মনে পড়ে গেল যে, আমার সেই ভিক্ষালব্ধ শাড়ীখানি উক্ত শিক্ষালব্ধ মহিলার শ্রী-অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করছে দেখেছি। শুধু নীলবড়ির রঙে ছুপিয়ে তাকে নীলাম্বরী করা হয়েছে।

তারপর দিন ভোরবেলায় কোরা ধুতিখানা লুঙ্গির মত পরে', জেলের

ঝাড়নের কুত্তি গায়ে দিয়ে, গামছাখানি কোমরে বেঁধে, পয়সা চার আনা ট্যাকে গুঁজে, খালি পায়ে ষ্টেশনে গিয়ে উঠলুম। ভাগ্যিস রাস্তায় কোন লোকজন ছিল না। কারণ সেজেছিলুম নীচে মুসলমান, উপরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।

ষ্টেশনে গিয়ে যে গাড়ী সুমুখে পেলুম তা'তেই চড়ে বসলুম। শুনলুম এ গাড়ী কাশী যাত্রা করবে। দেখলুম থার্ডক্লাস কামরা লোকে ভর্ত্তি, সব সাঁওতাল ও বাউরি মেয়ে ও পুরুষ। সবই কয়লার খনির মজুর ও মজুরণী। মেয়েরা আদরিণী আগুরাণীর তুল্য কয়লার মত কালো; আর পুরুষরা জলধর বাবুর মত কদাকার। কি ময়লা তাদের কাপড়, আর কি দুর্গন্ধ তাদের গায়ে। সে যাই হোক, কতক নেবে গেল রাণীগঞ্জে, বাদবাকী আসানসোলে। গাড়ীতে রইলুম শুধু আমি আর অস্থিচর্ম্মসার একটি সাধু বাবাজি—পরণে গেরুয়া ও মাথায় জটা।

তিনি আমাকে বাঙ্গলায় জিজ্ঞেস করলেন—মহাশয় বাঙ্গালী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নাম কি?

—সারদা সান্যাল।

—বাড়ী কোথায়?

—নানা স্থানে। যেখানে যখন থাকি, সেখানেই আমার বাড়ী।

—কি করেন?

—কিছুই না।

—তাহলে আপনি ভবঘুরে?

—হ্যাঁ তাই।

—কোথায় যাচ্ছেন?

—কাশী।

—আস্‌ছেন কোথা হ'তে?

—জেল থেকে।

—জেলে গিয়েছিলেন কি অপরাধে?

—গাঁজা খাই বলে। যদিচ গাঁজা আমি কস্মিনকালেই খাইনি।

—খেলে যেতেন না।

—কেন?

—ত্বরিতানন্দ সেবন করলে সাধু হতেন।—জেলে খুব কষ্ট হয়েছিল?

—সে আর বলতে।

—আপনি ভবঘুরে, নিষ্কর্ম্মা, গৃহহীন,—আপনার পক্ষে সাধু হওয়াই কর্ত্তব্য।

—তাতেও ত বহুকষ্ট।

—মোটেই না।

—কিরকম?

—সাধুর ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।

—সে ভোজন কিদৃশ

—কোনদিন আটা ও ঘী, কোনদিন লঙ্কা ও ছাতু, আর দুধ না চাইতেই পাওয়া যায় মেয়েদের কাছে। আর হট্টমন্দির শ্বশুরমন্দিরের চাইতে ঢের ভাল, আর শ্রীঘরের তুলনায় ত স্বর্গ।

—আপনি কখনো জেলে গিয়েছিলেন?

—পূর্ব্বাশ্রমের কথা বলা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে গৃহস্থাশ্রমমাত্রেই ত জেল, সন্ন্যাসেই মুক্তি।

—পরিবারের মায়া কাটান কি করে?

—"তুমি কার কে তোমার" এই মন্ত্র জপ করে।

—মহারাজের নাম কি?

—গুরুদত্ত নাম ভূমানন্দ, কিন্তু লোকে বলে ধূমানন্দ। এই লৌকিক নামেই আমি পরিচিত এবং ঐ নামই আমি পছন্দ করি।

—কেন?

—ধূম্রলোকই ত আনন্দলোক।

—মহারাজের যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

—কেদারনাথ। যেখানে পর্ব্বত বহ্নিমান ধূমাৎ।

এরপর তিনি ঝুলি থেকে একটি গাঁজার কল্কে বার করে' তা'তে বড় তামাক সেজে, এক টান ধূম পান করে 'ব্যোম ভোলানাথ' বলে চোখ বুজলেন। সে চোখ আর কাশী পর্য্যন্ত খুললেন না। আমি ভাবলুম—আমি গাঁজা না খেয়ে নরকে গেলুম, আর ভূমানন্দ স্বামী বোধহয় খেয়ে সশরীরে স্বর্গে গেলেন! কাশী ষ্টেশনে পৌঁছেই দেখি সুখদার পুরাতন ভৃত্য কাশিমোহন প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে।

কাশিমোহন একটা এক্কা করে' আমাকে বাঙ্গালী টোলায় সুখদার বাড়ীতে নিয়ে গেল। আমাকে দেখেই সুখদা অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠল এবং বল্লে "একি চেহারা, একি সাজ" জেলে আমার মাথা নেড়া করে দিয়েছিল এবং রেখে দিয়েছিল একটি আধ হাত লম্বা টিকি। মাসাবধি দাড়িগোঁফ কামানো হয় নি, তাই ঠোঁটে আর থুতনিতে শুয়োরের কুচির মত চুলগুলো খাড়া হয়েছিল। আর বেশ?—পয়লা নম্বরের রুচিওয়ালী শিক্ষিতা মহিলার রুচির সঙ্গে একটি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা ব্রাহ্মণকন্যার রুচির মিল হল না। সুখদা বললেন "হয় তুমি জেলে ফিরে যাও, নয়ত ও বেশ-ভূষা ত্যাগ করো।" আমি বললুম, "ছাড়তে রাজি আছি, কিন্তু পরি কি?" সুখদা কাশিমোহনকে হুকুম দিল "সান্ন্যাল মহাশয়ের ও-জামা ছিঁড়ে ফেলো, আর কেদারঘাটে গিয়ে দাড়িগোঁফ কামিয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে ভদ্রলোক সাজিয়ে নিয়ে এসো। আর মাথার একটা টুপি কিনে দিয়ো।" আমি আর কোন প্রতিবাদ করলুম না, কেন না সুখদার তখন রাগে হিষ্টিরিয়া হয়েছে। কাশিমোহন সুখদার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে। আমি ভদ্রলোক সেজে ফিরে এসে দেখি সুখদার হিষ্টিরিয়া কেটে গিয়েছে। অনেক দিন পরে সুখদার ওখানে ভূরি-ভোজন করে' অবশ্য তৃপ্তিলাভ করলুম। কিন্তু মাসাবধিকাল জেলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে' তারপর রেলগাড়ীতে ধূমানন্দ স্বামীর পরামর্শ শুনে, আমার মনে ঘোর বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। তাই সন্ন্যাস অবলম্বন করবার মনস্থ করলুম।

বিকেলে আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় কাশীবাসী প্যারীমোহন দাদার ওখানে গেলুম, তাঁর মত নিতে। তিনি ছিলেন একজন মস্ত বড় ফিলজফার।

প্যারীমোহন দাদা বল্লেন যে, "এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। আমিও সন্ন্যাস অবলম্বন করতুম, যদি না আমি ঘোর নাস্তিক হতুম। ভগবান দর্শন করবার যার লোভ নেই, তার পক্ষে সন্ন্যাস বিড়ম্বনা। আমি তোমাকে একটি বিশিষ্ট চতুর ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাব, যাঁর সঙ্গে সাধুদের সঙ্গে দহরম মহরম আছে। তিনিই তোমার দীক্ষার বন্দোবস্ত করে দেবেন। লোকটি নিজে গৃহস্থ হলেও সাধুদের মুরুব্বি। লোকটির নাম রতিলাল মোতিলাল কুলীন ব্রাহ্মণ ও কান্তিলাল কাঞ্জিলালের মাসতুতো ভাই। ছিলেন

পুলিশের বড় কর্ম্মচারী, এখন পেন্সিন্ নিয়ে কাশীতে ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়েছেন। কাঞ্জিলালও পুলিশের একটি লোক—কাশী এসেছেন তদন্তে।"

প্যারীমোহন দাদার সঙ্গে সন্ধ্যার পর রতিলাল মোতিলালজির ওখানে গেলুম। তাঁর ঘর সুসজ্জিত ইংরেজী কায়দায়, সাহেবসুবো প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে বলে'। প্যারীমোহন দাদার কাছে আমাদের আগমনের কারণ জেনে, তিনি আমাকে একনজর ভাল করে' দেখে নিয়ে বললেন—"একে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করা চল্‌বে, কারণ এঁর দেখ্‌ছি ধর্ম্মে মতি আছে।" প্যারীমোহন দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—"কি করে জানলেন?" তিনি উত্তর করলেন—"ওর মুণ্ডিত মস্তক ও দীর্ঘ শিখাই তার প্রমাণ।" তারপর মোতিলালজি ও প্যারীমোহন দাদা উভয়ে ব্র্যাণ্ডি পান করতে সুরু করলেন। প্যারীমোহন দাদা মদ কিনে খান না, কিন্তু অন্যে দিলে ছাড়েন না। আমাকে একপাত্র গলাধঃকরণ করতে মোতিলালজি অনুরোধ করায়, আমি অস্বীকৃত হলুম। তিনি বললেন—"সন্ন্যাসীর একটা না একটা নেশা চাই, হয় গাঁজা, নয় আফিং, নয় সুরা। তা না হলে সন্ন্যাসের নেশা ছুটে যায়। সাদা চোখে ভগবানের দর্শন মেলে না।" প্যারী দাদা বললেন—"লাল চোখে যদি মিলত, তাহলে আপনি আর আমি একদিন না একদিন নিরাকার ভগবানের দর্শন পেতুম"। মোতিলালজি বললেন—"তোমার ও আমার পান তামসিক পান। মন্ত্রঃপূত সাত্ত্বিক পান নয়।"—"তবে আপনি সারদাকে পানানন্দ স্বামীর চেলা করে দিন।" মোতিলালজি উত্তরে বল্‌লেন—"প্যারীমোহন, তুমি ঘোর নাস্তিক। সিদ্ধযোগী প্রাণানন্দ স্বামীকে কিনা পানানন্দ বললে?" "লোক সমাজে ত তিনি পানানন্দ বলেই পরিচিত।" "সে তোমার মত নাস্তিকদের দলেই।" অতঃপর স্থির হল আমি প্রাণানন্দ স্বামীর কাছেই দীক্ষিত হব।

রতিলাল মোতিলালজি অসাধারণ করিৎকর্ম্মা লোক। তার পরের দিনই প্রাণানন্দ স্বামী ওরফে পানানন্দ স্বামী আমাকে দীক্ষা দিলেন। গুরুজি আমার নাম দিলেন, পঞ্চানন্দ ব্রহ্মচারী। কেননা মানুষের ভিতরে আছে পঞ্চ প্রাণ, বাইরে পঞ্চভূত আর পঞ্চ ভূতের সঙ্গে পঞ্চ প্রাণের যোগসাধন করতে হয় পঞ্চমকার দিয়ে। তারপর গুরুজি বললেন, "আমাকে কিছুদিনের জন্য মানস সরোবরে যেতে হবে। ফিরে এসে

তোমাকে সন্ন্যাসের দীক্ষা দেব। তখন তুমি লোটাকম্বলের অধিকারী হবে। যে ক'দিন আমি মানস সরোবরে থাকব, সেই ক'দিন তুমি আমার স্থানাভিষিক্ত থাকবে। তোমাকে প্রতি সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেক শিবনেত্র হয়ে থাকতে হবে অর্থাৎ চোখের তারা উল্টে। তারপর আমার ভক্তদের ধর্ম্মোপদেশ দিতে হবে।" আমি জিজ্ঞেস করলুম "কি উপদেশ দেব?" তিনি বললেন "বর্ণপরিচয় ত পড়েছ, যে সব গুণে গোপাল সুবোধ বালক হয়েছিল, সেই সব গুণের চর্চ্চা করতে উপদেশ দিয়ো। ঐ উপদেশ সদুপদেশের প্রথম ও শেষ কথা।" আমি রাজী হলুম। সেই রাত্তিরেই গুরুজি অন্তর্ধান হলেন।

তার পরদিন আমি বর্ণপরিচয় মুখস্থ করে প্রাণানন্দ স্বামীর আশ্রমে শিবনেত্র হয়ে আসন গ্রহণ করলুম। এমন সময় রতিলাল মোতিলালের মাসতুতো ভাই কান্তিলাল কাঞ্চিলাল জনকতক লাল পাগড়িধারী সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে আমাকে না-বলা-কওয়া গ্রেপ্তার করলেন; হাতে দিলেন হাতকড়া আর পায়ে বেড়ী।

আমার নাম নাকি ঝড়ু তালুকদার ও আমি নাকি লাল খাঁকে হাড়কাঠে ফেলে বলিদান দিয়েছি। তারপর ফেরার হয়ে স্বামীজি হয়ে বসেছি। সেখানে মুন্সিবাবুদের সঙ্গে আর একটি জমিদারের মহা কাজিয়া হয়েছিল। এই কা[illegible] ঝড়ু তালুকদার খুন করে।

আ[illegible] বলবার আগেই মোতিলালজি বললেন "বেটা ত আমাদের বেজায় ঠকিয়েছে।" তারপর বললেন "তোমার কিছু ভয় নেই, আমি তোমাকে জামিনে খালাস করব আর বড় উকিল ভোজপুরী গিরধারী লালকে দিয়ে defend করাবো।"

সেই রাত্তিরেই তিনি খোট্টা হাকিমের বাড়ী গিয়ে আমাকে জামিনে খালাস করলেন, ও জামিন হলেন প্যারীমোহন দাদা। তারপর আমরা হাকিমের বাড়ী থেকে উকিলের বাড়ী গেলুম ও তাকে সঙ্গে নিয়ে সুখদার বাড়ী চললুম। উকিলবাবুর বিশাল বপু, গলার আওয়াজও তদ্রূপ। মামলার বিবরণ শুনে তিনি বললেন যে আমাকে খালাস করা কঠিন, এর জন্য ঢের তকলিফ করতে হবে। তার ফী ৫০০ টাকা ও হাকিমের বকসিস্ আর ৫০০ টাকা। এ টাকা না দিলে আমার নিশ্চয়ই ডবল ফাঁসি হবে।

প্যারীমোহন দাদা জিজ্ঞেস করলেন—"ডবল ফাঁসির মানে কি?"

উকিলবাবু চটে জবাব দিলেন "আইনের কথা তোমরা কি বুঝবে?"

সুখদা পরদার আড়াল থেকে সব শুনছিল। সে বললে "আমি এক টাকাও দেব না। তুমি নিজে মামলা চালাও। তুমি ত জমিদারদের তরফ থেকে চিরকালই মামলার তদ্বির করেছ। ঐ ছাতুখোর নিবুদ্ধি উকিলের চাইতে তুমি মামলা ঢের ভাল চালাতে পারবে।"

প্যারীমোহন দাদাও সুখদার সঙ্গে সায় দিলেন ও বল্লেন—"বেটা বলে কি না ডবল ফাঁসি! ওকে মারতে হলে অবশ্য ডবল ফাঁসি দিতে হত। একবার ফাঁসি ছিঁড়ে পড়বে, তারপর ওকে তুলে আর একবার ঝোলানো হবে।"

অগত্যা আমাকে self help-ই অবলম্বন করতে হল। গিরধারী মহা রেগে চলে গেলেন এই বলে' যে—বাঙ্গালী লোক বহুত বেওকুফ আওর বখিল হয়।

পরদিন এগারোটায় আদালতে হাজির হলুম—আমি, মোতিলালজি ও প্যারীমোহন দাদা। গিয়ে দেখি গিরধারী উকিল সেখানে বসে আছেন। কান্তিলাল কাঞ্চিলাল আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী তিনজন খাড়া করেছিলেন,—ভাগ্নে ও চুলপাকা দু'জন লেঠেল। ভাগ্নে যে বাড়ীর দৌহিত্র, আমি সেই বাড়ীরই দৌহিত্রের দৌহিত্র। আর লেঠেল দু'জনেই আন্দামান ফেরৎ। একজন লালখাঁর মামাতো ভাই, অপরটি তাঁর সাকরেদ। প্রমাণ হল, উক্ত কাজি[illegible]লখাঁর গলা কাটা গিয়েছিল। কিন্তু কে কেটেছে কেউত তা স্বচক্ষে দেখে[illegible]। ভাগ্নে শুধু পরের মুখে শুনেছেন। আর লেঠেল দুটি বললে তারা লালখাঁর কাটা মুণ্ডু দেখেছে, কিন্তু সে কাটা মুণ্ডু কোনও কথা কয় নি।

আর প্রমাণ হল তখন আমি সবে জন্মেছি, আর আমি ঝড়ু তালুকদার ওরফে প্রাণানন্দ স্বামীও নই। হাকিম বললেন যে facts সবই আমি যে নির্দোষ তাই প্রমাণ করে। গিরধারী লাফিয়ে উঠে বললেন যে, আপনার কথায় একটিও law-point নেই। হাকিম এতয়ারী তেওয়ারী বল্লেন "কেঁও নেহি হয়? এ মামলা তামাদি হো গিয়া।"

ভোজপুরী গিরধারী বল্লে "তামাদি হো নেই সক্তা। ইসকো ফাঁসিকা হুকুম দিজিয়ে।"

তারপর উকিলে ও হাকিমে তাম্মাদির আইনের মহাতর্ক বাধল।

সে তর্কের কথা আর বলব না। কেননা তার কোনও মাথামুণ্ডু ছিল না। তারপর প্যারীদাদার পরামর্শে আমি বল্লুম "হুজুর ভোজপুরী গিদ্ধড় চিল্লাতা কেউ?" উকিল বল্লেন "হাম গিদ্ধড় নেই, সিংহ হ্যায়।" আমি বল্লুম "হো সক্‌তা, মগর সরকারকো ওকিল ত নেহি হ্যায়।" হাকিম বল্লেন "এ বাৎ ঠিক," এবং আমাকে বেকসুর খালাস দিলেন।

এ গল্প শুনে ছোটদা খুসি হলেন, কারণ এর ভিতর বিপদও আছে; self-help ও আছে। মা বল্লেন "এ গল্প আগাগোড়া মিথ্যে।"

কাঠখোদাই : সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

তিনটি কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

পার্থিব

বিশুদ্ধ একখানি নলিনীচন্দ্র পাকড়াশি
মাছ বা ল্যাংড়া আম
আধুনিক কৃষ্ণ বাজায় ফ্লুটের বাঁশি
এই সব বাস্তব সত্যের পরিণাম।

জাপানী খদর, স্বদেশী বোমারুর উদয়,
আবার স্বাধীন মেয়ে, ধর্ম্মঘট,
চাপা-পড়া কুলিকে গুলি, সুনিশ্চয়
ঝিমন্ত দেশে ভালো সঙ্কট।

অপার্থিব কী তা কেউ জানে না
ক্ষতি নেই : বাহিরে সুন্দর রোদ্দুর,
মন্দিরের মধ্যে রাহুড়, পাণ্ডা,—বাঁচা যদ্দুর
দোকানের দাওয়ায় ব'সে দেখে নে না॥

খোলা চোখেই

ইলেকট্রিক পাখার হাওয়া ভালো লাগচে না
বাহিরের হাওয়া গরম
দেহ আর মন কিসে খুসি হবে কি হবে না
পারিনে ভাবতে—সাধ্যের চরম

পৌঁছিয়ে কেউ যোগ করে, পেন্সুইন বই নিয়েও
সমাধির ব্যবস্থা : বৃত্তান্ত
পড়ো শীতে কাফ্রি মরু, গরমে মেরু, নিতান্ত
মন্দ নয় আত্মারাম দু' আনা দিয়েও॥

বিলম্বিত

যার-ঠিকানা খাতায় লেখা
হয়তো আজ নেই বেঁচে,
অন্য একটা যুগের চেনা অক্ষর
হঠাৎ অত্যন্ত আপন হয়েচে।

অনেকের নাম-ঠিকানা সুদ্ধ বইটা
নিজের হাতে গঙ্গার জলে ডুবোই
উট্রাম-ঘাটে চা খেয়ে উঠে
—স্বেচ্ছাবিদায় একে বলে নিশ্চয় ॥

অবশেষে

জীবনানন্দ দাশ

এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ।
সবুজ পাতার পরে যখন নেমেছে এসে দুপুরের সূর্য্যের আঁচ
নদীতে স্মরণ করে একবার পৃথিবীর সকালবেলাকে।
আবার বিকেল হ'লে অতিকায় হরিণের মত শান্ত থাকে
এইসব গাছগুলো ;—যেন কোনো দূর থেকে অস্পষ্ট বাতাস
বাঘের ঘ্রাণের মত হৃদয়ে জাগায়ে যায় ত্রাস ;
চেয়ে দেখ—ইহাদের পরস্পর নিমীল বিন্যাস
ন'ড়ে ওঠে ত্রস্ততায় ;—আধো নীল আকাশের বুকে
হরিণের মত দ্রুত ঠ্যাঙের তুরুকে,
অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে তারা বটে ;—
(একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে ;)—
তবুও বাঘিনী হয়ে বাতাসকে আলিঙ্গন করে—
সাগরের বালি আর রাত্রির নক্ষত্রের তরে।

কাঠঠোকরা

বুদ্ধদেব বসু

চরিত্র :

সুমন্ত্র
সত্যবান
মল্লিকা

প্রথম অঙ্ক

সুমন্ত্র ও মল্লিকা

[পাতার মরমর শব্দ আর তার সঙ্গে পাখির ডাক]

সুমন্ত্র। মল্লিকা!……মল্লিকা!

মল্লিকা (দূর থেকে)। কী—ঈ ?

সুমন্ত্র। শোনো।

মল্লিকা (কাছে এসে)। কেন ডাকছো ?

সুমন্ত্র। এমনি।

মল্লিকা। এমনি ?

সুমন্ত্র। এমনি ডাকতে নেই ?

মল্লিকা। মিথ্যে ক'রেই না-হয় একটা কারণ উদ্ভাবন করতে।

সুমন্ত্র। উদ্ভাবন না-ক'রেও কারণ দেখাতে পারি। তোমাকে ডাকতে ভালো লাগে। আর তাছাড়াও যদি কারণ শুনতে চাও, এই গোলাপফুলটা দেখবার জন্যে ডেকেছি।

মল্লিকা। বাঃ, কী সুন্দর! তোমার এত বড়ো বাগানে ওর চেয়ে সুন্দর ফুল আজ অন্তত নেই।

সুমন্ত্র। আমার বাগান নয়, তোমার।

মল্লিকা (একটু পরে)। এখানে এসে কী যে ভালো লাগছে কী বলব।

সুমন্ত্র। সত্যি ? আমি তো ভেবেছিলুম এই অফুরন্ত নির্জনতায় তুমি ছাড়া আর কারো মন টিকবে না।

মল্লিকা। কী যে বলো! এই ঢেউ-খেলানো মাঠ আর ছবির মতো সানো গাছ পালা আর দূরে আঁকাবাঁকা নীল পাহাড়—এর চেয়ে সুন্দর কিছু আছে নাকি! আর তাছাড়া—

সুমন্ত্র। তাছাড়া?

মল্লিকা। তাছাড়া এই অফুরন্ত নির্জনতা।

সুমন্ত্র। এই নির্জনতা তোমার ভালো লাগে?

মল্লিকা। তোমার লাগে না?

সুমন্ত্র। আমি তো ভেবেছিলুম তুমি বুঝি দু' দিনেই হাঁপিয়ে উঠবে। কথা বলবার লোকের মধ্যে তো আবদুল, লছমন সিং, আর আমি।

মল্লিকা। ওঃ, খুব বিনয় শিখেছো দেখছি!

সুমন্ত্র। তবে কি দাম্ভিক হ'তে বলো? বিশ্বাস করো, আমার সৌভাগ্য আমার নিজেরই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি কখনো ভাবতে পারিনি যে তুমি—

মল্লিকা। থাক্, থাক্, এ-কথা অনেকবার শুনেছি তোমার মুখে। আশা করি তেরোই বৈশাখের পর থেকে আর শুনতে হবে না।

সুমন্ত্র। তেরোই বৈশাখ!...এক-এক সময় মনে হয় ঐ দিনটি যত দেরি ক'রে আসে ততই ভালো। যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে আছি। কেবলই ভয় হচ্ছে স্বপ্ন ভেঙে যায়।

মল্লিকা। স্বপ্ন ভেঙে যাবে, এ-রকম আশঙ্কা তোমার হচ্ছে নাকি?

সুমন্ত্র। ভয় আমার নিজেকেই।

মল্লিকা। তার মানে—তোমার মন এখনো বদলাতে পারে?

সুমন্ত্র। না, তা নয়। ভয় এই যে পাছে আমার অযোগ্যতা তোমার চোখে ধরা প'ড়ে যায়।

মল্লিকা। ছ্যাখো, এ-সব কথা তুমি আর কখনো বলবে না আমার কাছে।

সুমন্ত্র। বেশ, তবে আর বলবো না। সেদিন তোমাকে যখন আংটি পরিয়ে দিই, কী মনে হচ্ছিলো জানো?

মল্লিকা। কী?

সুমন্ত্র। মনে হচ্ছিলো, চুপ ক'রে থেকেই সব চেয়ে গভীর কথাগুলো বলা যায়।

মল্লিকা। আংটিটা তোমার মা-র—না?

সুমন্ত্র। হ্যাঁ, তোমার জন্যেই তিনি রেখে গিয়েছেন।

মল্লিকা। কত বড়ো হীরে! অনেক দাম আংটিটার?

সুমন্ত্র। ওর সব চেয়ে বড়ো দাম এই যে তোমার আঙুলকে জড়িয়েছে।

মল্লিকা। তোমার মাসিমা বলছিলেন যে এর পাঁচ হাজার টাকা দাম?

সুমন্ত্র (উদাসীনভাবে)। তা হবে।

[একটু চুপচাপ। আবার পাখির ডাক]

মল্লিকা। কী পাখি ওটা?

সুমন্ত্র। কোন্‌টা?

মল্লিকা। ঐ শোনো।

[একটু পরে—আবার পাখির ডাক]

সুমন্ত্র। দোয়েল।

মল্লিকা। সত্যি-সত্যি দোয়েল ব'লে পাখি আছে তাহ'লে? আর ঘুঘু ডাকেও! ঘুঘুর ডাকও এখানে এসে প্রথম শুনলুম।

সুমন্ত্র। আর কাঠঠোকরা

মল্লিকা। হ্যাঁ—অদ্ভুত পাখি! দুপুরবেলা, সমস্ত পাখির ডাক যখন থেমে যায়, তখন আরম্ভ হয় ওর ঠুকঠুক অধ্যবসায়। সমস্ত দুপুরবেলাটা যেন ওরই একচেটে সম্পত্তি।

সুমন্ত্র। তুমি বুঝি পশুপাখি খুব ভালোবাসো?

মল্লিকা। ভালো যে বাসি তা তো এতদিন জানতুম না। এখানে এসে দেখছি পশু, পাখি, পাছপালা—এরা সকলেই আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত। এ যেন এক নতুন রকমের বাঁচা। তোমাকে সত্যি বলছি, এত সব বিখ্যাত জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু রাঁচি থেকে ছত্রিশ আর হাজারিবাগ থেকে চব্বিশ মাইল দূরে—

সুমন্ত্র। ভুল বললে। রাঁচি থেকে বিয়াল্লিশ আর হাজারিবাগ থেকে আঠারো মাইল। এ-বাড়ির সামনেই একটা মাইল-পোস্ট আছে।

মল্লিকা। সে যাক্‌গে। কথাটা এই যে তোমার এই রজতরূপায় এসে যত ভালো লাগছে, এত ভালো আর কোথায় লাগেনি। এখানে সবই

সুন্দর। বেঁচে থাকা যে এত অর্থময় কলকাতার হট্টগোলে কোনোদিন আগে বুঝিনি। দ্যাখো, কলকাতায় আমরা আর না-ই ফিরলাম। এখানেই থাকি।

সুমন্ত্র। তুমি যদি বলো এখানেই আমরা থাকবো। কিন্তু তোমার ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকবে না।

মল্লিকা। ফাঁকা ঠেকবে কেন? তুমিই তো আছো।

সুমন্ত্র। অবশ্য তেরোই বৈশাখের জন্য একবার কলকাতায় যেতে হবে।

মল্লিকা (একটু পরে)। আর ঠিক একুশ দিন বাকি আছে।

সুমন্ত্র। ম্যানেজারবাবু লিখেছেন অন্তত চার-পাঁচদিন সময় হাতে রেখে আমাদের ফেরা দরকার।

মল্লিকা। কেন, ঠিক আগের দিন পৌঁছলেও তো চ'লে। এ-নির্জনতা যতদিন পারি ভোগ করতাম।

সুমন্ত্র। এ তো রইলোই।

মল্লিকা। তবু। সমস্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে কোথায় যেন চলে এসেছি, এই বিস্ময়ের ভাবটাই এখনো আমার কাটেনি। মনে হচ্ছে, অনেক অনেক বছরেও রজতরূপা আমার কাছে পুরোনো হবে না। ঠিক এইভাবেই যদি সারাজীবন কাটতো ···তোমার কে না এক বন্ধুর আসবার কথা দু' একদিনের মধ্যে?

সুমন্ত্র। হ্যাঁ, আমার এক বন্ধুকে আসতে লিখেছিলুম। তুমি কি তার জন্যে রাগ করেছো?

মল্লিকা। এমনিই তো বেশ ছিলুম।

সুমন্ত্র। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না তোমার।

মল্লিকা। না, না, অসুবিধের কথা নয়।

সুমন্ত্র। আমার বন্ধু অসাধারণ লোক, তার সঙ্গে আলাপ ক'রে খুসি হবে। পাছে তোমার একঘেয়ে লাগে, সেইজন্যেই আমি আরো···

মল্লিকা। আসল কথা, তোমারই আর একজন সঙ্গীর দরকার। কেবল আমার সঙ্গে কথা ব'লে সময় আর কাটছে না!

সুমন্ত্র। সত্যবান নিজেই একবার লিখেছিলো আসবে, তাই আমি ভাবলুম···

মল্লিকা। থাক্, আর জবাবদিহি দিতে হবে না। ···কী নাম বললে তোমার বন্ধুর?

সুমন্ত্র। সত্যবান।

মল্লিকা। পুরো নাম কী?

সুমন্ত্র। সত্যবান দত্ত। ও-নামের কাউকে চেনো নাকি?

মল্লিকা (ক্ষীণস্বরে)। কী যেন, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে নামটা।

সুমন্ত্র। আমি ওকে অনেকদিন থেকেই বলছিলুম এখানে একবার আসতে, সময়ই হয় না ওর। এবারে বলছিলো···আমি তাই ভাবলুম···

মল্লিকা। কী আশ্চর্য! এত কথা বলছো কেন? আমি ভেবেছিলুম আমাকে হ'লেই তোমার চলে। ভুল ভেবেছিলুম। কোনো পুরুষেরই তা চলে না।

[একটু চুপচাপ]

সুমন্ত্র। মল্লিকা!

মল্লিকা। উঁ।

সুমন্ত্র। চলো ঘরে যাই। চা খাবে না?

মল্লিকা। চলো···তোমার বন্ধু কবে আসবে?

সুমন্ত্র। তুমি এ নিয়ে এত ভাবছো কেন, মল্লিকা? সমস্ত জীবন তো আমাদেরই প'ড়ে রয়েছে। আমরা কি এতই কৃপণ যে দু'দিনের জন্যেও আর একজনকে জায়গা দিতে পারবো না?

মল্লিকা (শুষ্ক একটু হেসে)। কী করবো, স্বভাবতই আমি কৃপণ, আমি হিংসুক।

সুমন্ত্র (সরলভাবে হেসে)। দুঃখের বিষয়, হিংসে করবার কোনো লোক নেই। আর তাছাড়া, সত্যবান এক চমৎকার মানুষ যে ও এলে তোমার নির্জনতা একটুও ভাঙবে না, অথচ আড্ডার সময় আড্ডা জমবে।

মল্লিকা। তুমি তোমার বন্ধুর একজন ভক্তও দেখছি!

সুমন্ত্র। তা বলতে পারো।

মল্লিকা। কী করেন ভদ্রলোক?

সুমন্ত্র। কথাটা যদি সাংসারিক অর্থে জিজ্ঞেস ক'রে থাকো, অর্থাৎ, কত

টাকা সে রোজগার করে, তা যদি জানতে চাও তাহ'লে সে বিশেষ-কিছু করে না।

মল্লিকা। আর অন্য অর্থে?

সুমন্ত্র। অন্য অর্থে সে খুব বড়ো কাজ করে—কবিতা লেখে।

মল্লিকা। সংসার কী ক'রে চলে?

সুমন্ত্র। সংসার বলতে ওর কিছু নেই।

মল্লিকা। কবি বুঝি বিয়ে করেননি?

সুমন্ত্র। কোথায় আর!

[দূরে মোটরের শব্দ]

মল্লিকা। তোমার সঙ্গে ভদ্রলোকের অনেকদিনের আলাপ বুঝি?

সুমন্ত্র। তা বছর দশেক হবে।

মল্লিকা। তাহ'লে তো খুবই পুরোনো বন্ধু তোমার। কলকাতাতেই আলাপ?

সুমন্ত্র। ছাত্রাবস্থা থেকেই। একেবারে পাগল—গবর্মেণ্টের একটা চাকরি পেয়েও নিলে না!

মল্লিকা। বিয়ে করলেই মাথা ঠাণ্ডা হবে।

সুমন্ত্র। দেখা যাক্।

মল্লিকা। এতদিনেও বিয়ে করেননি, দু'একবার হৃদয় ভাঙে-টাঙেনি তো? কবি মানুষ—কিছু বলা যায় না।

সুমন্ত্র। ভেঙে থাকলেও তো আর আমাকে বলবে না!

মল্লিকা। কেন, এত না অন্তরঙ্গ বন্ধু!

সুমন্ত্র। ওরে বাবা—ভীষণ চাপা!

[মোটরের শব্দ আর একটু কাছে]

সুমন্ত্র। মল্লিকা!

মল্লিকা (অন্যমনস্কভাবে) উঁ?

সুমন্ত্র। চলো চা খাওয়া যাক্।

মল্লিকা (একটু পরে)। উঁ? কী বললে?···হ্যাঁ, চলো।

সুমন্ত্র। একটু দাঁড়াও। গাড়িটা আমাদের বাড়ির দিকেই আসছে না?

মল্লিকা। তা-ই তো মনে হচ্ছে।

[গাড়ি ঢোকবার ও থামবার শব্দ]

সুমন্ত্র। আরে! সত্যবান! সত্যবান এসেছে!

[গাড়ির দরজা খোলার শব্দ]

সুমন্ত্র। সত্যবান! আমি ভেবেছিলুম তুমি কাল কি পরশু আসবে।

সত্যবান। আজই এলুম। তোমার চিঠি পেয়েই একেবারে হাওড়া ইষ্টিশান।

সুমন্ত্র। জিনিসপত্র কোথায় তোমার?

সত্যবান। এই যে বাক্স।

সুমন্ত্র। আর?

সত্যবান। এই তো। বিছানা একটা দিতে পারবে না?

সুমন্ত্র। তা পারবো।···মল্লিকা, এঁর কথাই বলছিলুম তোমাকে। আমার বন্ধু সত্যবান···

সত্যবান। বাঃ, এঁর সঙ্গে আবার পরিচয় করিয়ে দেবে নাকি? কী মল্লিকা, কেমন আছো?

সুমন্ত্র। আমি তো জানতুম না যে তোমরা পরিচিত।

সত্যবান। আর তুমিও বেশ লোক বাপু, কাকে বিয়ে করছো তা বলতে হয় না! বেশ, খুব সুখী হলাম। হ্যাঁ, সুমন্ত্র, ট্যাক্সিভাড়াটা দিয়ে দাও তো। দশ টাকা।

সুমন্ত্র। একটা তার করতে যদি, আমার গাড়িটাই পাঠিয়ে দিতুম স্টেশনে।

সত্যবান। ভেবেছিলুম বাস্-এই আসবো। তারপর ভাবলুম সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে এমন সুন্দর দৃশ্য ভালো ক'রে দেখতে পাবো না!

সুমন্ত্র। তাছাড়া বাস্-এ বড্ড কষ্ট।

সত্যবান। কষ্ট তোমার হ'তে পারে, আমার হ'তো না। আমার পক্ষে ট্যাক্সিতে আসা হ'লো আরাম—বাবুগিরি—বিলাসিতা—যা বলো! এত বড়ো একখানা গাড়িতে এতখানি রাস্তা একা-একা আসতে বেশ লাগছিলো। ইস্—'জয়ন্তী'র সম্পাদক ব্রজগোপালটা একবার দেখলে না! দেখলে বুঝতো আমি একটা যে-সে লোক নই, দস্তুরমতো রাঁচি-হাজারিবাগ

রোডে মোটার হাঁকিয়ে চলিও আর ও তো বোধ হয় হাওড়া পুল পেরোয়নি কোনোদিন।

সুমন্ত্র। চলো ঘরে। ট্যাক্সিভাড়াটা চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলেই হবে!

সত্যবান। চলো।···সুমন্ত্র, তুমি তো দেখছি বিরাট একটি ভণ্ড। সর্বদাই বলতে, ছোটোখাটো একটি বাড়ি আছে রজতপ্রায়। বাড়ি! এ যে দেখছি প্রাসাদ! আর কী বাগান! কী গাছপালা! কী ফুল! এ তো স্বর্গ।

সুমন্ত্র (লজ্জিতভাবে) থামো তুমি, সত্যবান। চলো ভিতরে।

সত্যবান। ক'টা ঘর আছে তোমার বাড়িতে? কুড়িটা?

সুমন্ত্র (একটু হেসে)। তা দশ-বারোখানা হবে। আমার কী দোষ, বলো—ঠাকুরদা ক'রে গেছেন—

সত্যবান। বাঃ, আমি কি তোমার দোষ বলছি! ভাগ্যিস তোমার ঠাকুরদা কিছু বিষয়সম্পত্তি রেখে গেছলেন, তাই তো তুমি আজ পায়ে পা তুলে মহা আরামে দিন কাটাচ্ছো, আর আমিও তোমার এই বাড়িতে এসে স্বর্গসুখ অনুভব করছি। পৃথিবীতে বড়োলোকও কিছু থাকা দরকার—কী বলো, মল্লিকা?

সুমন্ত্র। মল্লিকা, আমি যদি জানতুম যে তুমি সত্যবানকে চেনো—

মল্লিকা। আমি—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

সত্যবান। অনেক আগে—ওদের বাড়িতে আমি মাঝে-মাঝে যেতুম। মল্লিকার দাদা যে-ফিল্ম কোম্পানির ডিরেক্টর, তার জন্যে একটা গল্প লিখেছিলুম সেবার। মল্লিকার কি আর সে-কথা মনে আছে! আমাকে দেখে চিনতে পেরেছিলে?

মল্লিকা। পেরেছিলুম।

সত্যবান। তুমি কেমন আছো তা তো বললে না।

মল্লিকা। ভালো আছি। আপ্—আপনি কেমন আছেন?

সত্যবান। কেমন দেখছো? বুঝলে, সুমন্ত্র, ঐ ভিটামিন-বি ফুডটা খেয়ে রীতিমতো উপকার পাচ্ছি। চেহারা আমার ভালো দেখছো না একটু?

সুমন্ত্র। চেহারা তো তোমার বরাবরই ভালো।

সত্যবান (খুসি হ'য়ে)। বেশ ভালোই দেখছো তাহ'লে! একটা মল্ট-এক্সট্র্যাক্ট খেলে বোধ হয় আরো ভালো হয়।

সুমন্ত্র। আপাতত তোমার ওর চেয়ে ভারি কোনো খাদ্যের দরকার, নয়?

সত্যবান। নিশ্চয়ই! দারুণ খিদে পেয়েছে। কী খাওয়াবে চায়ের সঙ্গে? ডিম, রুটি-মাখন-মার্মলেড, আর চীজ, কী বলো? মল্লিকা, তুমি কি এখন থেকেই সংসার চালাচ্ছো?···ঐ যাঃ, সুমন্ত্রর যে দশজন চাকর রাখবার ক্ষমতা আছে, আর তোমাকে যে কিছুই করতে হবে না, তা ভুলেই গিয়েছিলাম। বিয়ে কবে?

সুমন্ত্র। আর একুশ দিন পরে।

সত্যবান। সুখী হলাম, খুব সুখী হলাম।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[তিন দিন পরে]

সুমন্ত্র ও মল্লিকা

সুমন্ত্র। বেড়াতে যাবে না?···মল্লিকা, বেড়াতে যাবে না?·· মল্লিকা!

মল্লিকা। (চাপা রাগের সুরে) না, যাবো না।

সুমন্ত্র। সে কী! তুমিই তো বলেছিলে—

মল্লিকা। যখন বলেছিলুম, বলেছিলুম।

সুমন্ত্র। সত্যি যাবে না?

মল্লিকা। না।

সুমন্ত্র। রাগ করেছো?

মল্লিকা। আমি রাগ করলে তোমার কী এসে যায়?

সুমন্ত্র। কেন রাগ করেছো তা জানতে পারলে প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারি।

মল্লিকা! থাক্ থাক্, আর ভালোমানুষিতে কাজ নেই।

সুমন্ত্র। ধামাই জঙ্গলের ধারে বেড়াতে যাওয়া তোমারই তো সখ।

মল্লিকা। আর সখ নেই।

সুমন্ত্র। লক্ষ্মী তো! চলো, নয়তো সত্যবান কী মনে করবে!

মল্লিকা। (ঘুরে উঠে) উনি কী মনে করবেন সেই ভেবে আমাকে চলতে হবে নাকি?

সুমন্ত্র। এ নিয়ে তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন, মল্লিকা? এ তো সাধারণ ভদ্রতার কথা।

মল্লিকা। বেশ তো, তোমার বন্ধু, তুমি ভদ্রতা করো। আমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছো কেন?

সুমন্ত্র। কী আশ্চর্য—

মল্লিকা। হ্যাঁ, আশ্চর্যই! তুমি তোমার বন্ধুর যে-রকম অনুগত সেটাই আশ্চর্য। পারলে বোধ হয় পুজো করো। সত্যবান দত্তকে তুমি দেবতা মনে করো—না?

সুমন্ত্র। কী-সব বলছো!

মল্লিকা। সত্যি কথা বলছি। সারাটা দিন তো ওর সঙ্গেই আছো। আমি যে এ-বাড়িতে আছি তা কারো মনেই পড়ে না।

সুমন্ত্র। ওকে বাদ দিয়ে তুমি আর আমি গল্প করবো তা কি ভালো দেখায়? তুমিই বলো!

মল্লিকা। বেশ তো, যা ভালো দেখায় তা তো করছোই। কিন্তু এই যদি তোমার মনে ছিলো তাহ'লে আমাকে এখানে আনলে কেন?

সুমন্ত্র। তুমি কী বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।

মল্লিকা। কেমন ক'রে বুঝবে? যদি বুঝতে তাহ'লে কি আর এই দিনগুলোর মধ্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে ঢুকতে দিতে! নষ্ট হ'লো, নষ্ট হ'লো এই সোনার দিনগুলি!

সুমন্ত্র (একটু পরে)। আমি কিন্তু ভেবেছিলুম ও এলে তোমারও ভালো লাগবে।

মল্লিকা। তুমি ভুলে গিয়েছিলে উনি তোমারই বন্ধু, আমার বন্ধু নন্।

সুমন্ত্র। কেনই বা নয়? তুমি তো ওকে আগে থেকেই চিনতে।

মল্লিকা। ছোঃ! ও-রকম চেনা কত লোকের সঙ্গেই হয়।

সুমন্ত্র। তবু—চিনতে তো। আর এখন আমার সূত্রে পরিচয় আরো ঘনীভূতই হওয়া উচিত।

মল্লিকা। বিয়ের এটা একটা সর্ত নাকি?

সুমন্ত্র। সত্যবান সম্বন্ধে তোমার মনে যদি বিরুদ্ধভাব থাকে, সেটা আমার পক্ষে দুঃখের কথা বইকি।

মল্লিকা। কী করবে তাহ'লে? বিয়ে ভেঙে দেবে? সত্যবানবাবু বললে তুমি বোধ হয় তাও পারো।

সুমন্ত্র। নাঃ, সত্যি তোমার মাথা-খারাপ হ'য়ে গেছে।…তবু, আমার একটা কথা তুমি রাখো। বাইরের ভদ্রতাটা যেন অন্তত বজায় থাকে।

মল্লিকা। ভদ্রতা সম্বন্ধে কী তোমার ধারণা, শুনি?

সুমন্ত্র। এ-পর্যন্ত সত্যবানের সঙ্গে তুমি বোধ হয় চার-পাঁচটার বেশি কথা বলোনি।

মল্লিকা। দরকার বোধ করিনি।

সুমন্ত্র। এমনকি, চুপচাপ খাওয়া শেষ ক'রে তক্ষুনি উঠে যাও, সারাদিন নিজের ঘরেই বন্ধ হ'য়ে থাকো, আমাদের কোনো গল্পে, কোনো কথায় যোগ দাও না। ওতে কি সত্যবান মনে-মনে একটু দুঃখিত হ'তে পারে না?

মল্লিকা। দুঃখিত হ'লে আমি কী করতে পারি?

সুমন্ত্র। তার উপর আজ যদি বেড়াতে না যাও—

মল্লিকা। তুমি যতই বলো, কিছু-তেই আমি যাবো না।

সুমন্ত্র। তাহ'লে…

মল্লিকা। তুমি যাও না। আমার মন রক্ষা করবার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে না-থাকলেও চলবে।

সত্যবান। (চেঁচিয়ে—বাইরে থেকে) সুমন্ত্র!

সুমন্ত্র। এই যে।

সত্যবান (বাইরে থেকে)। তোমার নতুন রেজার ব্লেড আছে?

সুমন্ত্র। আমার ড্রেসিং টেবিলের বাঁ দিকের দেরাজে পাবে।

সত্যবান। আচ্ছা।

(একটু চুপচাপ)

মল্লিকা। যাও, বন্ধুর আর কী-কী দরকার দেখে এসো।

সুমন্ত্র। ওর যা দরকার ও নিজেই নিতে পারবে।

মল্লিকা। হ্যাঁ, তা পারবে। তোমার জিনিস তো ওরই জিনিস। এমনকি ট্যাক্সি-ভাড়াটা পর্যন্ত—

সুমন্ত্র। ওর হাতে টাকা ছিলো না, আমি দিয়ে দিয়েছি, তা কী হয়েছে!

মল্লিকা। হ্যাঁ, তা-ই বলছি। মন-ভোলা মানুষ, কিছুই সঙ্গে আনেননি, সবই তোমার উপর চলছে। সাবান, সিগারেট, ক্ষুরের ব্লেড, সব। তোমার অন্ধ চোখে তো কিছু ধরা পড়ে না, কিন্তু বাইরের যে-কোনো লোকের চোখে এটা বিসদৃশ ঠেকবে। এমন নির্লজ্জভাবে পরের মাথায় হাত বোলাতে আমি তো কখনো দেখিনি।

সুমন্ত্র। ছি-ছি-ছি!

মল্লিকা। তুমি কি মনে করো ও সত্যি তোমাকে ভালোবাসে? নিছক স্বার্থ—যা পারে প্রাণপণে আদায় ক'রে নিচ্ছে।

সুমন্ত্র। আস্তে, আস্তে!

মল্লিকা। তুমি হয়তো আমার কথা শুনে মর্মাহত হচ্ছো—ভাবছো, আমি হীন, আমার ছোটো মন—তা আমার সম্বন্ধে তুমি যা খুসি ভাবতে পারো, কিন্তু যা সত্য তা আমি বলবোই।

সুমন্ত্র। তোমার যা মনে হয় তা নিশ্চয়ই বলবে।

মল্লিকা। তোমাকে যত রকমে পারে শোষণও করবে, এদিকে তোমার ঈর্ষায় ওর বুক ফেটে যাচ্ছে, তা কি তুমি বোঝো না? লোকটা আস্ত একটা ক্যাড্।·····শুনলে তো আমার কথা? এখন যাও, বন্ধুর সঙ্গে বেড়িয়ে এসো।

(দরজায় টোকা)

সত্যবান (বাইরে থেকে)। আসতে পারি?

সুমন্ত্র। এসো, এসো।

(সেজেগুজে সত্যবানের প্রবেশ)

সত্যবান। কী, মল্লিকা যাবে না?

সুমন্ত্র। না, ওর মাথা ধরেছে, বেরোবে না।

সত্যবান। তা মোটারে বেড়ালে তো মাথা-ধরা সারতো।

সুমন্ত্র। ধামাই জঙ্গলে আর-একদিন যাবো, আজ চলো মোটারের রাস্তা ধ'রে রামগড় পর্যন্ত বেরিয়ে আসি।

সত্যবান। একা-একা বাড়ি ব'সে মল্লিকার কি ভালো লাগবে?

মল্লিকা। আমার ভালো লাগবার জন্য ভাববেন না, আপনারা ঘুরে আসুন।

সত্যবান। বুঝতে পেরেছি। মল্লিকার এখন কিছুই ভালো লাগছে না।

সুমন্ত্র। কেন? কেন?

সত্যবান। বাঃ, আমি এসে তোমাকে একেবারে একচেটে দখল ক'রে রেখেছি—এটা কি কোনো ভাবী স্ত্রীর ভালো লাগতে পারে?

সুমন্ত্র (শুষ্কভাবে)। হাঃ-হাঃ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সেই দিনই সন্ধ্যার পরে]

(মল্লিকা একা ব'সে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজাচ্ছে। বাইরে গাড়ি থামবার শব্দ। একটু পরে সুমন্ত্র ও সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্যবান। এই যে মল্লিকা। বারান্দায় অন্ধকারে একলা ব'সে গ্রামোফোন শুনছো? আমাদের সঙ্গে গেলেই পারতে। খুব ভালো লাগতো। ও কী? বন্ধ করলে কেন রেকর্ডটা? বেশ তো চলছিলো।

মল্লিকা। থেমে গেলো।

সত্যবান। মাথা-ধরা ছেড়েছে তোমার?

সুমন্ত্র (তাড়াতাড়ি)। তা ছেড়েছে নিশ্চয়ই, নয়তো কি আর গ্রামোফোন শুনতো। মল্লিকা, আজ আমরা এমনি একটু বেড়িয়ে এলাম। ধামাই জঙ্গলের ধারে আর একদিন যাবো, কেমন?

সত্যবান। ঐ জঙ্গলটার কোনো বিশেষত্ব আছে নাকি?

সুমন্ত্র। না, বিশেষত্ব আর তেমন কী! আমাদের এই বারান্দায় ব'সে ঐ যে ঘন সবুজ একটা রেখা দেখা যায়, ঐটে ধামাই বন। মাইল পাঁচেক দূর এখান থেকে। মল্লিকা এখানে আসবার পর দিন থেকেই বলছে ওখানে একদিন বেড়াতে যাবে।··· কিন্তু একদিনও যাওয়া হয়নি এ-পর্যন্ত।

সত্যবান। বেশ তো, চলো না একদিন। শিকার পাওয়া যায়?

সুমন্ত্র। প্রচুর।

সত্যবান। তবে আর কী! তোমার বন্দুকটা আছে না?

সুমন্ত্র। ওঃ, ধামাই জঙ্গলে পাখির একেবারে ছড়াছড়ি।

মল্লিকা। প্রকাণ্ড পুরুষমানুষ বন্দুক ঘাড়ে ক'রে গিয়ে ছোটো-ছোটো পাখিগুলোকে কী ক'রে মারো? ভাবতে পারিনে।

সত্যবান। সত্যি, মারতে, কিংবা মারতে দেখলে, ভারি খারাপ লাগে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ঐ পাখিই যখন রান্না হ'য়ে টেবিলে আসে, খেতে একটুও খারাপ লাগে না। কবে যাবে শিকার করতে?

সুমন্ত্র। গেলেই হয় একদিন। না-গেলেও হয়। আমাই জঙ্গলের ভিতরে বেশিদূর কোনোদিন যাইনি।

সত্যবান। কেন, বড়ো জানোয়ারও আছে নাকি?

সুমন্ত্র। তা থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্য নয়। জঙ্গলটা মস্ত, বেশিদূর গেলে পথ হারিয়ে যায়, ফিরে আসা মুস্কিল। একবার এক সায়েব শিকার করতে গিয়ে তো আর ফিরলোই না। বড়ো-বড়ো জঙ্গলে এ-রকম হয় জানো তো?

সত্যবান। তা বেশিদূর না-গেলেই হ'লো।

মল্লিকা। আমি তো মনে করি না-যাওয়াই সব চেয়ে ভালো।

সত্যবান। ঠিকই। সুমন্ত্র, তোমার এখন প্রাণের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে—সে-কথা ভুলেই গিয়েছিলুম।

সুমন্ত্র। আচ্ছা, সে পরে যা হয় ঠিক হবে। তোমরা একটু বোসো, আমার গোটা কয় চিঠি লিখতে হবে।

সত্যবান। একটু চা খেলে হ'তো।

মল্লিকা (তাড়াতাড়ি)। আমি যাই, চায়ের ব্যবস্থা করিগে।

সুমন্ত্র। তুমি বোসো, মল্লিকা। আবদুলকে আমি চায়ের কথা ব'লে দেবো।

[সুমন্ত্রের প্রস্থান]

[একটু চুপচাপ]

সত্যবান। তুমি যদি বলো আমি নিজের ঘরে চ'লে যেতে পারি।

মল্লিকা। দরকার বোধ করলে আমিই যাবো।

সত্যবান। হয়তো তোমার ইচ্ছা এখানে একা ব'সে আকাশের তারা গ্যাখো।

মল্লিকা। আপনি থাকলে তার বিঘ্ন হবে না।

সত্যবান। হবে না তো? নিশ্চিত হলুম। একটা সিগারেট ধরাতে পারি?

মল্লিকা। জিজ্ঞেস করাই বাহুল্য।

(সুমন্ত্র সিগারেট ধরালো)

সত্যবান। অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো।

মল্লিকা। (চুপ)।

সত্যবান। সুমন্ত্রর সঙ্গে তোমার আলাপ হ'লো কবে?

মল্লিকা। মনে নেই।

সত্যবান। মনে হচ্ছে চিরকালের চেনা—না?

মল্লিকা। তাহ'লে আপনি তো বোঝেনই।

সত্যবান। বুঝি বইকি। তুমিই একদিন বুঝিয়েছিলে।

মল্লিকা (একটু পরে)। আচ্ছা···আপনি বসুন। আমার একটু কাজ আছে।

সত্যবান। কাজ কিছু নেই। আমার কথা শুনতে তোমার ভালো লাগে না—এই আর কী। সেজন্য তোমাকে দোষও দিতে পারিনে।···কী, যাচ্ছো না?

মল্লিকা। একটা কথা জানতে চাই। আপনি ক'দিন আছেন?

সত্যবান। তুমি যদি বলো কালই চ'লে যাবো।

মল্লিকা। আমি অমন কথা বলবোই বা কেন, আর বললেই বা আপনি আমার কথামতো চলবেন কেন।

সত্যবান। আমি চ'লে গেলে তুমি সুখী হও তা জানি। কিন্তু মুস্কিল এই যে হঠাৎ চ'লে গেলে সুমন্ত্র খুব দুঃখিত হবে। ও আবার ভারি সেন্টিমেণ্টল্ মানুষ।

মল্লিকা। সৎ হওয়া, সরল হওয়া, আন্তরিকভাবে অনুরাগী হওয়া—এ সবই আপনাদের কাছে ন্যাকামির নামান্তর, তা-ই নয়?

সত্যবান। গ্যাখো মল্লিকা, সুমন্ত্রর যে কত গুণ তা আমার চেয়ে ভালো তুমিও জানো না। কিন্তু ওর সব চেয়ে বড়ো গুণ এই যে ওর প্রচুর পয়সা আছে।

মল্লিকা (উচ্চস্বরে)। পয়সা যার আছে সে-ই একটা অমানুষ এমন কথা আমি কখনো ভাবতে শিখিনি।

সত্যবান (হেসে)। আমি কিন্তু একটুও ঠাট্টা ক'রে বলিনি কথাটা।

মল্লিকা। তাছাড়া একজনের পয়সা থাকলে আর পাঁচজন উপকৃত হয়।

সত্যবান। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এই যেমন, সুমন্ত্রর দৌলতে আমি এই বারান্দায় ইজিচেয়ারে ব'সে নবাবি করছি। জানো, মল্লিকা এখানে এসে অবধি আমার ইংরেজ কবির সেই লাইনটি বার-বার মনে পড়ছে—

'How pleasant it is to have money, heigh ho!
How pleasant it is to have money!'

সত্য, সত্য, এত বড়ো সত্য আর-কিছু নেই।

মল্লিকা। পয়সা সম্বন্ধে অত বেশি ভাবা আমার মনে হয় অসুস্থ মনের পরিচয়।

সত্যবান। সে তো সত্যি কথাই। পয়সার কথা জীবনে কখনো যাদের ভাবতে হয় না—যেমন তুমি কি সুমন্ত্র—তারা কত সুস্থ, কত সুখী, তাদের জীবন কত বেশি পরিপূর্ণ! সেইজন্যই তো বলছিলাম যে সুমন্ত্রর সব চেয়ে বড়ো গুণ এই যে ওর পয়সা আছে। সততা, নির্ভীকতা, আন্তরিকতা, উদারতা—মানুষের মধ্যে যা সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে মূল্যবান—পয়সা থাকলে তবেই সেগুলো ফোটে। যার মধ্যে যেটুকু ভালো, সচ্ছলতাই তা টেনে বার করে।

মল্লিকা। কেন, বড়োলোকদের মধ্যে বিশ্রী, বাজে লোকও তো কত আছে।

সত্যবান। ওটা তোমার ভুল ধারণা, মল্লিকা। পয়সা যার নেই তার মতো চরিত্রহীন আর কেউ নয়। সে বোকা, সে বোবা, সে ভণ্ড, নিজের সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে তার অফুরন্ত জোচ্চোরি। এই ধরো না—আমার যদি যথেষ্ট পয়সা থাকতো তাহ'লে তোমার জীবন আর আমার জীবন আজ—

মল্লিকা। থামো, থামো তুমি!

সত্যবান। তাহ'লে আমার মধ্যে যে-সব ভালো-ভালো গুণ আছে সেগুলো চাপা প'ড়ে থাকতো না, আর তুমিও—

মল্লিকা (ক্ষীণস্বরে)। ও-সব কথা আর কেন?

সত্যবান। তাহ'লে আমার জীবন এমন ক'রে নষ্ট করতে তুমি পারতে না।

মল্লিকা। নষ্ট! কে নষ্ট করেছে তোমার জীবন! তুমি নিজে!

সত্যবান। না, না, মল্লিকা, তুমি—তুমি! তা হোক্—তোমার জীবন শেষ পর্যন্ত সার্থক হ'লো সেটুকুই সুখের কথা।

মল্লিকা। তুমি যদি ভদ্রলোক হ'তে, তাহ'লে আজ আমার এই পূর্ণতার দিনে আমাকে এমন ক'রে বিদ্রূপ করতে না।

সত্যবান। ভদ্রলোক আমি নই তা তো তুমি জানো, আর সেইজন্যই তো আমাকে ত্যাগ করলে।

মল্লিকা। আমার যে-নতুন জীবন গ'ড়ে উঠছে তা ধ্বংস করবার জন্যেই কি তুমি এখানে এসেছো?

সত্যবান। কী আশ্চর্য! তোমার জীবন ধ্বংস করবার মতো শক্তি আমার কোথায়···যদি না তুমিই দিয়ে থাকো।

মল্লিকা। তুমি স্বার্থপর, তুমি ধূর্ত—তোমার মন ঈর্ষায়, বিদ্বেষে ভরা। এখানে—এই বাড়িতে ব'সে তুমি যার রাজকীয় আতিথেয়তা ভোগ করছো, অনায়াসে তারই সর্বনাশ করতে পারো তুমি।

সত্যবান। পারি···তুমি যদি রাজি হও।

মল্লিকা। আমি! আমি রাজি হ'বো! তুমি বলছো কী!

সত্যবান। যাবে, যাবে আমার সঙ্গে পালিয়ে? চলো ধামাই বনে গিয়ে বাসা বাঁধি—কেউ আমাদের সেখানে খুঁজে পাবে না।

মল্লিকা (রুদ্ধস্বরে)। তোমার সাহস হ'লো!···ও-কথা মুখে আনবার সাহস হ'লো তোমার!

সত্যবান। যদি বলি এ-সাহস তুমিই দিয়েছো?

মল্লিকা (প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতে)। আর না! আর একটি কথা না! চুপ, চুপ, চুপ!

সত্যবান। তাহ'লে এখনো সময় আছে!

মল্লিকা (প্রায় আর্তস্বরে)। পায়ে পড়ি তোমার, যাও এখান থেকে, যাও।

সত্যবান। তুমি?

মল্লিকা। আমি?

সত্যবান। আছে, এখনো সময় আছে। ভেবে ছাখো, ভালো ক'রে ভেবে ছাখো—সুমন্ত্র না সত্যবান? সুমন্ত্র না সত্যবান?

মল্লিকা। না—না—আমার জীবন নিষ্ঠুর হাতে ছারখার কোরো না তুমি—আমাকে দয়া করো, আমাকে বাঁচতে দাও।

সত্যবান। দয়া? তুচ্ছ দয়া তুমি চাও?

মল্লিকা। তুমি বলো যে কালই তুমি চ'লে যাবে।

সত্যবান। কালই…

মল্লিকা। দ্বিধা কোরো না—বলো, কথা দাও আমাকে।

সত্যবান। তাহ'লে এই তোমার শেষ কথা?

মল্লিকা। বলো, বলো! বলো যে কালই তুমি চ'লে যাবে!

সত্যবান। আচ্ছা, যাবো।

[একটু চুপচাপ]

মল্লিকা (সম্পূর্ণ অন্যরকম সুরে)। এই যে, আবদুল :চা নিয়ে এসেছে।… রাখো ওখানে।…আমি ঢেলে দিচ্ছি চা-টা। আপনি ক' চামচে চিনি খান?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুমন্ত্র, সত্যবান ও মল্লিকা

(পরের দিন)

সুমন্ত্র। সত্যি তুমি আজই যাচ্ছো?

সত্যবান। আজই যাচ্ছি।

সুমন্ত্র। কেন বলো তো?

সত্যবান। বাঃ, যাবো না? এখানেই চিরকাল থাকবো নাকি?

সুমন্ত্র। তাই ব'লে কি এসেই চ'লে যেতে হয়?

সতবান। তোমাকে আগে বলিনি, কিন্তু সত্যি আমার একটু জরুরি কাজ আছে।

মল্লিকা। কী এমন আপনার কাজ! থাকুন না আরো কিছুদিন।

সত্যবান। থাকতে পারলে নিশ্চয়ই থাকতুম—বিশেষত তুমি যখন বলছো।

মল্লিকা। কেন, আপনার বন্ধুর কথা কি যথেষ্ট দামি নয়?

সত্যবান (হেসে)। দেখলে তো, সুমন্ত্র। খুট্ ক'রে লেগেছে কথাটা। মল্লিকার ধারণা যে তুমি হচ্ছো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব।

সুমন্ত্র (হেসে)। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি ইচ্ছে করলেই থাকতে পারো।

সত্যবান। তুমি বিশ্বাস করতে পারো যে থাকবার ইচ্ছা আমার অত্যন্ত তীব্র। কিন্তু উপায় নেই।

সুমন্ত্র। দু'দিনের জন্য কেনই বা এলে!

(একটু চুপচাপ)

[ঠুকঠুক কাঠঠোকরার শব্দ]

মল্লিকা। ঐ কাঠঠোকরা!

[হাওয়ায় গাছপালার শোঁ শোঁ মড়মড় শব্দ]

মল্লিকা। হঠাৎ হাওয়া উঠলো। কী ভালো লাগে এখানে দুপুরবেলা-গুলো—যখন হাওয়া ওঠে।

সত্যবান। সত্যি, পেট ভ'রে খেয়ে-দেয়ে, ইউকালিপ্টস গাছের তলায় বেঞ্চিতে ব'সে প্রকৃতিসম্ভোগ—এত বড়ো আরাম আর কী আছে!

মল্লিকা। আপনার স্বভাবটা ঠিক ঐ কাঠঠোকরার মতো। কেবল ঠুকঠুক টিপ্পনি। কিছুই আপনার কাছে সহজ নয়।

সত্যবান। মনে করো রেলগাড়িতে চলেছো—খুব খিদে পেয়েছে—কিন্তু দু'ঘণ্টার আগে রিফ্রেশমেণ্টরুমওয়ালা ইষ্টিশানে গাড়ি থামবে না। জানলার বাইরে প্রাকৃতিক দৃশ্য তখন কি আর ভালো লাগবে!

মল্লিকা। এ-সব কথার কোনো মানে হয় না।

[একটু চুপচাপ। কয়েক সেকেণ্ড কাঠঠোকরার ঠুকঠুক শব্দ।]

মল্লিকা। অদ্ভুত লাগে শুনতে।

সত্যবান। ও কী করছে জানো তো? কাঠের ফাঁকে-ফাঁকে পোকা ধ'রে ধ'রে-খাচ্ছে। এটা ওর জীবিকা।

মল্লিকা। ও কী করছে তা দিয়ে কী দরকার। শব্দটা কানে শুনতে ভালো লাগে সেটাই আসল কথা।

সত্যবান। তাহ'লে আমার মন্তব্যগুলোও তোমার খারাপ লাগবার কথা নয়। তোমার মতে আমার স্বভাবটাও তো ঐরকম।

মল্লিকা। ভালো লাগা কি না-লাগা সম্পূর্ণ খামখেয়ালি জিনিস। সেটা সব সময় লজিক মেনে চলে না।

সত্যবান। তা-ই দেখছি।

(একটু চুপচাপ)

সুমন্ত্র (একটু হেসে)। তোমরা দু'জন দেখছি কোনো বিষয়েই একমত হ'তে পারো না।

সত্যবান। সেটা আমারই দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

মল্লিকা। কোনো জিনিস সুন্দর, এ-কথা বললেই সত্যবানবাবু রাগ করেন।

(আবার কাঠঠোকরার শব্দ)

মল্লিকা। ওর শব্দই শুধু শুনলুম, চোখে কোনোদিন দেখলুম না।

সুমন্ত্র। একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পারো। ঐ বড়ো আমগাছটার কাছে যদি যাও—

মল্লিকা। আমাকে দেখলেই হয়তো পালিয়ে যাবে। ধরা যায় না ওদের ?

সুমন্ত্র। কী জানি, চেষ্টা তো করিনি কোনো।

মল্লিকা (একটু পরে)। ছাখো, ধামাই বনটাকে এখন কী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কত কাছে মনে হয়।

সুমন্ত্র। যাবে আজ ওখানে ?

মল্লিকা। আজ থাক্, কাল যাবো।

সুমন্ত্র। আজই যাওয়া যাক্। সত্যবান, তুমি আজই যাচ্ছো ?

সত্যবান। আবার জিজ্ঞেস করছো কেন ?

সুমন্ত্র। যদি যাওই, তাহ'লে চলো আজ বিকেলে ধামাই জঙ্গলের ধারে বেড়িয়ে আসি। তোমার গাড়ি তো সেই রাত এগারোটায়। মল্লিকা অনেকদিন ধ'রেই যেতে চাইছে।

সত্যবান। বেশ তো, কিন্তু আমি গেলে তোমাদের অসুবিধে হবে না তো ?

সুমন্ত্র। কী আশ্চর্য, তুমি গেলে আবার অসুবিধে কী ? বরং তুমি না-গেলেই—

সত্যবান। কী যেন, কালকের মতো আজ আবার মল্লিকার মাথা না ধরে।

সুমন্ত্র (ব্যস্তভাবে)। না—না—সত্যি কাল ওর মাথা ধরেছিলো। তুমি কিছু মনে করোনি তো ?

মল্লিকা। বেশ তো, আজ যাওয়া যাবে সবাই মিলে। ক'টা নাগাদ বেরুবে ?

সুমন্ত্র। সাড়ে-পাঁচটায় বেরুলেই হবে। ওখানকার দৃশ্য ভারি সুন্দর। জঙ্গলটা ঠিক একটা পাহাড়ের গায়ে।

মল্লিকা। শিকার-টিকার কিন্তু না।

সুমন্ত্র। না, না, বিকেলে তো শিকারের কথাই ওঠে না।

সত্যবান। তবু—বন্দুকটা নিয়ে নিয়ো। যদি কিছু পাখি-টাখি চোখে পড়ে।

সুমন্ত্র। তুমি যদি থাকতে একদিন শিকারে বেরোতাম।

সত্যবান। কলকাতায় ফিরে আমাকে এর চেয়েও ঢের বেশি দুরূহ শিকারে ব্যস্ত হ'তে হবে—টাকা শিকার।

মল্লিকা। কী শিকার ?

সত্যবান। টাকা। বাঘ-ভালুক শিকারের চেয়ে কম কঠিন নয় সেটা। ...আজ তাহ'লে ধামাই বনে যাওয়া ঠিক ? বেশ।

সুমন্ত্র। ঘরে যাচ্ছো নাকি ?

সত্যবান। হ্যাঁ, একটু ঘুমিয়ে নিইগে। বড্ড বেশি খাওয়া হ'য়ে গেছে।

[সত্যবান চ'লে গেলো]

(একটু চুপচাপ)

মল্লিকা। দিনটা মেঘলা ক'রে আসছে। এ-রকম মেঘলা দুপুরে, আর এ হাওয়ায়, মন যেন কোথায় উড়ে চ'লে যায়। ঐ উঁচুতে ওটা কী ? চিল ?

সুমন্ত্র। বোধ হয়।

মল্লিকা। কত উঁচুতে দেখেছো ? মেঘের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

সুমন্ত্র। মল্লিকা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে সত্যবান তোমার মনের কথা টের পেয়েছে ?

মল্লিকা (চমকে)। কী কথা ? কী মনের কথা ?

সুমন্ত্র। ওর মতো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে এটা বোঝা অবশ্য শক্ত নয় যে ওর প্রতি তুমি মনে-মনে বিরূপ।

মল্লিকা (আশ্বস্ত হ'য়ে)। ও, এই কথা !

সুমন্ত্র। তবে তুমি কী ভেবেছিলে ?

মল্লিকা। আমি আবার কী ভাববো ? তা উনি বুঝে থাকলেই বা আমি কী করতে পারি, বলো !

সুমন্ত্র। ও যে আজই হঠাৎ চ'লে যাচ্ছে তার কারণও হয়তো এই।

মল্লিকা। ছাখো চেষ্টা ক'রে—গায়ে ধ'রে সেধে যদি রাখতে পারো।

সুমন্ত্র। ওর প্রতি কেন যে তুমি এমন বিরূপ হ'লে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

মল্লিকা। বুঝবেও না কোনোদিন।

সুমন্ত্র। এ যে আমার পক্ষে কত বড়ো দুঃখের কারণ তা কি তুমি বোঝো?

মল্লিকা। নাও নাও, ছোটো জিনিসকে আর বাড়িয়ে তুলো না। বিয়ের পরে মানুষের জীবনে কতই তো অদল-বদল হয়, তুমি না-হয় একজন বন্ধুকে ছাড়লে।

সুমন্ত্র। সত্যি তবে তুমি তা-ই চাও?

মল্লিকা। চাইবোই বা না কেন? সত্যবান দত্ত কি একটা মানুষ! উনি যে গরিব সেই দেমাকে ওঁর মাটিতে পা পড়ে না!

সুমন্ত্র (অত্যন্ত ব্যথিত)। তুমি কাউকে এত ঘৃণা করতে পারো তা আমার ধারণার অতীত ছিলো। আর তাও এমন একজনকে যার মতো শ্রদ্ধার, ভালোবাসার যোগ্য লোক খুব কমই আছে।

মল্লিকা (একটু নরম হয়ে)। বেশ তো—তোমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা তো আর আমি কেড়ে নিচ্ছিনে।

সুমন্ত্র। আমার এখনো আশা আছে যে ওর সঙ্গে আরো ভালো পরিচয় হ'লে আস্তে-আস্তে তোমার মত বদ্‌লাবে।

মল্লিকা। মত না-বদ্‌লানেই ভালো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সেইদিন বিকেল। অসংখ্য পাখির কিচির মিচির। ধামাই জঙ্গলের ধারে মল্লিকা, সুমন্ত্র, ও সত্যবান]

মল্লিকা। ইস্—কত পাখি।

সুমন্ত্র। ঘরে ফিরছে সব—চ্যাচামেচিটা শোনো একবার।

সত্যবান। সত্যি, অদ্ভুত সুন্দর জায়গা।

মল্লিকা। যাক্, তবু আপনার মুখে শুনলাম যে কোনো জিনিস সুন্দর।

সত্যবান। চারদিকে তাকিয়ে একটাও কিন্তু বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না।

সুমন্ত্র। এখান থেকে রজতরেখা গ্রামই সব চেয়ে কাছে। অসম্ভব নির্জন। দৃশ্যও চমৎকার, কিন্তু মোটারের রাস্তা খারাপ ব'লে এদিকটায় লোকজন বড়ো আসে না।

সত্যবান। ওঃ, যা কয়েকখানা ঝাঁকুনি লেগেছে! তোমার গাড়িটার কিছু হয়নি তো?

সুমন্ত্র। কী আর হবে। গাড়িটা আমি যেমন-তেমন ব্যবহার করি।

সত্যবান। করতেই পারো। একখানা নষ্ট হ'লে আর-একখানা কিনতে তো তোমার অসুবিধে নেই।

মল্লিকা। ঐ কাঠঠোকরা!

(নানারকম পাখির ডাকের মধ্যে কাঠঠোকরার শব্দ শোনা গেলো)

সত্যবান। আমাকে বলছো?

মল্লিকা। না। একটা কাঠঠোরার শব্দ শোনা যাচ্ছে, তাই বলছি।

সত্যবান। আমি ভাবলুম আমার কথার উপর বুঝি বললে।

মল্লিকা। আপনি কী বললেন আমি শুনিনি।

[নানারকম পাখির ডাকের মধ্যে কাঠঠোকরার ডাক আরো স্পষ্ট হ'লো]

মল্লিকা। ও এখানেও আছে!

সুমন্ত্র। থাকবে না! কতরকমের যে পাখি আছে এখানে তার অন্তই নেই।

সত্যবান। জঙ্গলটা কি অনেক বড়ো?

সুমন্ত্র। লম্বায় দশ মাইল আর চওড়ায় মাইল ছ'য়েক তো হবে। সমস্ত ছোটোনাগপুরে এত বড়ো জঙ্গল আর নেই।

সত্যবান। ইস্—একদিন গেলে হ'তো ভিতরে।

মল্লিকা (উচ্ছ্বসিত)। দ্যাখো, দ্যাখো, কী সুন্দর সূর্যাস্ত।

সত্যবান। বলো তো এত সুন্দর কেন লাগছে?

মল্লিকা। আপনিই বলুন।

সত্যবান। মেঘ আছে ব'লে। মনে হচ্ছে নাকি, সূর্যকে কালো মেঘের পাল টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলছে, রক্তে আকাশ লাল হ'য়ে গেলো।

[ঠুকঠুক্ কাঠঠোকরার শব্দ]

মল্লিকা। আরে, এখনো!

সুমন্ত্র। কাঠঠোকরা তোমাকে আর ছাড়বে না।

মল্লিকা। তাই তো দেখছি। অন্য সব পাখির ডাক থেমে গেছে, চারদিকে স্তব্ধতার মধ্যে অদ্ভুত শোনাচ্ছে ওর আওয়াজ।

[দু'তিন সেকেণ্ড পর-পর কাঠঠোকরার শব্দ ঠুক—ঠুক—ঠুক।]

সত্যবান। হঠাৎ কেমন চুপচাপ হ'য়ে গেলো চারদিক।

মল্লিকা। কাঠঠোকরা বোধ হয় কাছেই কোথাও আছে। ধ'রে আনতে পারো?

সুমন্ত্র। জীবিত না মৃত?

মল্লিকা। না, না, মেরে কাজ নেই।

সুমন্ত্র। আচ্ছা, একটু না-হয় দেখে আসছি।

মল্লিকা। জঙ্গলের ভিতরে কিন্তু যেয়ো না।

সুমন্ত্র। না, না, ভিতরে যাবো না—ভয় নেই।

সত্যবান। দ্যাখো, সুমন্ত্র, যা মেঘ করেছে এখনই বোধ হয় ঝড় আসবে। বরং ফিরি চলো।

মল্লিকা। কবি হলে কী হবে, বেশ সাবধানি আছেন দেখছি।

সত্যবান। আমার মতে ঝড়ের শোভা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে ততটা উপভোগ্য নয়। কংক্রিটের বাড়িতে ব'সে জানলা দিয়ে তাকিয়েই সেটা ভালো জমে।

মল্লিকা। আপনার অ্যাডভেঞ্চারের দৌড় তাহ'লে এই পর্যন্তই! এই নিয়ে ধামাই জঙ্গলে কুঁড়েঘরে বসবাস করবার সখ!

সত্যবান। চলো, সুমন্ত্র, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

সুমন্ত্র। না, না, তা হয় না। মল্লিকাকে এখানে একা রেখে যাওয়া ঠিক না।

সত্যবান। আমাকে পাহারাওলা নিযুক্ত করছো, এতে দস্তুরমতো রোমাঞ্চিত হচ্ছি। বন্দুক নিয়েই যাও, যদি পাখি-টাখি পাও···যাবার আগে রোস্ট খাওয়া যাবে। আর শোনো—দেরি কোরো না কিন্তু মোটেও। যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি এসে পড়তে পারে।

সুমন্ত্র। না, দেরি করবো না।

(সুমন্ত্রর প্রস্থান)

মল্লিকা (চেঁচিয়ে)। কাঠঠোকরা একটা ধ'রে এনো কিন্তু।

সুমন্ত্র (বাইরে থেকে চেঁচিয়ে)। আচ্ছা—।

সত্যবান। চলো ঐ গাছের গুঁড়িটায় বসা যাক্।

(একটু চুপচাপ)

সত্যবান। ফিরে গেলেই হ'তো। বৃষ্টি এলো ব'লে।

মল্লিকা। এলোই বা।

সত্যবান। আমার আবার একটু ভিজলেই সর্দি হয়।

মল্লিকা (হেসে উঠলো)।

সত্যবান। তার উপর থর্ড ক্লাশের জ্বর আছে—এক রাত্রেই এক বছর আয়ুক্ষয়।···কী রকম মেঘ সেজেছে দেখছো?

মল্লিকা। দেখছি তো।

সত্যবান। পৃথিবী যেন মুছে যাচ্ছে। একবার ভাবো, এ কি অদ্ভুত নয় যে তুমি আর আমি—

মল্লিকা। চুপ করো, চুপ করো

সত্যবান। এ এমন এক মুহূর্ত যা আর আসবে না। মল্লি।

মল্লিকা। না—না—তুমি চুপ করো।

[দূরে মেঘের ডাক]

সত্যবান। মনে হচ্ছে তুমি আমি ছাড়া জগতে আর-কিছু নেই, আর-কেউ নেই।

মল্লিকা। বন্ধুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ-সব কথা বলা কি ভদ্রতা হচ্ছে?

সত্যবান। বন্ধুর উপস্থিতিতেও বলতে পারি। বলবো?

মল্লিকা। কী বলবে?

সত্যবান। তাকে কিছু বলবো না, বলবো তোমাকে। তারপর তুমি যা বলবে, তা-ই হবে।

মল্লিকা। কিন্তু যা বলবার তা তো বলা হ'য়ে গেছে।

সত্যবান। কিন্তু তারও আগে একবার—

মল্লিকা। এ-সব কথা যদি বলো তাহ'লে আমি এক্ষুনি—

সত্যবান। কোথায় যাবে? চারধারে জঙ্গল। যেখানে যাবে, সেখানেই আমি আছি।

মল্লিকা। বিশ্বাসঘাতক! একটু লজ্জাও নেই তোমার!

সত্যবান। না, লজ্জা আমার নেই। তুমি যদি বলো, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারি।

[মেঘের দীর্ঘ গুরুগুরু ডাক]

সত্যবান। তুমি ধরা প'ড়ে গেছো, মল্লিকা। তোমাকে গাড়িতে তুলে আমি যেদিকে খুসি চ'লে যেতে পারি—সাধ্য কি তোমার বাধা দাও। তুমিও যে তা-ই চাও! মনে-মনে তুমি যে ম'রে যাচ্ছো!

মল্লিকা। আমি তাই চাই!

সত্যবান। চাও, চাও, আমাকেই তুমি চাও; আর সব মিথ্যা, আর সব ভুল!

মল্লিকা (রুদ্ধস্বরে)। এই তোমার মনে ছিলো!

[দূরে ঝড়ের শব্দ]

সত্যবান। ঝড় আসছে। চলো গাড়িতে বসি। ভয় নেই তোমার, আমি গাড়ি চালাতে জানিনে।

মল্লিকা। সুমন্ত্র রইলো যে?

সত্যবান। ও এসে পড়বে এক্ষুনি। শিগগির চলো—কী রকম অন্ধকার হ'য়ে এলো চারদিক। টর্চটা কোথায়?

মল্লিকা। সুমন্ত্রর কাছেই তো ছিলো।

[ঝড়ের শব্দ আরো কাছে]

সত্যবান। চলো, চলো, এসে পড়লো। দাঁড়িয়ে আছো কেন? বৃষ্টিতে ভিজে ইনফ্লুয়েঞ্জা না হয়।

মল্লিকা। সুমন্ত্র না এলে যাবো না।

সত্যবান। পাগল! এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজবে নাকি! নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া।

মল্লিকা। আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে।

সত্যবান। ভাবনা কিসের?

মল্লিকা। ধামাই বনের একটা অপবাদ আছে—

সত্যবান। পাগল! সুমন্ত্র এলো ব'লে।

[দূরে পর-পর দুটো বন্দুকের আওয়াজ]

মল্লিকা (চমকে)। শুনলে?

সত্যবান। শুনলুম তো।

মল্লিকা। নিশ্চয়ই ও পথ হারিয়েছে। ডাকছে আমাদের।

সত্যবান। না, না, ও তো বেশিক্ষণ হয় যায়নি। তুমি ভেবো না। গাড়িতে চলো।

মল্লিকা। কিছু—তেই না। আমি যাবো ওকে খুঁজতে বনের মধ্যে।

সত্যবান। নাঃ, একেবারে উন্মাদ দেখছি।

মল্লিকা। আমি ভেবেছিলুম তোমার কাছেও সুমন্ত্রর জীবনের কিছু মূল্য আছে।

সত্যবান। ইস্, এ তো ভারি বিপদে পড়লাম!

মল্লিকা। বিপদ আর তোমার কী! তুমি তো চাওই যে সুমন্ত্র—আর না ফিরুক।

[আর-একটা বন্দুকের শব্দ]

মল্লিকা (চেঁচিয়ে)। যা—ই।

সত্যবান। মল্লিকা, দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি ওকে খুঁজতে। তুমি দয়া ক'রে গাড়িতে গিয়ে বোসো। এই জলঝড় মাথায় ক'রে একলা দাঁড়িয়ে থেকো না।

মল্লিকা (বিহ্বলের মতো)। হারিয়েছে···পথ হারিয়েছে।

সত্যবান (শান্তভাবে)। আনবো ওকে খুঁজে, ভয় কী, মল্লি? লক্ষ্মী তো, গাড়িতে গিয়ে বোসো। হেডলাইট জ্বালিয়ে রেখো। (সত্যবানের প্রস্থান)।

সত্যবান (একটু পরে, দূর থেকে)। মল্লি—গাড়িতে যাও, বৃষ্টি এসে পড়েছে।

[সত্যবান চ'লে গেলো।]

[ঝড় আর বৃষ্টির শব্দ]

[মল্লিকা বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। বৃষ্টি এলো ঝড়ের সঙ্গে-সঙ্গে।
খানিক পরে সুমন্ত্র ছুটতে-ছুটতে এসে ঢুকলো]

সুমন্ত্র। ইস্—একেবারে ভিজে গেলাম।

মল্লিকা। তুমি···ফিরেছো!

সুমন্ত্র। তবে কি ভেবেছিলে ফিরবো না! হেডলাইটটা জ্বালিয়ে রেখে খুব বুদ্ধির কাজ করেছিলে।…ওঃ, গাড়ির মধ্যে ঢুকে বাঁচলাম। তোমার গায়ে ছাঁট লাগেনি তো?

মল্লিকা। উঃ, আমার যা ভাবনা হচ্ছিলো।

সুমন্ত্র। শেষ পর্যন্ত গোটা কয়েক পাখি না-মেরে পারলুম না। চমৎকার রোস্ট হবে।…সত্যবান কোথায়?

মল্লিকা। তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

সুমন্ত্র। না তো, আমার সঙ্গে দেখা হবে কেন? তোমাকে একা ফেলে সে গিয়েছে কোথায় এই বৃষ্টিতে?

মল্লিকা। তোমাকে খুঁজতে…তাঁকে তুমি ছাখোনি?

সুমন্ত্র। আমাকে খুঁজতে? জঙ্গলের মধ্যে!

মল্লিকা। আমি পাঠিয়েছিলুম।

সুমন্ত্র। করেছো কী তুমি!

মল্লিকা। আমার এমন ভয় হয়েছিলো…আমি ভেবেছিলুম…।

সুমন্ত্র। ধামাই বন কি এতটুকু জায়গা! দু'একটা রাস্তা আছে সাঁওতালরাও আনাগোনা করে—সত্যবান তো ও-সব চেনে না। অন্য কোনোদিকে গিয়ে থাকলে…।

মল্লিকা। কী হবে?

সুমন্ত্র। কী হ'তে পারে বোঝো না? তার উপর এই অন্ধকার—ঝড়বৃষ্টি—তুমি করেছো কী?

মল্লিকা (আবিষ্টের মতো)। এ আমি কী করলাম!

সুমন্ত্র। আমার জন্যে ভাবনা হ'লো, আর ওর কথা একটু ভাবলে না!

মল্লিকা (তীব্র চাপাস্বরে)। আছে, আছে—এখানেই আছে। সত্যবান!

সুমন্ত্র। এ কী—কোথায় যাচ্ছো, মল্লিকা…শোনো…।

মল্লিকা (চীৎকার ক'রে)। সত্যবান, সত্যবান!

(প্রবল ঝড়বৃষ্টি বজ্রের শব্দ—তার ফাঁকে-ফাঁকে—)

সুমন্ত্র। এ তুমি করছো কী! ম'রে যাবে যে!

মল্লিকা। ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে!

সুমন্ত্র। এ-রকম পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালে কী লাভ!

মল্লিকা। সে আছে, সে এখানেই আছে। (প্রাণপণ চেঁচিয়ে) সত্যবা—ন।

সুমন্ত্র। ইস—কী বৃষ্টি!…আমার কথা শোনো, এখন ফিরে চলো। গাঁয়ের সাঁওতালদের ডেকে—

মল্লিকা। আমি যেখানে আছি সেখানেই সে আছে। কোথায়? কোথায়?

সুমন্ত্র। একটু শান্ত হও!…কী ভীষণ কাঁপছো তুমি! মল্লিকা!

মল্লিকা (ভাঙা-ভাঙা গলায় চীৎকারে)। সত্যবান! সত্যবান! (ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না) সত্যবা——ন! সত্যবা———ন!

তৃতীয় দৃশ্য

[ছ'মাস পরে]

সুমন্ত্র। আজ ঠিক ছ'মাস হ'লো।

মল্লিকা। ছ'মাস!

সুমন্ত্র। এখনো যখন ওর কোনো খবর পাওয়া গেলো না, তখন…

মল্লিকা। (ক্ষীণস্বরে) কোনোদিই কি আর খবর আসবে!

সুমন্ত্র। সাঁওতালরা যতটা পারে খুঁজেছিলো। কিন্তু ঐ দু'একটি বাঁধা রাস্তা ছাড়া অন্যদিকে যেতে কেউই সাহস পায় না। টাকার লোভেও না।

মল্লিকা। তুমি তো চেষ্টার ত্রুটি করোনি।

[একটু চুপচাপ]

সুমন্ত্র। যদি তুমি অনুমতি দাও, এবারে আর-একটা তারিখ ঠিক করি।

মল্লিকা। ক্লান্তভাবে)। করো।

সুমন্ত্র। আষাঢ়ের প্রথম দিকেই—

মল্লিকা। আচ্ছা।

[একটু চুপচাপ]

সুমন্ত্র। একটা কথা বলি, মল্লিকা?

মল্লিকা। বলো।

সুমন্ত্র। তোমার মন কাকে চায় তা যদি জানতেই তবে প্রথমেই সে-কথা বললে না কেন? তাহ'লেই তো……

[হঠাৎ কাঠঠোকরার ঠুকঠুক শব্দ]

মল্লিকা। থামাও, থামাও, ঐ পাখিটাকে থামাও। ও আমি সইতে পারিনে।

সুমন্ত্র (সস্নেহে)। কেঁদো না, মল্লিকা, কেঁদো না। ফিরে

রেডিওতে অভিনীত আর

সোনালি-রূপালি

লীলা মজুমদার

চিরদিন আমি এইরকম মোটা সোটা গিন্নিবান্নি ছিলাম না। ইয়ে-কি-বলে আমাকে বিয়ে করবার আগে আয়ত-লোচনা তন্বী তরুণী ছিলাম। আর এই যে আমার ইঁদুরের ল্যাজের মতন বিনুনিটা পাকিয়ে বড়ি খোঁপা ক'রে রেখেছি, এ তখন ছিলো কুণ্ডলিনী সর্পিণীর মতন, মিশ্‌কালো, চক্‌চকে, মসৃন। কিন্তু আমার সে শ্যামশ্রী সত্ত্বেও তখন আমার জীবনে কাব্য ঘনিয়ে ওঠেনি। স্পষ্ট মনে আছে আমার দিনের পর দিন বৃথা কেটে যেতো; রামধনুকের রং আর কিছুতেই লাগ্‌ত না। আমি খেতুম না ভাল ক'রে, বসতুম না আরাম ক'রে, গলা ছেড়ে কথা বলতুম না, পাছে আয়েসী হ'য়ে গিয়ে লোমহর্ষণের দর্শন না পাই। মিছিমিছি সে সকল আত্মদাহ: আমার ঘটনাহীন যৌবনের দুর্লভ দিনগুলো টল্‌টলে নদীর জলের মতন স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে চল্লো, শেষে হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি যৌবনের খাতার শেষ পাতা উলটে ফেলেছি।

সেদিন বিষম রেগেছিলুম; এই যে মনে মনে এত কাব্যরচনা করলুম, এত অসম্ভব ঘটনাবলী কল্পনায় সৃষ্টি করলুম, একি সব মিছিমিছি নাকি? যে অপরূপ আমাকে চিরদিন হাতছানি দিয়ে ডেকে ডেকে আড়ালে লুকোয়, সে কি শেষ অবধি সত্যি-সত্যি আমাকে এড়িয়ে যাবে নাকি? বিষম রাগ হোল। ইয়েকে খুব বকলুম, বল্লুম—"তুমি ভারী ইয়ে; তোমার মুখখানাতে দিন রাত্তির একগাল হাসি লেগে আছে; তোমার মাথার মাঝখানকার চুল পাৎলা হয়ে গেছে; তুমি মোটা হয়েছ; রাত্তিরে নাক ডাকাও; তুমি আমাকে কখনও মক্ষিরাণী ব'লে ডাকো না; আমার জীবনটাই বৃথা।"

সে অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে একবার চেয়ে আবার মন দিয়ে দাড়ী কামাতে লাগ্‌লো।

সুমন্দা অপ্রত্যাশিতভাবে আমার এই হেলায় ফেলায় নষ্ট-করা জীবন মল্লিকা ! রায় রসে রহস্যে ভ'রে উঠ্‌লো।

আমরা অনেকদিনের পুরোন একটা বাড়ীতে উঠে এলাম। সবাই সকালবেলা বাড়ী বদল করে, কিন্তু আমরা এলুম সন্ধ্যের মুখে; সূর্য্য তখনও ডুবে যায়নি কিন্তু তা'র স্তিমিত আলো লালচে হয়ে এসেছে। সেই লালচে রোদ লেগেছে বাড়ীর বাইরের ছাই রংএর দেয়ালে, বাড়ীর চারপাশের বাগানের বিশাল বিশাল আমগাছের বাতাবীলেবুগাছের ঘনসবুজ ডালপালাতে, যা'তে এক ঝাঁক পাখী বাসা বেঁধেছে। সেই যে শুনেছিলুম মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রাণের নৈঃসঙ্গ্যের কথা, যা কোন কিছুতে দূর করতে পারে না, আমার প্রাণের সেই নিদারুণ নিঃসঙ্গতা এক নিমেষে যেন একটু ক'মে গেলো।

প্রাচীন বাড়ীটার কাঠের সিঁড়িতে গাল্‌চে দেয়া নেই, কিন্তু গাল্‌চে পাতার দাগ আছে, ঝক্‌ঝকে পেতলের শিক দিয়ে আঁটা লাল পুরু গাল্‌চের দাগ ধাপে ধাপে রয়েছে। একতলাটা সংস্কার ক'রে আধুনিক বানিয়েছে, কিন্তু ঐ গাল্‌চে-বিহীন কাঠের সিঁড়ির উপরে দোতলাটা কোন্ বিগত যুগের। আমরা আসতে যা'রা দুদিনের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছে আবার আমরা চ'লে গেলে তারা কানায় কানায় সব জুড়ে বসবে। বলতে সময় লাগ্‌লো, কিন্তু বাড়ীতে পা দেবার মুহূর্ত্তেই এত কথা আমার মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত খেলে গিয়েছিল।

পুরোন জিনিষের জাদু আছে এই বাড়ীতে। একতলার সমস্ত আসবাব নতুন, কিন্তু দোতলাটাকে ধুয়ে মুছে নিলে পরও সে তা'র পুরোন ভাঙা সজ্জা নিয়ে দিনরাত আমাকে ইঙ্গিত করতো। সত্যিকারের কিছু হয় তো ছিলো না। নালন্দার ভাঙা বিদ্যালয়ে, বুদ্ধগয়ার জনহীন মন্দির দেখেও আমার এই রকম কেমন যেন চেনা চেনা লেগেছিল, মনে হয়েছিল এদের সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; একটু ভাবলেই হয়তো বিষম প্রয়োজনীয় কত কথা মনে প'ড়ে যাবে; কিন্তু হায়রে আমার মায়ের দেওয়া এ জন্মের মন, সেই বিশাল ইঙ্গিত তাকে এড়িয়ে গেলো। আর এখানেও দোতলার সারি সারি ভাঙা জান্‌লাগুলো আমগাছ আর বাতাবি লেবুগাছের দিকে অপলকনেত্রে চেয়ে রইলো, কী একটা তাদের [illegible]শ করা উচিত ছিলো সে আর বলা হলো না।

[illegible]টবেলায় হয় তো আমি মন্ত্রপড়া একটা কিছু ভুল ক'রে [illegible] [illegible]লাম, আর তার আমেজ এখনও আছে আমার চোখে আর [illegible]

মধ্যে। মনে হ'ত জীবনের অর্দ্ধেকের বেশী কেটে গেলো, তা যেন সব থেকে যা প্রধান, যার কাছে দাঁড়ালে আর সব কিছু ছোট হ'য়ে যায়, সেটাই হোল না। মনে হ'ত যৌবনে কেন সারারাত্রি প্রত্যাশা ক'রে থাকতাম সকালবেলা আমাকে কি আশ্চর্য্য জিনিষ এনে দেবে; আর সারাদিন অধীরভাবে প্রতীক্ষা ক'রে থাকতাম রাত্রি আমাকে অলৌকিকের খোঁজ দেবে? কেন গাছপালা আলো অন্ধকার, চাঁদের কিরণ আর সূর্য্যরশ্মি সবাই রহস্য মেখে এসে আমাকে নেমন্তন্ন করতো?

একদা দুপুরে এই সব হতাশার কথা ভাবছিলুম। রান্নাঘর ধুয়ে চাকররা চ'লে গেছে, কোথায় বেশ ছায়া ছায়া জায়গা দেখে বিড়ি খেতে। ছেলেরা গেছে স্কুলে, ইয়ে গেছে আপিসে। আমি একলা। সকালের সূর্য্য স'রে গেছে, বারাণ্ডায় সারি সারি সাজান জলপাই আর কাঁচালঙ্কার আচারের বোতলে আর রোদ লাগছে না। সেগুলোকে সরিয়ে দিলুম। শুকনো কাপড়গুলো তুলে ফেল্লুম। কুকুরটাকে ছেড়ে দিলুম। তারপর দোতলায় গেলুম, যেখানে উত্তরের ঘরে ভাঙা ড্রেসিং টেবিলের উপর পুরোন মাসিক পত্রিকা গাদা ক'রে রেখেছিলুম, প্রমথবাবুর এক পরমাশ্চর্য্য জুড়ীর গল্প খুঁজবার জন্য।

অযত্নে রাখা পুরোন মাসিক পত্রিকার 'মধ্যেও আছে পুরোন জিনিষের জাদু। যা এক সময়ে অতি আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ছিলো, এখন যাতে অনাদরের ধূলো জমছে, এমন সব কিছুতেই আছে। নিস্তব্ধ দুপুরে আমি সেই ধূলোর মন্ত্রে ডুবে গিয়েছিলাম, হঠাৎ সতর্ক হ'য়ে চোখ তুলে তাকে দেখতে পেলাম। তখুনি আমার চিন্তাশক্তি, আমার সম্ভব অসম্ভব বিচার করবার শক্তি দূর হ'য়ে গেলো, তাই আমি ভীত হ'লাম না, শুধু বিস্মিত হ'য়ে অনিমেষ-নয়নে তা'র দিকে চেয়ে রইলাম। সে দরজার কাছে, ঘরের ভিতর মুখ ক'রে ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার দুই কৃতার্থ চক্ষু তা'র সেই শান্ত লাবণ্য গ্রহণ করলো। আমি প্রসন্ন হ'য়ে তা'র ফিকে হয়ে যাওয়া আলতাপরা, পদ্মফুলের মতন পা দু'খানি থেকে তা'র কালোপাড় দিশী সাড়ী, সাদা জামা, অনতিদীর্ঘ কোঁকড়া খোলা চুল, তার নিখুঁত সুন্দর বিবর্ণ মুখখানি, বুকের কাছে জড় করা কেবলমাত্র দুগাছি কঙ্কণ-শোভিত হাত দু'খানি, সমস্ত শরীর দিয়ে দেখলাম। দেখলাম তার একহাতে একটি নীলসবুজ মিনে করা ছোট পেতলের বাক্স, অপর অন্য হাতে সবুজ পাথরের দীর্ঘ একছড়া মালা।

অপূর্ব্ব সুন্দর। বর্ষায় ঘন বনানীর সবুজ অন্তরালের মতন; সেই বনানীর ছায়া লাগা বর্ষার নিটোল ধারার মতন, বনানীর অন্তরালে ঘন বনের ছায়া-পড়া স্বচ্ছ সবুজ দীঘির মতন। চোখ-জুড়োন সবুজ পাথরের এক ছড়া মালা দেখলাম, আর তাঁর বড় বড় পুঁতির সঙ্গে পুঁতির আঘাত লাগার একটুখানি নিক্কণ কানে শুনলুম।

সে আমাকে দেখেনি। তার দুই চক্ষু ঘরের ভিতর নিবিষ্ট ছিল। তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে আমিও ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম। শূন্য ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখলাম কোথায় তার আগ্রহভরা চোখের লক্ষ্যস্থল, শূন্য ঘর থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার তা'র দিকে চাইলাম; দেখলাম যে রং-ওঠা পাল্লাভাঙা দরজাটা রয়েছে, সে নেই। তখনই আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হ'য়ে উঠলো, আমার বিগতযৌবন মধ্যবিত্ত জীবনে অপরূপের রং লাগলো। আমি প্রমথবাবুর সেই পরমাশ্চর্য্য জুড়ীর কথা ভুলে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে নীচে নেমে এলাম আর চোখ বুজলেই দেখতে পেলাম তা'র চম্পক আঙুলে দুলছে এক ছড়া ঘন সবুজ মালা।

কাউকে কিছু বলতে বাধছিলো; আমার স্বাভাবিক মুখরতা ভুলে গিয়েছিলুম, এ সব কথা গোপন করেছিলুম। এর মধ্যে অনেকদিন অনেক কাজে উপরে গেছি, প্রতীক্ষা ক'রে থেকেছি, আর তা'কে দেখি নি। ক্রমে তা'র ছায়া মনের মধ্যে অস্পষ্ট হ'য়ে এলো, মনে সন্দেহ হ'তে লাগলো, সত্যি বোধ হয় তাকে দেখিনি, স্বপ্ন দেখেছি। এমন সময় যখন মন থেকে তার বিন্দুমাত্র চিন্তাও লোপ পেয়েছে, তখন তাকে আবার দেখলুম। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ দুপুরে, হেমন্তকালে, বাইরে যখন ঝোড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতার মাতামাতি।

পুরোন কাগজওয়ালাটা বহুদিন আসে নি, তাই আমি একমাসের জমান খবরের কাগজের রাশি উপরে নিয়ে গেছি। সেগুলোকে ভাঙা ড্রেসিং টেবিলের তলায় নামিয়ে রেখে, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েই তা'কে দেখলাম, এত কাছে যে হাত বাড়ালেই তা'কে ছুঁতে পারি। যতবার দেখেছি, সহসা গোটা মানুষটাকেই দেখেছি, তা'কে যেতে আসতে দেখিনি, সরূপ হ'তে দেখিনি, আমি তা'কে দেখেছি পরিপূর্ণভাবে। আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলাম তার সেই আলতা-ওঠা রাঙা পা দু'খানি, কালোপাড় দিশী সাড়ী, সাদা খোলা কোঁকড়া বেঁটে চুলগুলি, তার পাংশু সুন্দর মুখ, বুকের কাছে জড় করা দুই

নয়নাভিরাম হাত দু'খানি, তা'র হাতের মিনে করা বালা—আজ ভালো ক'রে দেখলুম তা'তে লাল চোখওয়ালা নীলসবুজ চীনে ড্র্যাগন চিত্র করা—আর তা'র বড় বড় সবুজ পাথরের সুদীর্ঘ মালা, ছাওলাদেমা সবুজ পুকুরের স্থির জলের উপর ঘন সবুজ বাঁশপাতার ছায়ার মতন, উইলোগাছের আলম্বিত পাতার ছড়ার ছায়ার মতন।

অনিমেষলোচনে দেখলুম তা'র মুখের সেই ব্যাকুল অতৃপ্তির ব্যথা, কালিমাচ্ছন্ন চোখের তারা দুটি একদিকে নিবদ্ধ। তা'র দৃষ্টিপথ ধ'রে আজ দেখলুম সেই বহুদিনের শূন্য ঘরে দামী নীল গালচে পাতা, তার উপর অযত্নে ছড়ানো রাশি রাশি ছবি, নিপুণ হাতে আঁকা সব তৈলচিত্র। আর দেখলুম জানলার কাছে কালো ঈজেলে যে অসম্পূর্ণ ছবিখানা ঘর আলো ক'রে রয়েছে তা'তে সেই পরিচিত বিবর্ণ সুন্দর মুখ, সেই কালোপাড় দিশী সাড়ী, খোলা চুল, আর সবুজ পাথরের মালা। চিত্রকরকেও দেখলাম, কিন্তু অস্পষ্ট, কারণ আমার চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসছিল, অনভ্যস্ত আবেগে হাত পা কাঁপছিল। আমি সেই ভাঙা ড্রেসিং টেবিলটাকে অবলম্বন ক'রে, চিন্তাস্রোত রোধ ক'রে আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখছিলুম চিত্রকরের দীর্ঘ দেহ, অস্পষ্ট বসনভূষণ, গৌর মুখশ্রী, চাপা ঠোঁট, বাঁকা ভ্রূ, চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সবই দেখলুম, কিন্তু অস্পষ্ট; যত না দেখলুম তার চেয়ে বেশী অনুমান ক'রে নিলুম। মনে হ'ল তার যৌবন শেষ হ'য়ে গেছে কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব সুরু হয় নি, আর তার চোখেমুখে অদ্ভুত অনাসক্তি।

আমার চতুরিন্দ্রিয় লুপ্ত হ'য়ে ছিল, কেবলমাত্র দৃষ্টিশক্তি বেঁচে ছিল। লুব্ধ চোখে যা দেখছিলাম, মুগ্ধ চেতনা তাই নীরবে গ্রহণ করছিলো, নির্ব্বিচারে, নিঃসন্দেহে।

চিত্রকর তুলিকা হাতে অপেক্ষা করছিলো, আর সে গিয়ে নীরবে আলোর দিকে মুখ ক'রে তার সামনে দাঁড়ালো। তা'কে দরজা থেকে ঘরের ভিতর অবধি হেঁটে যেতে দেখলাম না; এক মুহূর্ত্তে আমার কাছে ছিলো, এত কাছে যে তার চুলের মৃদু মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিলাম, তার স্পন্দমান হাতের মালার মৃদু শব্দ কানে আসছিল; পর মুহূর্ত্তেই তাকে ঘরের ভিতরে ঈজেলের সামনে দেখলাম। কোন কথার আদানপ্রদান হোল না; তার তৃষিত চোখের দৃষ্টি চিত্রকরের মুখের উপর গভীর প্রত্যাশায় নিবদ্ধ ছিলো আর চিত্রকরের দৃষ্টি উদাসীন ও নির্লিপ্ত। আমি যেন সেখানে নেই, তাদের কাছে আমি যেন

অদৃশ্য, আমার এই বাস্তব শরীর, এই চঞ্চল চেতনা, এই কৌতূহলী দৃষ্টি যেন সৃষ্টিই হয়নি। দেখলাম সে নিপুণ হাতে তুলির রেখার উপর রেখা টেনে যাচ্ছে আশ্চর্য্য নিশ্চয়তার সঙ্গে, তার কর্ম্মরত হাতের উপর আনত চোখের দৃষ্টি, আর অন্যজনের মুগ্ধচোখ তার মুখ থেকে ক্ষণেকের জন্য ভ্রষ্ট হচ্ছে না। সমস্ত ঘরটি জুড়ে গভীর নীরবতা বিরাজ করছে।

কতক্ষণ এই রকম ছিলাম জানি না, হঠাৎ চকিত হ'য়ে দেখলাম বেলা প'ড়ে গেছে, গাছের ছায়াগুলি লম্বা হ'য়ে আসছে। জানলার বাইরে এক মুহূর্ত্তের জন্য চেয়েছি আর সেই মুহূর্ত্তেই ঘরের সেই অপূর্ব্ব সম্ভারও কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। অনুভব করলাম আমি ক্লান্ত হ'য়ে গেছি, একভাবে ড্রেসিং টেবিল ধ'রে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হাত পা অসাড় হ'য়ে গেছে আর দুই চোখ বিস্ময়ক্লান্তিতে বুঁজে আসছে।

সমস্ত শীতকাল কেটে গেলো তা'র চিরন্তন শিহরণ নিয়ে। আমি তাদের কথা কাউকে বলতে পারলাম না। এক দিকে আমার জীবন যেমন চিরকাল ভরা ছিলো, আমার সংসার, আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়ে, আমার বন্ধুবান্ধব, আমার একশ' রকমের ছোট খাট কর্ত্তব্য দিয়ে, তেমনই রইলো। কিন্তু আর যে দিকটা আজন্ম শূন্য ছিলো অনির্ব্বচনীয়ের প্রত্যাশায়, যে প্রত্যাশা ইদানিং প্রায় নৈরাশ্যে দাঁড়িয়েছিলো, সেখানে গোপনে গুঞ্জরণ সুরু হ'ল, পত্রপুষ্পে ভ'রে উঠলো। মনে হ'ল এতদিনের যে দুঃখ আমার, আমার জীবনে অপরূপের আলো লাগ্‌লো না তাই সব ব্যর্থ হ'য়ে গেলো, সে কিছু নয়। মনে হ'ল আকাশবাতাসকে মুক্ত ক'রে পৃথিবীর চার পাশের দিগ্বলয় খ'সে পড়েছে। মনে হ'ল—সে যে কথায় প্রকাশ করা যায় না, কি ক'রে বোঝাব কী আমার মনে হ'ল।

তারপর শেষবার তা'কে দেখলাম ফাল্গুন মাসের আরম্ভের দিকে। তখন আমের বোলের আর বাতাবিফুলের গন্ধে বাতাস মধুর হয়েছে, পাতায় পাতায় বসন্তকালের হাওয়া লেগেছে, আর আমাদের ব্যবহার-না-করা দোতলায় চুণ বালি দরজার রং শুকনো হাওয়াতে খ'সে খ'সে পড়ছে। সন্ধ্যাবেলা মনে হ'ল দোতলায় কেউ আলো জেলেছে। আস্তে আস্তে গেলুম, মনে হ'তে লাগলো আমার বুকের ভিতর কে লোহার হাতুড়ী পিটছে। দরজার কাছে গিয়ে মন্ত্রাহতের মত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালুম, দেখ্‌লাম সে আমাদের ভাঙা ড্রেসিং টেবিলে ঠেস্ দিয়ে, এক হাতে মাটির

প্রদীপ উঁচু ক'রে ধ'রে ঘরের মধ্যে বিষণ্ণভাবে চেয়ে রয়েছে। অন্য হাতে সবুজ পাথরের মালা; প্রদীপালোকে তা'র স্নিগ্ধ রং আমার চোখকে মুগ্ধ করলো। শূন্য ঘরে নীল গালিচে পাতা, শূন্য ঝাড়লণ্ঠন। অযত্নে ছড়ান ছবিগুলি কে যেন যত্নে সংগ্রহ ক'রে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়ে সারি সারি দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সমস্ত ঘরে অব্যবহারের ছাপ।

আমি সমব্যথী হ'য়ে তার দিকে চেয়ে ছিলাম, সহসা সে আমার দিকে চাইলো। এবার সে আমাকে দেখ্‌তে পেলো, আমি আর অদৃশ্য রইলাম না, আমি চকিত আনন্দের সঙ্গে বুঝলাম সে আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে। মালাশুদ্ধ হাতখানা সে একটুখানি আমার দিকে এগিয়ে দিলো, তার চোখের গভীর নৈরাশ্য আমার অসহ্য বোধ হ'ল। তার চোখের দৃষ্টি যেন আমার চোখের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে লাগলো, আমি অব্যক্ত স্নেহে দুই হাত প্রসারিত করে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। মনে হ'ল হিমশীতল জলে আমি আবক্ষ অবগাহন করছি, আমার চোখেমুখে মনের ভিতর সেই হিমশীতল ছোঁয়া লাগলো, আর সে যেন আমার বাহুপাশের মধ্যে বাতাসে বিলীন হ'য়ে গেলো; কিন্তু বিদায়কালে স্পষ্ট অনুভব করলাম সবুজ মালাখানি আমার হাতে তুলে দিলো। তার সবুজ পাথরের শীতল কঠিন স্পর্শ আমার হাতে লাগলো। আমি জীবনে এই প্রথম ও শেষবারের মতন মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম।

এরা তখন খেলার মাঠ থেকে, আফিস থেকে, বন্ধুদের বাড়ী থেকে সব ফিরে এসেছে। আমায় দেখতে না পেয়ে, উপরে এসে ধরাধরি ক'রে আমাকে নামিয়ে নিয়েছে, মাথায় জলের ঝাপটা দিয়েছে, হাওয়া করেছে, আমার চেতনা ফিরে এসেছে। আমি সমস্ত প্রশ্ন থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য বালিশে মুখ লুকিয়ে ক্লান্তির ভাণ ক'রে রইলাম। অনেক রাত্রে ইয়ে বল্লে—"আজ তোমার জন্য একটা সুন্দর জিনিষ এনেছি, আর আজই তুমি আমাদের এমন ভয় দেখালে।" আমি নীরব রইলাম, সে বল্লে—"দেখ, কোর্টের কাছে হল্‌টাতে আজ অনেক পুরোন জিনিষ নিলেম হচ্ছিল, তোমার জন্য এই মালাটা কিন্‌লাম। সঙ্গে একটা ড্র্যাগন দেয়া মিনেকরা বাক্স ছিলো, কলেক্টার সাহেবের মেম অনেক দামে ডেকে নিলো।"

বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখলাম, তার হাত থেকে ঝুল্‌ছে এক ছড়া বড় বড় পুঁতির সবুজ পাথরের মালা, বাতাবি লেবুর গাছের মাঝে জলধারার মতন স্নিগ্ধশ্যামসুন্দরস্থিময়।

বই

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"We ought not to get books too cheaply".

Ruskin

আজ থেকে বিশ বছর আগেও এ ধারণা ছিল যে বই মানে খানিকটা নীরস বিদ্যার নীরব অববাহিকা। তখনকার দিনে যে সব গল্প-উপন্যাস বেরুত তাতে মোটামুটি একটা প্রধান ঘটনা বা তথ্যের সাক্ষাৎ পেতাম—শুষ্ক জ্ঞান-চর্চার ফলে যে ব্রহ্মচর্য্য বা বৈরাগ্যের জন্ম, তার অদ্বিতীয় ওষুধ হল একটি বারো থেকে চোদ্দ বছরের অবগুণ্ঠিতা সলজ্জ মেয়ের কাঁচা মন এবং পাকা কথা। একদিকে বিদ্যার্থীর নিদারুণ তপস্যা এবং ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা, অপরদিকে দিদি-বৌদিদির সুমিষ্ট ছলা-কলা, এই নিরর্থক দ্বন্দ্ব একদা বাংলা উপন্যাসের অনেক পাতা ভরিয়েছে। বই ও বউ-এর মধ্যে যে সংস্কার গত বিরোধ আছে সেটা শাস্ত্রবিধানেরই নামান্তর—এটা অকপটে ও বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া হয়েছিল। বই যে শাড়ীর মতোই সুন্দর ও দরকারী বস্তু হতে পারে সে কথা মনে উদয় হয় নি। বরঞ্চ সাহিত্যে ও জীবনে—সব জায়গাতেই ঐ অধ্যয়নতপস্যার সঙ্গে নারী-প্রেমের সহজ বিরোধ চিত্রিত হয়েছে আর পরিশেষে একজোড়া অতলস্পর্শী তারুণ্যমণ্ডিত চোখের আলোকাশ্রু-প্রভাব বিজয়ী হয়েছে।

এর একটা কারণ অন্ততঃ সহজেই বোঝা যায় যে বিগত যুগে বাঙালীর মন এবং সেই সঙ্গে তার সাহিত্য বড় এক-পেশে ছিল। জীবনের অর্থ ছিল হয় বিজ্ঞান, নয় অজ্ঞান; হয় লেখা-পড়া নয় মাছ-ধরা। আর বিদ্যা ও প্রেমের মধ্যে যে ব্যবধান—তা দুর্লঙ্ঘ্য, অনেকটা অযোধ্যা থেকে কিষ্কিন্ধ্যার দূরত্বের মতই। কিন্তু জীবনে যে বিরোধের সূত্রটাই বড় নয়; বুদ্ধি আর প্রবৃত্তি, মস্তিষ্ক আর হৃদয়, এ সবগুলোর সমন্বয়টাই আসল কথা, তা আমাদের আধ্যাত্মিক ও দূরদর্শী নজরের কোঠায় পড়েনি। আমরা ভুলেছি যে পলিটিক্স অথবা প্রেম, সাহিত্য-সেবা অথবা দেশোদ্ধার, এদের কোনোটারই সঙ্গ-বিদ্বেষী সিংহ-রাশি নয়। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে মনন আর জীবনের

মধ্যে যে আপাত-বিরোধ সেটা আমাদেরই মন-গড়া। নেশা ও পেশা পরস্পরের পথ রুখে না দাঁড়িয়ে সাহায্যও করতে পারে।

কিন্তু কি জানি কেন—আমাদের মনের মধ্যে আগেকার ধারণা এখনও খানিকটা বদ্ধমূল হয়ে আছে। জীবনের স্রোত অন্য খাতে বইতে সুরু করেছে,—সমাজ-ব্যবস্থায়, চিন্তায়, আচরণে আমরা বিদেশের কোল ঘেঁসে চলেছি, তবুও বইকে আর লেখককে আমরা জীবনের ও সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ-হিসাবে পুরো স্বীকার করে নিতে আজও পারিনি। বরঞ্চ একটা ভয়-ভক্তি-মেশানো অবৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে কৃত্রিম আভিজাত্যের মুখোস পরিয়ে ওদের একটা মিথ্যা সম্মানের ঠুন্‌কো বেদীতে বসিয়েছি। বই পড়ি অথবা ভালোবাসি—একথা অবশ্য অনেকেই স্বীকার করেন, অন্ততঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বাস করতে হলে স্বীকার না করে উপায় নেই। যেদেশে নিরক্ষরের সংখ্যা এতো বেশী, সেখানে অবশ্য সাধারণ পাঠক সম্প্রদায় খুবই কম, এমন কি অজ্ঞ বল্‌লেই চলে। কিন্তু আমরা যে বিশিষ্ট সমাজ ও শ্রেণীর মধ্যে গড়ে উঠেছি সেখানেও পাঠক-সংখ্যা শুধু কম নয়, রীতিমতো উদাসীন, নিরুৎসাহ। আজকের দিনে সেই জন-মনকে গড়ে তোলা, পাঠক-সম্প্রদায়কে তৈরী করার ভার শুধু লেখকেরই নয়—বই বিক্রেতা এবং লাইব্রেরি পরিচালকেরও সামাজিক দায়িত্ব কিছু কম নয়।

বিদেশে, বিশেষ করে বিলাতে, আজ যে এতো বইয়ের চাহিদা, তার পিছনে আছে অনেকখানি ইতিহাস। অনেক লেখক বই সম্বন্ধে লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন ও কবিতা রচনা করেছেন। এগুলি শুধু বইয়ের সমালোচনা অথবা গুণাগুণ বর্ণনা নয়—বিভিন্ন সময়ের সাহিত্যিক ও গ্রন্থকারেরা বইকে শুধু বই হিসাবেই ভালোবেসেছেন অর্থাৎ বইয়ের প্রতি নিষ্কাম প্রেমের কথাই লিখেছেন। তারই ফলে সাধারণ পাঠকের মন এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং বইয়ের রাজ্য যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং বিশুদ্ধ আনন্দ ও আমোদ পরিবেশন করতে বই-ই অদ্বিতীয়, এ কথা তারা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে শিখেছে। ব্যক্তিগত জীবনে নানা অবস্থায় ও মানসিক খেয়ালে বই না হলে আমাদের চলে না। জাতীয় জীবনেও শুধু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের খাতিরে নয়, নিত্য প্রয়োজন ও ব্যবহারের জন্যেই লাইব্রেরি প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা আছে—এ কথা একাধিক খ্যাতনামা ইংরেজী লেখক

বলেছেন। রাস্কিন লিখেছেন যে প্রত্যেক সহরে সুসভ্য জীবনের চিহ্নস্বরূপ জাতীয় লাইব্রেরি থাকা উচিত—যেখানে ভালো ভালো বাছাই বই সুন্দর ও সুদৃশ্য বাঁধাই নিয়ে পরিচ্ছন্ন নীরবতায় বিরাজ করবে।

আমাদের দেশেও অবশ্য উৎসাহী যুবকবৃন্দ-পরিচালিত কয়েকটি টলোমলো লাইব্রেরি আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বইয়ের তালিকা খুললে দেখা যাবে যে যে-সব বই রাখা হয়েছে, তার অর্দ্ধেক হ'ল অপাঠ্য উপন্যাস। এগুলি নাকি রাখতেই হয়, কারণ পাড়ার মহিলাদের চাঁদার ওপরে যে প্রতিষ্ঠানের অনিশ্চিত জীবন সেখানে গৃহকর্ম্মের অবসানে, ছেলেকে ঘুম-পাড়ানোর অবসরে, মাধ্যাহ্নিক তন্দ্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের জন্যে হাল্‌কা উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। বই নিতে এসে মহিলাদের ভৃত্য অথবা প্রতিনিধি মোটা-সোটা নভেল খোঁজে, যাতে টপ্‌ করে ফুরিয়ে না যায়। আর যেহেতু লাইব্রেরীগুলোই হল পুস্তক প্রকাশের শ্রেষ্ঠ খদ্দের এবং সাহিত্যিক প্রতিভার চরম মাপকাঠি সেজন্যে শক্তিশালী গল্পলেখককে শুন্‌তে হয়—বাজারে ছোট গল্পের চাহিদা নেই—ওসব অচল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবশ্য বড়-মানুষী বিলাসিতা কিন্তু নিস্তব্ধতাও যেহেতু সন্ন্যাস-ধর্ম্মের নামান্তর, বাংলা দেশের লাইব্রেরীতে তাই ও জিনিষটা প্রত্যাশা না করাই উচিত। এবং পড়বার ঘরে যে স্থানীয় ইতিবৃত্ত নিয়ে গভীর গবেষণা অথবা উত্তেজিত আলোচনা হয়ে থাকে, তাতে লাইব্রেরী ও রেস্তরাঁয় বিশেষ পার্থক্য থাকে না। আর যেসব মহিলা লুচি বেল্‌তে বেল্‌তে অথবা বাথরুমে যেতে যেতে বই পড়েন এবং সন্ধ্যেবেলায় নতুন বই আনবার জন্যে চাকরকে দ্বিতীয় দফা লাইব্রেরিতে পাঠান তাঁদের সাহিত্যিক রায়ের ওপরই লেখকের জীবিকা ও ভবিষ্যৎ এখনও অনেকটা নির্ভর করছে। এই ব্যবস্থায় বইয়ের সম্মান, পরিচ্ছন্নতা অথবা রস-উপভোগের কতোখানি কদর তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষালাভ অথবা মানসিক উন্নতি তো দূরের কথা।

এস্থলে আমাদের কি করা উচিত সেটা এক সমস্যা-বিশেষ। লেখক-সম্প্রদায়ের দায়িত্ব অস্বীকার করি না কিন্তু পুস্তক-বিক্রেতা অথবা প্রকাশকদেরও অনেক কিছু করণীয় আছে। বইয়ের ব্যবসায়িক মূল্য যখন সুনির্ণীত, তখন তার জন্যে প্রচার-বিভাগ খোলা উচিত। লেখকদের তরফ থেকে অথবা প্রকাশদের যৌথ-সংঘ থেকে যদি প্রচার-বিভাগের দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়

তা হলে খানিকটা সুফল হবে আশা করা যেতে পারে। অন্ততঃ আরও বেশী পরিমাণে বইয়ের কাটতি বাড়বে, এটা ভরসা করা যায়। টাকা নেই, অর্থ নৈতিক দুরবস্থা ইত্যাদি অছিলা-গুলো নিতান্তই বাজে। যেখানে সময় কাটানোর অভাবে ক্লাবে নিত্য-নিয়মিত ব্রিজ ও বেসুরো সঙ্গতের তালিম চলে, রেস্তরাঁয় বেকার-যুবকেরা ঘোড়ার কোষ্ঠীর বৈজ্ঞানিক আলোচনা চালায় এবং সাধারণ লোকে ছোটো-খাটো জুয়া খেলে কিংবা অনেক সচ্ছল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মোটর, রেডিয়ো জাতীয় সৌখীন গৃহসজ্জার আসবাব সন্ধান করে, অথবা বড়লোকে জমি কিংবা শেয়ারের বাজারে তেজী-মন্দার কারবারে ভাগ্য পরীক্ষা করে,—সেখানে বই-কেনার প্রচার কার্য্যের সার্থকতা থাকা উচিত। এমন অনেক দরিদ্র পাঠ-রসিক লোক আছেন যাঁরা বই কিনতে পারেন না অর্থাভাবে, আবার এমন অনেক লোকও আছেন যাঁদের অর্থ আছে কিন্তু তার সদ্ব্যয়ের উপায় জানেন না, এক ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বাড়ানো ছাড়া। এ ক্ষেত্রে বিদেশী "Buy Books" Campaign এর অনুরূপ প্রচার-কার্য্য যদি আমাদের দেশে চালানো যায়, তাহলে সচ্ছল ব্যক্তির পুঁজি চালু হয় বইয়ের বাজারে এবং অসচ্ছল পিপাসু ব্যক্তিও বই পড়ে বাঁচে। ইংলণ্ডে প্রচার-কার্য্যের একটা নমুনা দিই। সাধারণ লোককে বই-কেনায় প্ররোচিত করার জন্যে সেখানে অনেক ধরণের কৌশল অবলম্বন করা হয়। অন্যান্য আমোদের সঙ্গে তুলনা-মূলক বিচারে বই-পড়ার নির্দ্দোষ আনন্দ যে অনেক নিরাপদ এবং কম আয়াস-সাধ্য একথা সাধারণ পাঠককে বোঝানো হয়। ধরুন সিনেমা। কিন্তু সেখানে যেতে রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া চাপা-পড়া অথবা সিনেমা গৃহে আগুন লাগা প্রভৃতি বিপদের সম্ভাবনা আছে। তারপর রেডিয়ো। যন্ত্রের আর্ত্তনাদে ও তারস্বরে প্রতিবেশীদের বিরক্তিভাজন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একখানা বই নিয়ে আরাম-কেদারায় কোনো এক নিভৃত কোণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চিন্ত আনন্দে কাটানো যেতে পারে। এবং সে আমোদ বিনা বাধায় বিনা উদ্বেগে অব্যাহত। ভালো না লাগলে বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া চলে এবং তাতে গ্রন্থকারের কোনো আপত্তিই চলে না, অসন্তোষ-জ্ঞাপনের কোনো কার্য্যকরী পন্থাও নেই।

এ ছাড়া ওদেশে প্রকাশকেরা বছরে দু'তিনবার করে ক্যাটালগ ও বিজ্ঞপ্তি-পত্র প্রকাশ করে থাকে। এগুলি শুধু বিভিন্ন বইয়ের এলোমেলো তালিকা

নয়—বিষয় অনুসারে পাঠকের বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বইগুলোকে রীতিমত লোভনীয় করে তোলা হয়। যারা পুরানো বইয়ের কারবার করে, তারাও পুরানো দামী বইয়ের ইতিবৃত্ত, সমালোচনা ও আরো অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় দিয়ে সাজানো ক্যাটালগ বার করে। ফলে নতুন বইয়ের ক্রেতা অথবা পুরানো বইয়ের সংগ্রাহক, উভয়ের কাছেই এগুলি শুধু চিত্তাকর্ষক নয়, অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। ক্যাটালগ-সাহিত্যও একটা অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের ভাণ্ডার। Leigh Hunt সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ক্যাটালগ নিয়ে সাহিত্য-রচনা করেছেন, Lamb লিখেছেন তাঁর অনবদ্য Detached Thoughts on Books and Reading. আর Ruskin লিখেছেন পুরোনো বুক-ষ্টলের ওপর তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ A Joy for Ever. ইংলণ্ডের সাহিত্যে বই অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। নতুন বই অথবা পুরানো বই কেনা, সংগ্রহ-প্রবৃত্তি, লাইব্রেরি সাজানো, বই-বাঁধানো, বই বিক্রয়, বই-চুরি, বইয়ের পাশে দাগ-দেওয়া, মার্জ্জিনে নোট লেখা, উড্-কাট, কলফন্ ইত্যাদি কতো ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা লিখেছেন। ইংলণ্ডে যিনি সর্ব্বপ্রথম নিষ্কাম-পুস্তক-প্রেমের আমদানী করেন, তিনি হলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর Philobiblon গ্রন্থের রচয়িতা ডারহামের বিশপ Richard de Bury। তারপর থেকে যাঁরা বই ভালোবেসেছেন অথবা বইয়ের রাজ্যে দিন কাটিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। যথা—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে Bacon, Burton, Ben Jonson, Donne ও Milton; অষ্টাদশ শতাব্দীতে Dr. Johnson, Foster, Fuller, Gibbon ও Goldsmith, এবং উনিশ শতকে Southey, Lamb, Leigh Hunt, Hazlitt, O. W. Holmes, Landor ও Mrs. Browning.

বইকে বই হিসেবে ভালোবাসা, এটা বড় শিক্ষা এবং সে শিক্ষা ইংরেজ পাঠক পেয়েছে অনেক দিনের সাধনায়, অনেক বড় লেখকের মানসিক সান্নিধ্যে। Cicero বলেছেন বই আমাদের ঘরে আমোদ দেয়, বিদেশে সঙ্গী, পথে বাধা সৃষ্টি করে না, গ্রামে গিয়ে আমাদের সঙ্গে বসবাস করে। আর অনেক শতাব্দী পরে My Books প্রসঙ্গে Leigh Hunt লিখেছিলেন—"I love an author the more for having been himself a lover of books". কাজেই য়ুরোপের পাঠক যে সময়ের মূল্য বোঝে, 'হবি'

পোষণ করে, বই শুধুই ভালোবাসে না—শ্রদ্ধা করে কেনে ও প্রচার করে, তা বিচিত্র নয়। আমাদের দেশে ক'জন ধনী আছেন, bibliomaniac হওয়া দূরের কথা, যাঁর একটা ভদ্র-গোছের লাইব্রেরি আছে?

বইয়ের সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য, এটা অন্তরের জিনিষ। বই ভালোবাসতে শিখতে হয়। প্রেমে-পড়া অথবা ক্ষিধে পাওয়ার মতো সহজ না হলেও জ্ঞান-স্পৃহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে চিন্তায়, আলোচনায় শানিয়ে বাড়াতে হয়। এর অনেকটা নির্ভর করে বাল্যকাল থেকে শিক্ষা-দীক্ষায় আর সব চেয়ে বেশী নির্ভর করে পারিবারিক আবহাওয়ায়। যে ছেলে বাড়ীতে বই দেখেনি, পয়সা জমিয়ে বই কিন্‌তে শেখেনি, জীবনে পুরানো বইয়ের দোকানে ঘোরেনি, বইয়ের যত্ন করেনি,—সে পরীক্ষার সময়ে যতোই Book of Essays পড়ুক না কেন, পরীক্ষার ঠিক্ পরেই হয় বই বিলিয়ে দেবে নয় পাঠ্যপুস্তক পুরানো দোকানে বেচে দিয়ে হোটেল সিনেমার খরচ তুল্‌বে। Mrs. Browning যখন লিখেছিলেন—

We get no good
By being ungenerous, even to a book,
And calculating profits,—so much help
By so much reading. It is rather when
We gloriously forget ourselves and plunge
Soul-forward, headlong into a book's profound,
Impassioned for its beauty and salt of truth—
'Tis then we get the right good from a book.

তখন তিনি নিজের জীবনে বই পড়ার আত্মবিহ্বল আনন্দ স্মরণ করেই কবিতা রচনা করেছিলেন। আর Leigh Hunt যখন বলেছিলেন—When I speak of being in contact with books, I mean it literally. I like to lean my head against them—তখন বইয়ের প্রতি তাঁর শারীরিক কামনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। এ সকল উক্তি কেবল সাহিত্যিক উচ্ছ্বাস নয়, অনেকদিনের সঞ্চিত অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার অকৃত্রিম প্রকাশ। যে আনন্দ ব্যক্তিগত উপলব্ধি নয়, তা আন্তরিক নয়, ভাষায় ব্যক্ত করে পরকে তার এতোটুকু অংশ দেওয়া যায় না।

বইয়ের প্রতি এ রকম মনোভাবকে 'পুস্তক-চর্য্যা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ইংরেজী সাহিত্য থেকে অনেক নজির উদ্ধার করা যায়, যেখানে

বইয়ের চর্চ্চা বিশুদ্ধ প্রেমের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। শেকস্‌পীয়রের ২৩ সংখ্যক সনেট ও সুইন্‌বর্নের Cupid and the Book of Poems, বিশেষ করে Spenser-এর To His Book; Of His Lady—এর উৎকৃষ্ট নমুনা। এমন কি কোনো কোনো কবিতায় প্রিয়তমাকে বইয়ের সঙ্গে সবিশেষ তুলনা করা হয়েছে।

ইংলণ্ডে সাহিত্যের মধ্যস্থতায় এ ধরণের সূক্ষ্ম প্রোপাগ্যাণ্ডা এবং পাঠকের মনে সার ফেলার কাজ অনেকদিন ধরে চলে আসছে। আমরা কিন্তু বইয়ের ব্যবহারিক ও আর্থিক মূল্যকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে এসেছি, ফলে বইয়ের জগৎ আর প্রেম ও জীবনের রাজ্য দুটো উল্‌টো দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এদেশে বইয়ের মূল্য অবাস্তব, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই বললেই চলে।

একবার কোনো এক কৃতকর্ম্মা আত্মীয়ের কাছে উপদেশ পেয়েছিলাম যে কবিতা ও গল্পের বই ছাপিয়ে কোন লাভ নেই, তেমন বিক্রী হয় না। বরঞ্চ ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক লিখলে দু'চারপয়সা আয় করতে পারা যায়। কয়েকটি স্বনামধন্য সফলজীবন গ্রন্থকারের নামোল্লেখও করেছিলেন, যথা—সুবল মিত্র, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় আরও যেন অনেকে। অভিধান ও পাঠ্যপুস্তক ঠিক সাহিত্যের কোঠায় পড়ে না,—এ কথা তাঁকে বোঝাতে পারিনি। অথচ ইংলণ্ডে কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, অথবা হাস্যরসাত্মক লঘু রচনার কথা দূরে থাক্, শুধু পুস্তক-প্রীতি নিয়েই একাধিক বই বেরিয়েছে। কোন্ লেখক শুধু বই ভালোবাসতেন এবং সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কি কথা বলে গিয়েছেন, সেগুলিকে সুসংবদ্ধ সংকলন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে; যথা—Alexander Ireland-এর The Book-lover's Enchiridion, Brander Matthews এর Ballads of Books এবং Leonard-এর The Book-lovers' Anthology. এ ধরণের বই আমাদের সাধারণ জীবনে কাজে লাগে না, তবু তার পাঠক আছে এবং কৌতূহল-নিবৃত্তি আর অবসর-বিনোদনের জন্যে তার চাহিদাও আছে এবং থাকবে।

অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার দিনে বই-কেনা একটা বিলাসিতা একথা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমরা অনেক সময়ে নিতান্তই অনর্থক বাজে খরচ করে থাকি। সেটা বাঁচিয়ে বই কিনলে আমাদের গায়ে লাগে না। কিন্তু জনসাধারণের মনকে তৈরী করা চাই, এবং তার জন্যে লেখক ও

প্রকাশকের মধ্যে একটা সদ্ভাবজনিত যৌথ-প্রচেষ্টার দরকার। উভয়ের সামাজিক দায়িত্ব অনেকখানি, এটা অস্বীকার করা যায় না। Somerset Maugham-এর আলোচনা প্রসঙ্গে একবার বুদ্ধদেব বহু এসব কথা তুলেছিলেন এবং বোধ করি কিছু অখ্যাতিও কিনেছিলেন। কারণ আমাদের এখনও একটা সত্যযুগোচিত সাত্ত্বিক ধারণা আছে যে লেখক মাত্রেই নিষ্কাম গুরু, তাঁর পয়সার দরকার নেই। বই ধার করে পড়াই ভালো, কারণ তার অদৃশ্য পাখা আছে। হাল্‌কা বই পড়ে আমোদ পাওয়া যায়, সময়ও কাটে ভালো, কিন্তু বই কেনা হ'ল সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ। এবং সে-সব আলোচনায় এমন একটি বাস্তব স্থূলতার ছোঁয়াচ আছে যা শিক্ষিত লোকের এড়িয়ে যাওয়া উচিত, উত্থাপন করাই উচিত নয়।

প্রকাশকদের উচিত মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য ক্যাটলগ ছাপানো। তাতে সস্তা নতুন বই, পুরানো দামী বই, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাধারণ পাঠকের সামর্থ্য ও রুচি-অনুযায়ী বই-এর তালিকা থাকবে। আর ইংরেজ প্রকাশকের অনুকরণে ভালো ভালো আর্টিষ্টের আঁকা ছবি 'Book Tokens' হিসেবে ছাপ্‌লে সেগুলো চিত্তাকর্ষক হবে। পরিশেষে ক্রিস্‌মাস, পূজা উপলক্ষ্যে বছরে দু-একবার Special Gift Offer করলে আশা করা যায় পাঠক-সংখ্যা বাড়বে। "Then and Now". এর মতো এদেশে যদি নামজাদা প্রকাশকেরা একখানি সাময়িক পত্রিকা বার করেন, তাতে সাধারণ পাঠকের রুচি মার্জ্জিত হয়, বই-কেনা সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়ে এবং খানিকটা সুচিন্তিত নির্দ্দেশও পাওয়া যায়—কি কি ভালো বই বেরুচ্ছে যা পড়া বা কেনা উচিত।

যদি এমন সুদিন কোনোকালে জাতীয় জীবনে আসে, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের কোনো এক নবীন কবি বইয়ের ওপর এমনতরো সার্থক কবিতা লিখতে পারবেন :

"I am the book for good or ill,
Over the counter and past the till.
I'm at your elbow, I'm by your bed,
Just open a page and I'm into your head.
I'll show you how, I'll tell you why,
I'l take you in arm-chairs up to the sky.
Yes, books, books, books,
You can't get along without books."

কাঠখোদাই : সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

চিত্রকরের সৌজন্যে

ত্রিশঙ্কু

প্রমথনাথ বিশী

মধ্যাকাশে নিরলম্ব মেঘসহচর
নিঃসঙ্গ ত্রিশঙ্কু আমি। হেরি অবিরাম
চন্দ্র সূর্য্য দুই মাকু করে ছুটাছুটি—
কালের বসন বেড়ে চলে নিরন্তর
পাঞ্চালী-অঞ্চল দীর্ঘ। তৃপ্ত চাতকের
ডানা-ঝরা বারি বিন্দু শুকায় আমার
প্রলয় নিঃশ্বাস তাপে ; মত্ত চকোরের
স্বপ্ন ভাঙে অকস্মাৎ বজ্র-অনুকারী
অট্টব্যঙ্গহাস্যে মোর ; আমি সে ত্রিশঙ্কু !
স্বর্গে মর্ত্ত্যে ব্যবধিয়া প্রশ্নের খাঁড়ায়
আমি চির লম্বমান ; মর্ত্ত্যের দুঃস্বপ্ন
আমি, স্বর্গের কৌতুক ; জীবন অতীত
মোর, মৃত্যু অনাগত।

সুপ্তি আর স্বপনের প্রত্যন্ত সীমায়
অরাজক যাযাবর অশ্বে দুরাশার
আমি ভ্রান্ত ভ্রাম্যমাণ ; নিঃসঙ্গ ত্রিশঙ্কু
আমি ছায়ামাত্র সাথী।

২

ওই নিম্নে, পদ নিম্নে, ক্ষীণ যায় দেখা
সমুদ্র ; উর্ম্মিত তটে কম্পিত শাখায়
সিন্ধুশকুনের দল ; ক্ষুদ্র ঈগলের
তীক্ষ্ণ নখরে বিক্ষত বৃক্ষ দেওদার ;
যে-গিরি খোলে না কভু স্তনিতশিখর
দিবসের-লুব্ধ রৌদ্রে, শুধু রাত্রি জানে,

(তীরকিন্ত-নির্জ্জনতা স্তব্ধ রজনীর)
ভবিষ্যের শুভ উৎস সম্ভাবনাময়ী
সে স্তন কান্তিরে। হায় আমারি সে ধরা !
অনুমানগম্যা এবে রয়েছে বিস্তৃত
প্রণয়ীর পরিত্যক্ত ভূর্জ্জপত্রলিপি
শুষ্ক, শীর্ণ, জীর্ণ, দীর্ণ, বলিত, স্খলিত।

আর উর্দ্ধে, ওই উর্দ্ধে, তাম্রময় টাট
আকাশের। প্রতিরাত্রে আসে বাহিরিয়া
নক্ষত্রের পিপীলিকা সারি, চন্দ্রমার
লোভে লোভে ; প্রতিদিন কাতারে কাতারে
রামের কটক চলে মেঘ-মেথলায়
অফুরন্ত ; নভনীলে পুঞ্জিত জলদ
রচে নব সেতুবন্ধ ; গর্ব্বী গরুড়ের
পক্ষদাহী ইরম্মদ অসংখ্য শাখায়
আকাশে বিতান মেলে ; করুণায় যবে
বর্ষণ-উন্মুখ মেঘ, কোথা হ'তে হায়
অট্ট বজ্র হাহা হাস্যে দেয় করতালি
ধিক্কারি নিজেরে। এই তো আবাস মোর !

৩

কর্ম্মহীন বাহু মোর, স্বপ্নহীন আঁখি ;
সুপ্তি নাহি, নাহি জাগরণ ; নাহি তৃপ্তি,
নাহিকো তিয়াষা ; এর চেয়ে ক্ষুধা শ্রেয়,
ক্ষুধা অপ্রমেয় ; এর চেয়ে তৃষ্ণা ভাল
অগস্ত্যের ; এর চেয়ে মিথ্যা সেও ভাল ;
মিথ্যা ভাল, মৃত্যু ভাল, ভাল অন্ধকার ;
নৈষ্কর্ম্ম্যের গোধূলিতে দোদুল্য বাদুড়
তার চেয়ে কৃপ্য কিবা ? হায় ভগবান্ !

৪

জীবনের দ্রাক্ষাবনে পশেছিনু কবে
আজ সে অনেক দিন। মেঘায়িত ফল
মিথ্যা অমৃতায়মান ; কত লগ্ন, মত্রি,
নিঃশব্দে ভাসিয়া এসে হৃদয়ের ঘাটে
দাঁড়ায়েছে হংস-দূত ; কত চুম্বনের
স্খলিত চুণির হার গিয়েছে ছড়ায়ে
ব্যর্থতার ধূলি তলে ; কত না চোখের
চকোর ভুলেছে পথ কুন্তলিত মুখে।
আদর্শের হরধনু সে-ও লভ্য ছিল,
স্পর্শি নাই ; কর্ত্তব্যের করাতে চিরিয়া
সাধি নাই কর্ণব্রত! শুধু একা একা
হৃদয়দণ্ডকবনে মরিয়াছি ছুটে
রাক্ষসী মৃগের পিছে। কে নিল ছলিয়া
জীবন সীতারে মোর? কে নিল ছিনায়ে
ভূমি হৃদিদীর্ণ পৃথিবীসম্ভবা
জীবনের জানকীরে? হায় ভগবান্!
জীবনেরে করিয়াছি অবহেলা ; তাই
স্বর্গমর্ত্ত্য মধ্যশায়ী দ্যুলোকের দ্বীপে
জীবনের অভিশপ্ত, নির্ব্বাসিত আমি।
দুঃখের শিখরচ্যুত অশ্রুসরস্বতী
লুপ্ত হ'ল বালুকায় ; বাজে কলধ্বনি
ধরা গর্ভে অবিরাম ; কে যেন শানায়
স্রোতস্বিনী-অসিলতা তৃষ্ণার পাথরে
ব্যঙ্গ-করুণায়! জীবন-গাণ্ডীব ভার
অসমর্থ-হাতে তুলে দাও ধনুঃশর
স্বপনের ; স্বপনে খেলিব খেলা, লুপ্ত
জীবনের ; স্বপ্ন ভাল নাস্তিক্যের চেয়ে ;
সুপ্তি ভাল নৈষ্কর্ম্যের চেয়ে, ভগবান্!

৫

যার স্বপ্নও গেছে, সুপ্তিও গেছে যার
তার—
সুখ গেছে হায়, সাথে সাথে গেছে স্মৃতিটুকু বেদনার—
আর—
জীবন মরণে জীবন্মৃতের আছে কোন্ অধিকার!
আলো ছায়া সদা ছক কেটে কেটে
কোষ্ঠি রচিছে কার?
কালের দেয়ালে যুগ-বিদ্যুৎ
ধ্বংসের লিপিকার।
আর—
নিশীথের কালো বালু-ঘটিকায়
তারার কণিকা নিয়ত ঝরায় ;
(সময় ফুরায়, সময় ফুরায়)
কাল-চন্দ্রমা ঠেকেছে আসিয়া
শেষ কলাটিতে তার।
শুধু সময়াতীতের সময়াস্তের
নাহি কোন অধিকার।
সুপ্তিও গেছে, স্বপ্নও গেছে যার।

স্রষ্টা আবার তূণীরে ভরিবে
সৃষ্টির শর যত
সাগরের বারি সাগরে ফিরিবে
নদী ধারে অবিরত।
দেবতা অমর? সেও নহে ভবে।
জানি একদিন, নাহি জানি কবে,
প্রলয়-সিন্ধু-মথিত গরলে
(দলে, দলে, দলে)
পড়িবে জীবন-হত,

শুধু সৃষ্টিছাড়ার সৃষ্টি নাশের
নাহি দেখি কোন পথ।

দর্শকহীন রঙ্গমঞ্চে নাট্যেতে নিরাশার
আমি সে নায়ক
ভ্রষ্ট সায়ক—রুষ্ট সে বিধাতার।
আর—
দুখের পাষাণ? সেও ভীত মোরে
পালায়ে লুকায় সাগরের ক্রোড়ে;
শূন্যতা চেয়ে দুঃখও ভাল শত সহস্রবার।

আর—
মত্ত-অশ্ব জীবন-রথের চক্রেতে ক্ষুরধার
শিথিল রশ্মি স্খলিত-রথীর ধূলায় শয্যা; তার
কর্ম্মবলয় স্খলিয়া পড়েছে গর্ভে শূন্যতার।
যার—
স্বপ্নও গেছে, সুপ্তিও গেছে যার
তার—
সুখ গেছে হায়, সাথে সাথে গেছে স্মৃতিটুকু বেদনার
আর—
জীবন মরণে জীবন্মৃতের আছে কোন্ অধিকার॥

ফাঁদ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভদ্রার বাবা একটি নাম করা যাত্রার দলে তবলা বাজাইত। সেই যাত্রার দলেই বার তের বছর বয়স পর্যন্ত সুভদ্রা কৃষ্ণ সাজিয়াছিল। কৃষ্ণ সাজিয়া গোপিনীদের পাকা পাকা কথা ও মিষ্টি মিষ্টি গান শোনানো বন্ধ করিতে করিতে সুভদ্রার বয়সটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। অভিনয় বন্ধ করিয়া বাড়ী পাঠানোর কথা তুলিলেই সুভদ্রা ক্ষেপিয়া যাইত। শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী অবশ্য তাকে পাঠাইয়া দিতে হইল। বিবাহের আয়োজনও চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ না সাজিয়াই একসঙ্গে পাড়ার তিনটি ছেলের সঙ্গে প্রেম আরম্ভ করায় কলঙ্কের আর সীমা রহিল না। আরেকজনের সঙ্গে সুভদ্রা তখন একদিন গেল পালাইয়া। পালানোর সময় কোন আপনজনের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা অবশ্য তার ছিল না, কিন্তু পালানোর আগে যার সঙ্গ ছাড়া সে একটা দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না ভাবিয়াছিল, দু'দিনের মধ্যে তাকে দেখিলেই তার সমস্ত শরীর রাগে সিরসির্ করিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গীটিকে ছাড়িয়া সে তাই গিয়া হাজির হইল দূরের এক গ্রামে তার দিদির কাছে। সেখানে মিষ্টি মিষ্টি গান গাহিয়া সকলকে সে মুগ্ধ করিয়া দিল, আর একটু ভাব করিল ভগ্নীপতির সঙ্গে। সে খেলা ভগ্নীপতি বুঝিত না যে খেলায় শুধু পরস্পরের মন ভুলানো আর সব আছে কিন্তু ধরা দেওয়া নাই। একদিন তাই অসময়ে জোর করিয়া সুভদ্রাকে জড়াইয়া ধরায় সেটা দিদির চোখে পড়িয়া গেল।

কিছু দূরের একটি গ্রামে মহেন্দ্র নামে ভগ্নীপতির একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সদ্য সদ্য বৌ মরিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে তার সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দিয়া দিল।

মহেন্দ্রের সঙ্গে বড় ভাব হইয়া গেল সুভদ্রার। ভয়ানক বদমেজাজী মানুষ মহেন্দ্র, লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড তার শরীর আর শরীরে ষাঁড়ের মত জোর। মেয়ে-মানুষ যে মোলায়েম জীব এটা বোধ হয় তার জানাই ছিল না। তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠুর পৌরুষ, বীভৎস ভালবাসা আর বাস্তব দরদ যেন সাবান দিয়া আছড়াইয়া কাপড় কাচার মত সুভদ্রার মনের ছেলেমানুষী ময়লা সাফ করিয়া দিল। মনের আনন্দে সুভদ্রা বৌ হইয়া কাটাইয়া দিল কয়েকটা বছর।

তারপর আবার তার মনটা কেমন করিতে লাগিল একটা অজানা কিছুর জন্য। মহেন্দ্রের আলিঙ্গনে শিহরণ জাগার বদলে দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তার মনে হইতে লাগিল, রসিক নামে যে রোগা লম্বা ভীরু ছেলেটা মাঝে মাঝে আসে তার কাছে কি মন কেমন করার ওষুধ আছে? সাধন বৈরাগী নামে যে রূপবান পুরুষটা তার মন ভুলানোর চেষ্টায় নাওয়া খাওয়া ছাড়িয়াছে সে কি তাকে দিতে পারিবে সে যা চায়?

একদিন মাঝরাত্রে সুভদ্রা ধরা পড়িয়া গেল। রাশি রাশি মেঘে ঢাকা আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল টিপি টিপি, মোলায়েম একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সারাদিনের গা-জ্বালানো গরমের পর, একেবারে অচেতন হইয়া ঘুমানো উচিত ছিল মহেন্দ্রের। আগের রাত্রে গরমে সিদ্ধ হইতে হইতেও সে মরার মত ঘুমাইতেছিল, সুভদ্রা কখন উঠিয়া গিয়া কখন বিছানায় ফিরিয়া আসিয়াছিল কিছুই টের পায় নাই। দু'চারটি রাত্রি বাদ দিয়া দিয়া তার আগের আরও পাঁচ সাতটি রাত্রেও টের পায় নাই। আজ যে কেন তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

হয় তো জাগিয়াই ছিল, কে বলিতে পারে। একবার ঘুমাইলে মহেন্দ্রের ঘুম সহজে ভাঙ্গে না। উঠিয়া যাওয়ার সময় সুভদ্রা আস্তে তার গায়ে একবার ঠেলাও দিয়াছিল। গায়ে ঠেলা দেওয়ায় যে জাগে নাই কয়েক মিনিট পরে আপনা হইতে তার ঘুম তো ভাঙ্গিবার কথা নয়।

রসিক গায়ে জড়াইয়া আসিয়াছিল ছেঁড়া একটা সস্তা কম্বল। ভয় পাওয়ার অভ্যাস থাকিলে কম্বল জড়ানো সেই চেনা মানুষটিকে দেখিয়া সুভদ্রা হয় তো মূর্চ্ছা যাইত। তার বদলে বর্ষা বাদলের রাত্রে ভালবাসিয়া জ্বালাতন করিতে আসিয়াছে বলিয়া রসিকের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া তাকে সে টানিয়া নিয়া গেল উঠানের দক্ষিণে ধানের মরাইটার গা-ঘেঁষা ছোট আটচালার নীচে। আটচালার অর্দ্ধেকটা ভরিয়া ছিল চ্যালানো আম কাঠে আর বাকী অর্দ্ধেকটা ভরিয়া ছিল চাষের যন্ত্রপাতি আর ভাঙ্গা গরুর গাড়ীর চাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ছমড়ানো কেনেস্তারা পর্য্যন্ত রকমারি জঞ্জালে। তার মধ্যে একটু স্থান করিয়া রসিকের গায়ের কম্বল বিছাইয়া তারা বসিয়াছিল।

তারপর রসিকের বুকে মাথা রাখিয়া ভর্ৎসনার সুরে সুভদ্রা সবে বলিয়াছে, 'আজ আবার কেন এলে শুনি মুখপোড়া?'

আর আবেগ ও আবেদনে কাঁদ কাঁদ গলায় রসিক সবে জবাব দিয়াছে, 'না এসে থাকতে পারলাম না, মাইরি বলছি—'

এমন সময় সেখানে মহেন্দ্র আসিয়া হাজির। দু'জনকেই মহেন্দ্র সম্ভবত খুন করিয়া ফেলিত কিন্তু নাগাল সে পাইল না একজনেরও। লম্বা রোগা বাইশ বছরের ছোকরা রসিক চোখের পলকে উধাও হইয়া গেল আর স্বভাব খারাপ হইলেও ঘরের বৌ এতরাত্রে ঘরেই থাকিবে জানিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া গেল রসিকের পিছনে। সেই অবসরে গোয়ালের পিছন দিয়া সুভদ্রা পালাইয়া গেল উল্টা দিকে।

সেদিকেও ঘুমন্ত গ্রাম ছিল অনেক দূর অবধি ছড়ানো, কুকুর ডাকিতেছিল এদিকে ওদিকে, দূরে শোনা যাইতেছিল চৌকীদারের হাঁক আর জমকালো ভেজা অন্ধকার ভরাট করিয়া খেয়ালের নাগাল ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল ব্যাঙের গানের একটানা আওয়াজ। সোহাগী বৌ রঙীন শাড়ী পরিতে পায় বলিয়া আর রঙীন কাপড় অন্ধকারে সাদা কাপড়ের মত সহজে চোখে পড়ে না বলিয়া নিজেকে সুভদ্রার মনে হইতেছিল ভাগ্যবতী।

গ্রামের শেষ বাড়ীটি শুধু মোটা দুই ভাঙ্গা ঘর, তারই একটিতে এত রাত্রে একজন গান গাহিতেছিল। চেনা চলতি গান, সুভদ্রার নিজের গান। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে গান শুনিল। খণ্ডিতা রাধার মানভঞ্জনের জন্য তখন সে যে গানটি গাহিত ভাঙ্গা মোটা গলায় ভুল সুরে কথা বদলাইয়া গাহিতেছে বটে অদৃশ্য গায়ক, কিন্তু আবেগ আছে লোকটার।

আবেগভরা লোকগুলি বড় অধীর হয়। ভিজা শাড়ীখানা গায়ে আঁটিয়া গিয়াছে, দেখিবামাত্র হয় তো সাপটাইয়া ধরিবে। ওভাবে কেউ সাপটাইয়া ধরিলে বড় খারাপ লাগে সুভদ্রার। গা বমি বমি করে, দম আটকাইয়া আসে, মনে হয় সে যেন হঠাৎ এগার বছরের মেয়ে হইয়া গেছে আর যাত্রা দলের সেই যুধিষ্ঠির শেষরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বেশধারী তাকে আসরের খানিক তফাতে একটা ছোট আটচালার নীচে ডাকিয়া নিয়া গিয়া এক হাতে তার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে আর আরেক হাতে তাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে কাছি দিয়া বাঁধার মত।

কিন্তু উপায় ছিল না। এত রাত্রে কে আর তাকে খাতির করিবে। সুভদ্রাকে ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। সাধন বৈরাগী মূর্চ্ছা গেল না, দু'চোখ বড় বড় করিয়া গানের বদলে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করিতে লাগিল।

সুভদ্রা বলিল, 'আমি গো আমি।'

তখন সাধন বৈরাগী শান্ত হইল। কিন্তু আবার অশান্ত হইয়া উঠিল অল্পক্ষণের মধ্যেই, আনন্দ ও উত্তেজনায়।

প্রথমে সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, রসিকের জন্য বোধ হয় একটু মন কেমন করিবে। একটু যেন পছন্দ হইয়াছিল রসিককে তার, দু'একদিন গভীর রাত্রে তার যেন মনেও হইয়াছিল, বেতালা বাঁশীর সুরে জানান দিয়া আজ কি রসিক আসিবে? ভাসা ভাসা একটু রসজ্ঞান ছিল রসিকের, দুপুর রাতের গোপন মিলনে মাঝে মাঝে একটু রসের সঞ্চারও যেন সে করিতে পারিত। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া যে ভাবে তার মন কেমন করিয়া আসিয়াছে এখনও তেমনি-ভাবে মন কেমন করিতে লাগিল বটে, সেটা রসিকের জন্য নয়। স্বামীর ঘরে ফেলিয়া আসা শাড়ী গয়নার মত রসিকও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, এতটুকু আপশোষও সুভদ্রার নাই। রসিক বলিয়া কেউ কি কোনদিন তার মাথার চুলে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে বর্ণনা করিত আসিবার সময় কোন বাড়ীতে নতুন বর ও বধূর ঘরে বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়া একজনকে কি ভাবে আর একজনের পায়ে ধরিয়া সাধাসাধি করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, আর শুনিতে শুনিতে তার মনে হইত সে যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে, মুক্তি পাইয়াছে, চাঁচের বেড়ায় ঘেরা চারকোণা জেলখানায় জোরালো দু'টি বাহুর বন্ধন যেন তার আর নাই।

মনটা সুভদ্রার খুঁতখুঁত করে, এরকম হওয়া উচিত ছিল না। রসিকও শেষ পর্য্যন্ত তাকে ফাঁকি দিল, এতটুকু স্থান দাবী করিতে পারিল না তার মনে।

সাধন বৈরাগীর চেহারাটি বড় সুন্দর। প্রথম দিন তাকে দেখিয়াই সুভদ্রা তীব্র বিদ্বেষ আর হিংসা অনুভব করিয়াছিল, মনে হইয়াছিল এই লোকটাই বুঝি জীবনযুদ্ধে তার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী। তারপর সাধনের অনেকদিনের প্রাণপাত সাধনার পুরস্কার স্বরূপ দূর হইতে একটু একটু ভাব করিয়া এতকাল তাকে শুধু সে যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে। এখন হঠাৎ একেবারে ধরা দিয়া, অনেক দূরের অচেনা এক সহরে অজানা মানুষের মধ্যে ছোট একটি টিনের ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে বসবাস করিবার মত ভয়ানকভাবে

ধরা দিয়া, সুভদ্রা দেখিল লোকটাকে সে যেরকম ভাবিয়াছিল সে মোটেই সেরকম নয়। বিদ্বেষ বা হিংসার কোন কারণ নাই, বরং রীতিমত অবজ্ঞা করা চলে। যে জোরালো আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আশঙ্কা সে করিয়াছিল সেটা জোয়ারের মত নয়, কলের ফোয়ারার মত। তাও আবার সে উৎসের ভাণ্ডারে সঞ্চয় বড় কম, কলটাও গিয়াছে বিগড়াইয়া, হঠাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে উথলাইয়া উঠিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝিমাইয়া পড়ে। শুধু চেহারার টানে অনেক মেয়ে আসিয়া তার রসটুকু শুষিয়া নিয়া গিয়াছে বুঝা যায়। আর রাখিয়া গিয়াছে অহঙ্কার, স্বার্থপরতা আর পাগলামি, যে সব কোনদিন কোন মেয়ের কোন কাজেই লাগে না।

সুভদ্রা হতাশ হইয়া ভাবিল, তাইতো।

সে রাত্রে ভিজা রঙীন শাড়ীটি ছাড়িয়া সুভদ্রা সাধন বৈরাগীর গেরুয়া লুঙ্গি আর আলখাল্লা দিয়া নিজেকে ঢাকিয়াছিল। পরদিন পথে তার জন্য দু'সেট শাড়ী ও সেমিজ কিনিয়া গেরুয়া রঙে ছাপাইয়া নেওয়া লইয়াছিল। তখন দু'জনকে দেখিয়া মানুষের মনে হইয়াছিল, স্বর্গের কোন দেবতা বুঝি একটি অপ্সরাকে সেবাদাসী করিয়া মর্ত্যলোকে বেড়াইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

এখানে ওখানে যে ক'টা দিন তারা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত লোক সাগ্রহে তাদের সেবা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, প্রণামীও দিয়াছে। সুভদ্রার বড় ভাল লাগিয়াছিল সে জীবন। কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, কি খাইবে, কে জানে! পথ চলিতে আলস্য বোধ করিলে একটা গরুর গাড়ীকে থামাইয়া উঠিয়া বসিলেই হইল। বাঁধানো বড় সড়কে একদিন দামী একটা মটরগাড়ী দাঁড় করাইয়া দুজনে উঠিয়া বসিয়াছিল, হাওয়ার বেগে চল্লিশ মাইল পথ পার হইয়া গিয়া পৌঁছিয়াছিল সদরে। ক্ষুধা পাইলে ময়রার দোকানে খাবার চাহিয়া খাইলেই হয়, মুদীর দোকানে চাল-ডাল চাঁহিয়া গাছতলায় রাঁধিলেই হয়, নয়তো গৃহস্থের বাড়ী গিয়া বলিলেই হয়, আমরা আসিয়াছি ভিক্ষা দাও। পয়সা দরকার হইলে, দু'চার দশজনের কাছে চাহিলেই চলে। আশ্রয় তো আছে সর্ব্বত্র, মুচির ভাঙ্গা ঘরে নোংরা মেঝেতে সঙ্গের কম্বল বিছাইয়া চামড়ার গন্ধ নিশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, ফুল ও চন্দনের গন্ধভরা মন্দিরের বাহিরে অতিথিশালায় জীবন্ত মানুষের ভাপ্‌সা গন্ধ নিশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, চোর ডাকাত কি খুনির

আস্তানা সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আশ্রয় নেওয়া যায় বড়লোক গৃহস্থের বাড়ীতে। গেরুয়াধারী নরনারীর তো সম্পদ কিছু থাকে না পুণ্য ছাড়া, যা থাকে তার উপরেও তো লাভ করা চলে না, কামনাও করা চলে না সুন্দরী সন্ন্যাসীকে। তাতে পাপ হয়, পাপ করিলে মানুষ নরকে যায়। এমন নির্ভর নিশ্চিন্ত বাধাবন্ধহীন সহজ সরল জীবন যাপনের সুযোগ থাকিতে মানুষ যে কেন দম আটকাইয়া পচিয়া মরে ঘরের মধ্যে!

কিন্তু সাধন বৈরাগী বলিয়াছে, 'উঁহু, এক যাগায় স্থিতি হয়ে না বসলে কি চলে?'

সুভদ্রা যদি বলিত খুব চলে, সাধনকেও অবশ্য তা মানিয়া নিতে হইত। কিন্তু মন মরা বিরক্ত আর নিরুৎসাহ সঙ্গী যদি সারাদিন প্যান প্যান করে কাণের কাছে আর মুখ ভার করিয়া থাকে চোখের সামনে, মুক্তিও কি মানুষের ভাল লাগে? এই সহরে তাই তারা নীড় বাঁধিয়াছে।

সুভদ্রা ভাবিয়াছে, আর যাই হোক, যা খুসী তো করা চলিবে এখানে, পরের কর্ত্তালি, পরের ইচ্ছা অনিচ্ছা বিধি নিষেধ তো তাকে ঘেরিয়া থাকিবে না।

ঘর বাঁধিলে রোজগারের ব্যবস্থা করা দরকার।

সাধন বৈরাগী বলিল, 'ভিক্ষে করা চলবে না কিন্তু।'

কোন রকমে দিন কাটানোর সঙ্গতি সাধন বৈরাগীর ছিল, তার মা রাখিয়া গিয়াছে। জীবনে সে প্রথম একতারা হাতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে সুভদ্রার জন্য। বাহির হইয়াছে অসময়ে, মানুষ যখন ভিখারীকে তাড়াইয়া দেয়। সুভদ্রা তাকে বঞ্চিত করে নাই, নিজেই ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে, মুচকি হাসিয়া বলিয়াছে, 'একটা গান কর তো বৈরিগি ঠাকুর।'

সুভদ্রা তাই তামাসা করিয়া বলিল, 'কেন, ভিক্ষে তো তুমি করতে বৈরিগি ঠাকুর?'

অনেক তামাসাতেই সাধন বৈরাগী পুলকিত হইতে জানে না, এদিক দিয়া মানুষটা সে একটু ভোঁতা।

রোজগারের উপায়টা ঠিক করিল সুভদ্রা। বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে যে হাত তিনেক চওড়া বারান্দাটুকু আছে সেখানে দু'টি দোকান খোলা হইল, পান-বিড়ি আর তেলেভাজার দোকান। পানবিড়ির দোকানের ভার রহিল সাধনের, তেলেভাজার দোকানের ভার রহিল সুভদ্রার। বাড়ীওয়ালা

এক[illegible]

কুম[illegible]

সুখ[illegible]

[illegible]র

[illegible]ক্তি

[illegible]

শুধু বসিয়া থাকিয়াই [illegible]

অর্দ্ধেকটাও বসিয়া বসিয়া গা[illegible]

চন্দ্রাবলী তাকে ধরিয়া নিজের কু[illegible]

হইয়া আছে কিন্তু বাহিরে সে চতুরালি করিতেছে চন্দ্র[illegible] উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্য ছাড়া এ কি প্রকাশ করা যায়? একটি হাঁটু পাতিয়া বসিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পায়ে না ধরিলে কি খণ্ডিতা রাধার কাছে নিবেদন করা যায়, হৃদয়ে যার শুধু রাধার চিহ্ন আঁকা বাহিরের অঙ্গে তুচ্ছ নখ চিহ্ন দেখিয়া তার উপর রাগ করা রাধার উচিত নয়?

গানের শেষে সুভদ্রা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। সাধন ঘরে গেল অনেক পরে। খোলা দরজার বাহিরে তখনও মানুষকে চলাফিরা করিতে দেখা যাইতেছে, কলরব শোনা যাইতেছে। সাধন ঘরে আসিবামাত্র সুভদ্রা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া তার সামনে এক হাঁটু মাটিতে নামাইয়া সামনে ঝুঁকিয়া দু'হাতে তার পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'সত্যি বলছি আমি, তুমি ছাড়া আমি কাউকে জানি না। কোন দিন কোন পরপুরুষের দিকে আমি তাকাই নি—'

সাধন তার গালে টোকা দিয়া বলিল, 'সত্যি?'

সুভদ্রা কাতর হইয়া বলিল, 'কেন সন্দেহ করছ? রসিককে যে মাঝে মাঝে আসতে দিতাম তাও তো তোমার জন্যেই? মাইরি বলছি, যখন আর

দোকানদারিতে তার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। লোকগুলি বড় ভোঁতা, বড় নীরস। বেগুনি ফুলুরি কিনিতে আসিয়া তাকে যেন সকলেই বাঁধিয়া ফেলিতে চায়, তার সাহচর্য্য ভুলিয়া যাইতে চায় নিজেদের।

বিকালেও খদ্দের আসিল অনেক এবং দিনদিন খদ্দেরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন বেগুনি ফুলুরি ভাজিবার জন্য একজন লোক রাখিয়া দেওয়া হইল। সুভদ্রা মাঝে মাঝে আসিয়া পাঁচ দশ মিনিট বারান্দায় বসিতে লাগিল আর নিজের হাতে বিক্রী করিতে লাগিল ভাজা জিনিষগুলি। বৈঠক তাই ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু সেজন্য বিক্রী কমিল না। বেগুনি ফুলুরিও কম মুখরোচক জিনিষ নয়।

বৈঠক না বসুক, লোচন, সতীশ, বংশী আর নটবর নিয়মিতভাবে আসে। কেউ সকালে, কেউ বিকালে। সুভদ্রা না থাকিলে গল্প করে সাধনের সঙ্গে, সুভদ্রা আসিলে দু'এক পয়সার বেগুনি কেনে আর দু'একটি কথা কয়।

নটবর একদিন তাকে বাবুদের বাড়ী গান গাহিবার বায়না দিয়া গেল। শুনিয়া লোচন বলিল, 'না, না, অমন কম্মোও কোরো না। ওর বাবু বড় খারাপ লোক।'

সতীশ এবং বংশীও সায় দিয়া বলিল, 'যেও না, বিপদ হবে।'

সুভদ্রা বলিল, 'বিপদ হবে? কিসের বিপদ?' তারপর হাসিয়া বলিল, 'বেশ তো, তোমরা তবে দশটা টাকা দাও আমায়, যাব না। তোমাদেরি না হয় গান শুনিয়ে দেব।'

পরদিন সত্যই তারা দশটা করিয়া টাকা নিয়া হাজির। দশটা করিয়া টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে এমনিই সহজ নয়, প্রতিদানে কিছু পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ থাকিলে সেটা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বুঝিয়া সুভদ্রা খুসী হইল বটে, মন কিন্তু তার ভিজিল না। এসব ফাঁকি সে জানে। সাতদিন একত্র বসবাস করিবার পর সে একটি টাকা বাজে খরচ করিলে এরা প্রত্যেকে তার সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া করিবে। তা ছাড়া, এবেলা টাকাটা নিলে ওবেলা এরা একা পাওয়া মাত্র তার হাত ধরিয়া টানিবে। তার চেয়ে নটবরের বাবুর বাড়ী গান গাহিতে যাওয়া অনেক ভাল।

গান কিন্তু সেখানে জমিল না,—সুভদ্রার গান। আসরে ঝালর-বসানো তাকিয়ায় হেলান দিয়া উপস্থিত ছিল শুধু বাবুর কয়েকটি বন্ধু এবং তবলচি

ও সেরাঙ্গীর কাছে সহজ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মেরুদণ্ড সিধা ক'রয়া বসিয়াছিল আরেক জন মানুষ। তার চোখে কাজল আর ছোট নূরি লালচে রঙে রাঙ্গানো। ধৈর্য্যের প্রতীকের মত সে স্থির হইয়া বসিয়াছিল, আর বাঁ হাতের আঙ্গুলের সন্তর্পণ স্পর্শ ধীরে ধীরে বিলাইয়া দিতেছিল সুরে। সুভদ্রা প্রথম গানটি আরম্ভ করার পরেই বাবু আর তার বন্ধুদের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল কিন্তু এ লোকটি চোখের একটি বাড়তি পলকও ফেলিল না। সুভদ্রা তিনটি গান গাহিবার পর বাবু বলিল, 'এবার তুমি বিশ্রাম কর। ওস্তাদজি, আপনি এবার মেহেরবানি করুন তবে?

ওস্তাদ এবার একটু হাসিয়া মাথাটি সামনের দিকে সামান্য নীচু করিল। —'সোজা সুরের একটা বাংলা গান গাই?'

'বলেন কি ওস্তাদজি, আপনি বাংলা গান জানেন?' সিগারেটের ধোঁয়া না ছাড়িয়াই সবিস্ময়ে কথাটা বলিয়া বাবুর এক বন্ধু কাসিতে লাগিল।

সুভদ্রা মৃদুস্বরে বলিল, 'জল খান, দু'ঢোঁক জল খেলেই সেরে যাবে।'

বন্ধুর কাসি থামিলে ওস্তাদ বলিল, 'জানি কিনা সে তো মালুম হবে শুনলে?'

ঠুংরীতে হাফেজের বাংলা ভাবার্থ অনুবাদ। শুনিতে শুনিতে সুভদ্রার মনে হয়, ওস্তাদের অমন সুন্দর ফুলকাটা পাঞ্জাবীর তিন চার যায়গা ছেঁড়া কেন? আরও শুনিতে শুনিতে মনে হয় যে পাৎলা পাঞ্জাবী, ছুঁচ সুতায় সে কি ছেঁড়াগুলি রিপু করিয়া দিতে পারিবে? গান শেষ হইলে তার মনে পড়ে, রিপুর কাজ সে জানে না, যাত্রার দলে যে ছেলেটি তার রাধা সাজিত সেই যেন কোথা হইতে খুব ভাল রিপুর কাজ শিখিয়াছিল।

ওস্তাদ সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগল?'

সুভদ্রা নির্বিবাদে বলিল, 'আরেকটা শুনি?'

ওস্তাদের কয়েকটি গান শুনিয়া সকাল সকাল সুভদ্রা বাড়ী ফিরিয়া গেল। বেশ বুঝা গেল, তার গানও বাবুর পছন্দ হয় নাই, তাকেও পছন্দ হয় নাই।

পরদিন ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়া ওস্তাদ সুভদ্রার বাড়ী আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, সুভদ্রা গান শিখিবে কি, গান? ভাল ভাল গান? সেই ফুলকাটা জামা পায়জামা পরিয়াই ওস্তাদ আজ আসিয়াছে, মাথায় শুধু আর একটি জরি

বসানো টুপি, আর চোখের কাজল আরও একটু স্পষ্ট। সুর্মা নয়, কাজল। কালিদাসীর ছেলের কাজলপরা চোখের মতই আশ্চর্য্যরকম কচি কচি দেখাইতেছে ওস্তাদের চোখ।

দেখিয়াই সাধন একটা কুৎসিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, নটবরের বাবু বুঝি গান শিখাইতে পাঠাইয়াছে ওস্তাদকে?

ওস্তাদ বলিল, 'তোবা তোবা, নটবরের বাবু আমার কে'?

জগতে এমন বড়লোক কে আছে যে ওস্তাদকে মনিবের মত হুকুম দিবে? বাবু তো শুধু তার সাকরেদ, ওস্তাদের বাড়ীতে যে দু'চারজন গান শিখিতে আসে তাদের সঙ্গে বাবুর তফাৎ এই যে, বাবু গাড়ী পাঠায় আর ওস্তাদ তার বাড়ী গিয়া গান শিখায়।

তারপর প্রতি সন্ধ্যায় সুভদ্রা ওস্তাদের কাছে গান শিখিতে লাগিল। কালিদাসী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'মোছলমানের কাছে গান শিখবে বষ্টুম দিদি?'

সুভদ্রা বলিল, 'মোছলমান-ই ভাল।'

কিন্তু গান শিখিতে ভাল লাগে না সুভদ্রার, কিছুই ভাল লাগে না? দোকানে নিয়মিত কেনা-বেচা চলিতেছে, ভিতরে নিয়মিত ঘর-কন্না চলিয়াছে, নিজেই সে নিজের চারিদিকে সৃষ্টি করিতেছে নিয়মের ফাঁকি আর বন্ধন। যা-খুসী সে করিতে পারে, কিন্তু যা-খুসী করিবে কি? কি আছে যা-খুসী করার? পথে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিবে? সহরের পাশে যে নদী আছে তার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে? না, বিষ খাইবে?

সাধনকে সে মিনতি করিয়া বলে, 'এখান থেকে পলাই চলো, এ্যাঁ? তেমনিভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াব দু'জনে, কি মজাটাই হবে!'

সাধন বলে, 'দূর পাগলি! ঘুরে বেড়ানোতে আবার মজা কি?'

তা ঠিক, ঘুরিয়া বেড়ানোতে হয় তো মজা লাগিবে না। সুভদ্রা এখন টের পাইয়াছে, সাধন বৈরাগীর সঙ্গে ক'দিন পথে পথে কাটানোর আসল মজাটা কি ছিল। কি সুখ ছিল সে ঘুরিয়া বেড়ানোর? কিছুই না। শুধু একটা উত্তেজনা ছিল, প্রতি মুহূর্ত্তের উত্তেজনা, পর মুহূর্ত্তে বুঝি কিছু ঘটিবে, [illegible] আবির্ভাব ঘটিবে কোন কিছুর। ক্ষণে ক্ষণে তখন সব বদলাইয়া য[illegible] পথের পর আসিত সুরকির পথ, হাট বাজারের পরে আসিত

মাঠ, তাড়িখানার পরে আসিত দেব মন্দির, এক জনের কুৎসিত মন্তব্যের পর আসিত আরেকজনের সভক্তি প্রণাম, মুচির ঘরের আশ্রয়ের পর আসিত বড়লোকের বাগানবাড়ীর আশ্রয়। এই পরিবর্ত্তন যেন প্রমাণের মতই আশা জাগাইয়া রাখিত, এ সমস্তের অতিরিক্ত আরও একটা নতুনত্ব নিশ্চয় আসিবে। সুভদ্রা কৃতার্থ হইয়া যাইবে, আর তার মন ছটফট করিবে না, উল্লাসে গদগদ হইয়া সেই নতুনত্বকে বরণ করিয়া বলিবে, এতদিন আসোনি যে বড়, আচ্ছা খামখেয়ালী নিষ্ঠুর মানুষ তো তুমি?

মানুষ? সে নতুনত্ব কি তবে মানুষ সুভদ্রার? ফাঁপরে পড়িয়া সুভদ্রা এদিক ওদিক তাকায়। কত মানুষ চলিতেছে পথ দিয়া, সকলেই একরকম, দেহকাণ্ডের সঙ্গে দু'টি হাত আর পা আঁটা, এবং উপরে একটা মাথা বসানো। কোন নতুনত্ব তো নাই এদের মধ্যে। এদের মধ্যে যাকেই সে বরণ করুক, মুখে হাত চাপা দিয়া সে শুধু তাকে জড়াইয়া ধরিবে। সে যা চায়, কি চায় তা ঠিক সে জানে না, কিন্তু যা সে চায় মানুষের মূর্ত্তি ধরিয়া আসিলে তো তার চলিবে না।

সুভদ্রার মনে তাই সন্দেহ জাগিয়াছে, সাধনের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে আর ভাল লাগিবে কিনা। জ্ঞান বাড়িয়াছে, প্রত্যাশার উত্তেজনাটুকু পর্য্যন্ত হয়তো এবার জুটিবে না।

কিন্তু ওস্তাদের সঙ্গে যদি নিরুদ্দেশ যাত্রা করে? কাছাকাছি গ্রাম আর সহরে ঘুরিয়া বেড়ানোর বদলে যদি আজ যায় দিল্লীতে আর কাল যায় বোম্বায়ে এবং তার পরদিন যায় দিল্লী বোম্বায়ের মত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আরও যে সব জায়গা আছে, যার নামও সে কোনদিন শোনে নাই?

কদিন পরে তাই গেল সুভদ্রা, তবে দিল্লী বা বোম্বায়ে নয়, সাত সমুদ্র তের নদীর পারের অন্য কোন যায়গাতেও নয়। সুভদ্রার অত পয়সা কই? ওস্তাদ গরীব মানুষ। তাই ক'দিন এখানে ওখানে ভাসিয়া বেড়াইয়া দু'জনে কলকাতা সহরে আসিয়া ঠেকিয়া গেল। তবে ওস্তাদ ভরসা দিয়া বলিল, তাতে কি আসে যায়? যেখানে খুসী যাওয়ার সাধ মনে থাক, যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে যেখানে খুসী যতদিন খুসী দিন কাটিয়া যাক, একদিন তো তারা যাইবেই যাইবে। তার বেশী আর কি চাই মানুষের? যাওয়ার চেয়ে যাওয়ার আয়োজন তো তুচ্ছ নয়, মনটাই তো যায় মানুষের খাটি একটি জরির

ওস্তাদের চোখের ঔৎসুক্য নিভিয়া গেল, আটকানো নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বাহিরের আলো আরেকটু স্পষ্ট হইয়াছে। সুভদ্রা চলিয়া গেল, ওস্তাদ আর একটি কথাও বলিল না। শেষ চেষ্টা কাজে লাগিল না, আর কি বলিবার আছে? এখন আপনা হইতে ফাঁদটি খসিয়া গিয়াছে ভাবিয়া খুসী হওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। কিন্তু সে চেষ্টা করিতে গিয়া ওস্তাদ দেখিল, ফাঁদ খসিয়া গেলেও ফাঁদে পড়া বেকুব প্রাণীর মতই ছটফট না করা অসম্ভব।

কাঠখোদাই : সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

হাইনে অবলম্বনে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

[Wir sassen am Fischerhause]

মাঝি-মাল্লার বৈকালী সভা :
আকাশ, বাতাস গোধূলি মাখে :
তার পাশে ব'সে বাহিরে তাকাই,
যেখানে সিন্ধু অসীমে ডাকে ॥

জলে একে একে দিশারী প্রদীপ,
আলোকমঞ্চ অভয়ে ভাসে ;
দূর দিগন্তে বিবাগী জাহাজ
এখনো দৃষ্টিগোচরে আসে ॥

আলোচনা হয় নাবিকজীবন :
তুফানে কি ক'রে নৌকা ডোবে ;
শূন্যে ও জলে ঘেরা কাণ্ডারী,
দ্বিধাটলমল খুশিতে, ক্ষোভে ॥

অভাবনীয়ের লীলানিকেতন
অবাচী, উদীচী, প্রতীচী, প্রাচী :
আচারে, বিচারে, বিপরীত মতি,
মানবসমাজ সব্যসাচী ॥

স্রোতে প্রতিভাত লক্ষ মাণিক,
মত্ত মলয় বকুলবনে,
গঙ্গার তীরে সৌম্য পুরুষ
সমাধিমগ্ন পদ্মাসনে ॥

ল্যাপ্‌দেশীয়েরা বামনের জাতি,
নোংরা, হাঁ বড়, চ্যাপ্‌টা মাথা,
আগুন পোহায়, মাছ সেঁকে খায়,
কথা কয় না তো ঘোরায় যাঁতা ॥

যে যা বলে, সে তা কান পেতে শোনে,
তার পরে মুখ খোলে না আর ;
দেখা যায় না সে-বিবাগী জাহাজ
বাহিরে গভীর অন্ধকার ॥

(২)

[Hat die Natur sich auch verschlechtert]

অনাচারে ডোবে নিসর্গসুন্দরী।—
মানবধর্ম্মে নিয়েছে কি সেও দীক্ষা ?
পশু, পাখী, কীট, ফল, ফুল, মঞ্জরী,
প্রাপ্ত সকলে অপলাপে লোকশিক্ষা ॥

বিশ্বাস করি কি ক'রে কুমুদী সতী ?
হাটে হাঁড়ি ভেঙে রসরঙ্গে সে লিপ্ত ;
নটবর নবকার্ত্তিক প্রজাপতি,
অবাক সাধ্বী চাটু চুম্বনে দীপ্ত ॥

ভীরু মাধবীও মনে মনে রঙ্গিলা ;
রতিপরিমলে নেই তার অনায়ত্তি ;
আপাতত যেন কুমারী লজ্জাশীলা,
আসলে সে সাধে মোহিনীর প্রতিপত্তি ॥

বুল্‌বুল্ গলা কাঁপায় যে-পালাগানে,
নেই তাতে উপলব্ধির নাম-গন্ধ ;
সন্দেহ হয়, বাঁধা গতে মীড় টানে,
অতিরঞ্জিত কাকুতির নির্ব্বন্ধ ॥

Missing Page(s)

ক্রমে ম'রে আসে সত্য সর্ব্ব ঘটে ;
নিষ্ঠা বা তার দেখা পাওয়া আজ শক্ত
কুকুরের ল্যাজ যথারীতি নড়ে বটে,
কিন্তু জগতে নেই আর প্রভুভক্ত ॥

চক্রান্ত

সমর সেন

আবার সে স্তব্ধতা কেটে যায়
সকালে মোটারের শব্দে ক্ষুরধার হাওয়ায় ;
যমুনার জলে স্নান করে ফেরে
দেহাতি মেয়ে,
পাখা থেকে জল ঝাড়ে কোমল চড়াই।

কালের চক্রান্তে সন্ধ্যা নামে
পোড়ো বাড়ীতে কাকের ভিড় কমে এলো,
ঘুম থেকে ছায়ারা উঠে আসে, ভীরু তাদের পদধ্বনি
হৃৎপিণ্ডে উৎকণ্ঠা হানে।
স্তরে স্তরে সারা রাত্রি জমে
অতীত কালের স্তব্ধতা,
আমাদের পাপী মনে সে স্তব্ধতা
দুঃস্বপ্ন রচে,
গলিত শবের সান্নিধ্যে আমাদের আনে,
জীবনের শেষ প্রান্তে করাল শূন্যের পারে আনে।

LIBRARY
&
READING ROOM
CALCUTTA

বিয়ে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এই নাটকের সব চরিত্রই সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোনো জীবিত লোকের চরিত্র আঁকবার চেষ্টা এতে হয় নি, কি কোনো জীবিত লোকের প্রতি কোনো উল্লেখও এতে নেই।
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত।

পাত্র-পাত্রী

সুব্রতি—উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ছেলে
প্রসাদ—ঐ বন্ধু
মহীতোষ—ঐ বাবা
বিল্বলোচন শর্মা—মহীতোষের দাদা
বাচ্চা চাকর
লীলা—সুব্রত'র স্ত্রী
মা—ঐ মা
মামিমা—ঐ মামিমা
সুব্রতদের বাড়ির পুরোনো ঝি
তিন-চারটি উলঙ্গ ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে

[মাঝারি ধরণের একটি বসার ঘর। ঘরে ছোটো একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও গোটা কয়েক সাধারণ চেয়ার ছাড়া আর বিশেষ কোনো আসবাব নেই। দেয়ালে জগন্নাথ দেব, কালী, ও কারপেটের ওপর হাতে বোনা একটি গোপালের ছবি। তা ছাড়া একটি ময়লা ক্যালেণ্ডার, সেখানে বাথটবে স্নানরতা একটি মেমসাহেবের ছবি। আর একটি বড় ফটো, এককালে জমকালো বাঁধানো ছিল, এখন জীর্ণ। ছবিটি কোনো একটি বিধবার, এখন এতো আবছা হয়ে এসেছে যে বোঝা কঠিন। তিনি মহীতোষের মৃত মা। উক্ত ছবিতে শুকনো গাঁদাফুলের একটি মালা পরানো। ঘরের ডান দিকে ও বাঁদিকে দুটি দরজা। ডানদিকের দরজাটি রাস্তার ওপর। সেখান দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয়। ঐ দরজার পাশেই একটি জানলা। শিকের গরাদ দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে যেতে হয়। সে দরজা এখন বন্ধ। খুললে ভেতরের খানিকটা অংশ দেখা যায়।

এখন দুপুর। পথে ফেরিওয়ালার অস্পষ্ট ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। কাছের বস্তি থেকে একটানা ঢোলক বাজাবার দুমদুম শব্দও আসছে।

ডানদিকের দরজাটা নিঃশব্দে খানিকটা খুলে গেল। আরো নিঃশব্দে একটি মাথা সেখান দিয়ে দেখা গেল। বড়-বড় রুক্ষ চুল, দেখলেই হাসি পায়। সে প্রসাদ। সেই অবস্থায় প্রসাদ ভালো করে ঘরটা একবার দেখে নিলো। তারপর চাপা গলায় কথা কইলো।]

প্রসাদ (চাপা গলায়): না, কেউ নেই। ভেতরে আয়।

[দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে প্রথমে প্রসাদ এলো। এক হাতে তার মাঝারি সাইজের চামড়ার সুটকেস, পিঠে ষ্ট্র্যাপ দিয়ে ঝোলানো ফ্লাস্ক। তারপর এলো সুব্রত। খদ্দরের পাঞ্জাবি ও খদ্দরের ধুতি পরা। হাতে এক গোছা রজনীগন্ধা। তার পেছনে লীলা। চওড়া লাল পাড় শাড়ি সে পরেছে। ঘোমটা অনেকটা টানা বলে মুখ দেখা যাচ্ছে না। পায়ে পুরু করে আলতা। সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।]

সুব্রত (বাঁ দিকের দরজার দিকে চেয়ে): ওপরে সবাই আছে বলে মনে হচ্ছে। খবর পেয়েছে তো?

প্রসাদ: নিশ্চয়ই। রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে কাল সোজা এখানে এসে নিজে হাতে তোদের লেটার বক্সে চিঠিটা ফেলে দিয়েছি।

(লীলা বাঁ-হাত দিয়ে ঘোমটা তুলে দেখছিলো। তার হাতের অনেকগুলো শাঁখা আর লোহা আর সিঁথির চওড়া সিঁদুর স্পষ্ট চোখে পড়ে):

নিশ্চয়ই খবর পৌঁছেছে। বাড়িতে বৌ আর ছেলে সবে বিয়ে করে আসছে, এমন সুখবরটা কি···

সুব্রত (বাধা দিয়ে): আহা, তোমাকে কতবার বারণ করবো লীলা, কথা বোলো না, কথা বোলো না?

লীলা: Don't be silly. কেউ নেই, এখন কথা কইতে কী দোষ?

সুব্রত (একটু রেগে): তা হ'লে বল। কেউ নেই, কিন্তু কেউ আসতে কতক্ষণ?

লীলা (সেও একটু রেগে): বিয়ে করতে পারলে, তাতে দোষ হল না এখন কথা কইলেই যত দোষ?

সুব্রত: আহা। বলেছি না এখন একটু tactfully চলতে হবে? আমাদের এই দারুণ সনাতনী বাড়ীতে একটা inter-caste marriage হ'ল। এতেই ভীষণ কাণ্ড, তার ওপর (কথা খুঁজে না পেয়ে সে থামলো)।

লীলা (অনেকটা অবুঝের মত): তার ওপর কী? সনাতনীরা কি স্ত্রীদের কথা বলে না?

সুব্রত: আহা। বলে ঘলে। সে কথা নয়। মানে একটু tactful হওয়া, এই আর কি।

লীলা: Tactful, tactful. পাঁচশো বার শুনেছি। Tactful!— Don't be silly.

[প্রসাদ সুটকেসটা মেঝেয় নামিয়ে তার ওপর বসেছিল। পাশেই ফ্লাস্কটা নামিয়ে রেখেছে। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে বললো]

প্রসাদ: শ্-শ্-শ্। চুপ্। কার যেন শব্দ পেলুম।

[পরের মুহূর্তেই লীলা ঘোমটা নামিয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার কাছে সরে দাঁড়ালো। সুব্রত রজনীগন্ধা ফুলগুলো নিয়ে কী যে হঠাৎ করবে ঠিক করতে না পেরে বিব্রতভাবে একবার জানলার কাছে গেল। ফের ফিরে এসে দাঁড়ালো প্রসাদের খানিকটা পেছনে। সবাই চুপচাপ। পথে ফিরিওয়ালার ডাক শোনা গেল। বার কয়েক: "বম্বেই কা পিন্‌টিড সাড়ি। নয়া নয়া ডিজাইন কা ছাপা হুয়া সাড়ি।" ডাকটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল। বস্তির ঢোলকের ডুম্-ডুম্ শোনা যেতে লাগলো।]

প্রসাদ (খানিক মন দিয়ে শুনে): না। ও কিছু নয়।

সুব্রত (একটু নড়ে-চড়ে): হুঁ। কিন্তু কী এখন করা যায়? (প্রসাদের দিকে ফিরে) তুই একবার ওপরে যাবি নাকি?

প্রসাদ (একটু ভয় পেয়ে): যাবো নাকি? তোর বাবা কি খুব রাগী?

সুব্রত: কী, ভয় পেলে নাকি?

প্রসাদ (চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে): পাগলা? পরোপকার করাই তো আমার ব্যাবসা। জানিস আমি কুড়িটারো বেশি মড়া পুড়িয়েছি, বন্যায় গ্রামে গিয়ে সাহায্য করেছি, দুর্ভিক্ষে চাঁদা তুলেছি, বসন্তরোগীর সেবা করেছি। আমার আবার ভয়টা কী?

লীলা (ঠাট্টার সুরে, ঘোমটা সরিয়ে): তা হলে তুমি তো ভীষণ বীরপুরুষ! আমতা আমতা করছো কেন?

সুব্রত (বিব্রত ও ব্যস্তভাবে): লীলা, আবার?

লীলা (ঘোমটা টেনে দিতে দিতে): Don't be silly. কেউ নেই দেখছো না?

[সেই মুহূর্তে ডানদিকের দরজাটা আবার খুলে গেল আর ভেতরে এলো বাড়ির বামুন ঠাকুর। খালি গা, কাপড়টা হাঁটুর ওপর তোলা। কাঁধে একটা থামা, তাতে মাসকাবারি বাজার, অনেকগুলি ছোটোবড় ঠোঙা। এদের দেখেই সে থমকে গেল যেন।

চাইতে চাইতে কোনোরকমে সে বাঁদিকের দরজা পর্যন্ত এলো। তারপর হঠাৎ দরজার কাছে থামটা রেখে চাঁচাতে চাঁচাতে অন্দরমহলে চলে গেল।]

বাচ্চা চাকর: মাইজি! দাদাবাবু ফিরেছেন।

নেপথ্যে কোলাহল একাধিক কণ্ঠে: কে? কে?—কী বল্‌লি?—কে এসেছে?

[একটা দুম্ করে শব্দ। কে যেন পড়ল। কোনো ছোটো ছেলে কেঁদে উঠলো।]

মহীতোষ (নেপথ্যে, বাঁদিকের দরজার পেছনে): বের করে দাও হারামজাদাদের, বের করে দাও। খুন কর্‌বো আমি, খুন কর্‌বো। এক বঁটিতে কেটে রক্ত দেখবো। [মহীতোষের প্রবেশ]

মহীতোষ: আমার বাড়িতে বাজারের বেশ্যামাগীকে নিয়ে আসা। (থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দর্‌জার দিকে আঙুল তুলে) বেরোও, বেরোও দূর হও, এই মুহূর্তে।

[ভদ্রলোকের পায়ে পুরোনো বিদ্যাসাগরী চটি, দেহের উর্ধ্বভাগ অনাবৃত, লোমশ ভুঁড়ি উত্তেজনায় ঘন ঘন ওঠানামা করছে, একটি মোটা ময়লা পৈতে তাঁর দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে, ডানহাতে অনেকগুলি মাদুলি।

সুব্রত কী বলতে গেল, ভয়ে পারল না। একবার তার বাবার দিকে একবার ডানদিকের দরজার দিকে চেয়ে সে চুপ্ করেই রইলো। সুব্রতর এই বিচলিত ভাব লক্ষ্য করে ভদ্রলোক আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।]

মহীতোষ: বেরোও, দূর হও।

প্রসাদ (মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে, কয়েক পা এগিয়ে এসে): দেখুন কাকাবাবু, এদের আপনি এবারের মত ক্ষমা করুন। ছেলেমানুষ, হঠাৎ করে ফেলেছে। আর কক্ষণো এ রকম কাজ এরা করবে না। যখন করেই ফেলেছে···

মহীতোষ: কী ক্ষমা? (অকস্মাৎ তিনি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে এসে সজোরে প্রসাদের পিঠে এক লাথি বসালেন। প্রসাদ প্রায় ছিট্‌কে ডানদিকের দরজার কাছে পড়লো।)—ক্ষমা! Swine, rascal; এখানে এসেছো মধ্যস্থতা কর্‌তে! মজা দেখতে! বেরোও, দূর হও। তোমাদের কী! তোমরা তো দু দিন ফুর্তি লুটে উড়বে। (তারপর হঠাৎ থেমে, কয়েক পা এগিয়ে এসে) আগে তুমি আমার বাড়ী থেকে বেরোও, তারপর অন্য···

[প্রসাদ ক্ষিপ্রহাতে উঠে দাঁড়ালো, মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিলো, গায়ের ধুলো একটু ঝাড়লো।]

সুব্রত (প্রসাদের কাছে এগিয়ে এসে): তুমি এখন যাও, ভাই। পরে দেখা করবো।

[প্রসাদ আর একবার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে ডানদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পথে আবার ফেরিওলার ডাক, "Happy boy, happy boy, happy boy".—বস্তির ঢোলকের দুম্-দুম্ আবার খানিক স্পষ্ট শোনা যেতে লাগ্‌লো।]

সুব্রত (মহীতোষের কাছে ফিরে এসে হঠাৎ তাঁর পা জড়িয়ে ধরে): বাবা, আমাদের ক্ষমা কর। আমাদের নাও।

মহীতোষ (হঠাৎ হাউ-হাউ করে কেঁদে): আমার সোনার চাঁদ ছেলেকে হারামজাদী রাক্কুসি ছিনিয়ে নিয়েছে। ওঃ, বুক আমার ফেটে যাচ্ছে, ফেটে যাচ্ছে। (নীচু হয়ে সুব্রতকে তুলে তাকে বুকে টেনে নিয়ে): তুমি ফিরে এসো বাবা, আমার বুকে ফিরে এসো। কিন্তু ওই বেশ্যামাগীকে আগে বিদেয় কর। আমি সব ভুলে যাবো বাবা, তোমায় বুকে নিয়ে রাখ্‌বো।

সুব্রত: বাবা! আমার স্ত্রী-কে তুমি বেশ্যা বল্‌ছো? (অপমানে তার কথা আট্‌কে গেল)।

মহীতোষ: কে, কে তোমার স্ত্রী? ওই যে ঘোম্‌টা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও তোমার স্ত্রী? সুব্রত, তোমাকেও বশ করেছে, তুক করেছে! ভালো করে চেয়ে দ্যাখো ও কে! তুমি কি মনে করছো তোমার সঙ্গেই ও প্রথম শুয়েছে? ওকে ছেড়ে দাও বাবা। না হয় কিছু টাকাকড়ি দিয়ে বিদেয় কর। তোমার বাবাকে বাঁচাও, তোমার ধর্মকে বাঁচাও। তুমি ফিরে এসো। আমার পরকাল, তোমার ইহকাল-পরকাল নষ্ট করো না। জানো নাকি তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, জানো নাকি ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে, কায়স্থ মেয়েকে বিয়ে ক'রলে আমাদের পিণ্ড লোপ হবে? পরকালে যখন একফোঁটা জলের জন্যে বুক আমার ফেটে যাবে তখন আমি সে জল পাবো না? ভাবো সুব্রত, পরকালে তোমার বাবা তোমার হাতের একফোঁটা জল শুদ্ধ পাবে না। তুমি অশুচি হবে, আমার শ্রাদ্ধ করার অধিকার তুমি পাবে না।—বাবা সুব্রত! এমনি করে আমাদের বুকে চিতা জেলো না। মনে করে একবার ছাখো দিকিনি আপিস থেকে ফিরে জল-খাবার না খেয়ে কে তোমার পড়ার খরচ যুগিয়েছে? ভাবো দিকিনি, তোমার পরীক্ষার ফি'র জন্যে কার মায়ের গয়না···

একে গ্যাছে? ভাবো দিকিনি, তোমার অসুখের সময় নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে রাতের পর রাত যারা জেগে কাটিয়েছে?—বাবা! আমাদের বুকে আর শেল হেনো না। যা হবার তা হয়ে গ্যাছে। এখনো সময় আছে। ওকে বিদেয় কর। তুমি ফিরে এসো। (সুব্রতকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ভদ্রলোক যেন যাত্রার পার্ট মুখস্থ বলতে লাগলেন।)

সুব্রত (বাবাকে কাঁদতে দেখে খানিকটা সাহস পেয়ে): তা আর হয় না বাবা। এঁকে আমি ধর্মত বিয়ে করেছি। হয় আমাদের দুজনকেই বাড়িতে রাখো, না হয় তো দু'জনকেই তাড়িয়ে দাও। তুমি অনেক অপমান করেছো। আর কোরো না। চুপ্ কর।

মহীতোষ (অকস্মাৎ): আমার কী হল রে! (মহীতোষ মাটিতে দড়াম করে পড়ে গোঁ-গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।)

[বাঁ দিকের দরজার কাছে বাড়ীর অন্য মেয়েরা এতোক্ষণ জমা হয়ে শুনছিল। মহীতোষ অজ্ঞান হয়ে যাবার পর একে একে তারা ভেতরে এলো: প্রথমে সুব্রত'র মা, তারপর তার মামিমা ও তার ছেলেমেয়েরা, সব শেষে বাড়ির বুড়ি-ঝি। বুড়ি-ঝি দরজার পাশে বসে মড়া-কান্না সুরু করলে।]

বুড়ি-ঝি: কী সব্বোনাশ হল গো, ওগো আমাদের কী হবে গো? (সে সুর করে কেঁদে চললো।)

লীলা (মাথার ঘোমটা ছোটো করে খানিক এগিয়ে এসে): ছ্যাখো সুব্রত। (বলেই থেমে নিজেকে শুধ্‌রে নিয়ে) ছ্যাখো, একটু জল আর পাখা আনবার ব্যবস্থা শিগ্‌গীর কর। বাবার বোধ হয় মাথা ঘুরে গ্যাছে।

সুব্রত: এক্ষুনি আন্‌ছি। (এক লাফে বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।)

[সুব্রতর মা আঁচল দিয়ে মহীতোষের মাথায় বাতাস করতে লাগলেন। দরজার পাশে বুড়ি-ঝি পা ছড়িয়ে ভালো করে বসে মড়া-কান্না কেঁদে চললো। সুব্রত'র মামিমা ঠোঁট ফ্যাকাশে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহীতোষের মাথার কাছে। তার ছেলে মেয়েরা চারদিকে পিল্‌পিল্ করছে। একজন কাঁদছে মার আঁচল ধরে, একজন জানলায় উঠে গরাদের মধ্যে পা গলিয়ে রাস্তার লোককে জিব বার করে ভ্যাঙচাচ্ছে। একজন অতি সন্তর্পণে লীলার গা-হাত-পা আঙুল দিয়ে টিপে-টিপে কী যেন পরীক্ষা করে দেখছে। কী যে এখন করা উচিত ঠিক বুঝতে না পেরে লীলা সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুব্রত এক ঘটি জল আর পাখা নিয়ে ফিরে এলো। লীলা এক আঁজলা জল নিয়ে নীচু হয়ে বসতেই বুড়ি ঝি চীৎকার করে উঠলো।

বুড়ি ঝি: ছুঁস্‌নি, ওকে ছুঁস্‌নি।

[লীলা চমকে উঠলো। তার হাতের জল মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল।]

সুব্রত'র মা (খানিকটা ধমক্ দেবার সুরে): তুমি থামো ঠাকুরঝি, সব কথায় কথা বলতে এসো না।

বুড়ি ঝি: হায় আমায় কী হবে গো! কারুর ভালো করতে নেই গো। (তারপর আবার আগের সুরে) কী সর্ব্বনাশ হল গো, আমাদের কী হবে গো!

সুব্রতর মা (সেদিকে কান না দিয়ে): বৌমা, তুমি বরঞ্চ পাখা কর। আমি জল দিচ্ছি।—আর ছাখ্ সুব্রত, তুই ততক্ষণ দোতলার কোণের ঘরটা একটু গোছগাছ করে নে।

[সুব্রত রজনীগন্ধার গোছাটা নিয়ে ভেতরে গেল। কুঁচো কুঁচো ছেলেমেয়েরাও তার পেছন পেছন চললো। মহীতোষের জ্ঞান ফিরে আসতে দেরী হল না। উত্তেজনার পর অবসাদে তিনি ক্লান্ত। ঘোলাটে চোখ মেলে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তিনি খানিক এদিকে-ওদিকে চাইলেন। ইতিমধ্যে সুব্রত ফিরে এলো। লীলা তার হাতে পাখা দিয়ে খানিকটা সরে বসলো। বুড়ি ঝি কি মনে করে চুপ্ করলো। খানিক সবাই চুপ-চাপ্। শুধু বস্তি থেকে ঢোলকের ডুম্ ডুম্ শোনা যাচ্ছে।

অল্প পরে মহীতোষ সুব্রতকে ভর দিয়ে উঠে বসলেন। তারপর সুব্রত'র সাহায্যেই উঠে দাঁড়ালেন।]

মহীতোষ: আমাকে ভেতরে নিয়ে চলো।

[সুব্রত ও তাঁর মা মহীতোষকে ধরে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল। প্রায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই সুব্রতর মামাতো ভাই-বোনেরা পিল্‌পিল করে ঘরে ঢুকলো। কেউ সুটকেশটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলো, কেউ জানলায় উঠলো, কেউ টেবিলের ওপর থেকে কয়েকটা বইখাতা নামাবার জন্যে হাত বাড়াতে লাগলো।]

সুব্রত'র মামিমা: কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে বৌমা বোস।

[সে মাটিতেই বসলো। লীলাও তার খানিক দূরে বসলো]

সুব্রত'র মামিমা: কী কাণ্ড বল দিকিনি ভাই! ভয়ে আমার তো হাত পা হিম হয়ে গ্যাছে। (খানিক থেমে)—কী যে বলি। 'ভাই' বলা আমার একটা ওব্যেস। তুমি কিছু মনে কোরো না বৌমা। (একটু থেমে, অন্য

সুরে) তুমি তো নাকি অনেক পাস-টাস দিয়েছো, বৌমা! হ্যাঁ ভাই, এনট্রেন্স পাস দিয়েছো নাকি?

লীলা : (শুধু ঘাড় নাড়লো)

সুব্রত'র মামিমা : আমার ছোটো ননদের জা-ও নাকি ভাই অনেক পাস-টাস দিয়েছে। ইংরেজি-মিংরেজি পড়ে। আমার কিন্তু ভাই সেই ফাষ্টোবুক পর্য্যন্ত (একটু থেমে, আঁচল থেকে দু'খিলি আধ-শুক্‌নো পান বার করে একটা লীলার দিকে এগিয়ে)—খাবে নাকি বৌমা?

লীলা : (মাথা নেড়ে জানালো, না)

সুব্রত'র মামিমা (একসঙ্গে দু'খিলি পান মুখে পুরে) : আমার স্বামী তো বলেছিলেন পড়াশুনো শেখাবেন। কিন্তু হ'ল কৈ? প্রথম বছরেই মুংলি, তার পরের বছরেই ঘণ্টা, তারপর একে একে মণ্টা, আম্না, সবাই আসতে লাগ্‌লো। এই আটবছর বিয়ে হয়েছে, এরি মধ্যে পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। একটা তো আবার পাঁচ মাসেই নষ্ট হয়ে গেল। আমার মা বল্লেন ডাইনের নজর লেগেছিলো। কেউ বলে আমি যখন দুপুরে ঘুমুচ্ছিলুম তখন নাকি চিতিতে পেটটা চেটে দিয়েছিলো। তা আমার শ্বশুরের যা বাড়ি ভাই, চিতি থাকবে সে আর আশ্চর্য্যি কথা কি? বাঘ ভাল্লুক যে নেই এই আশ্চর্য্যি!—কিন্তু তা-ও বল্‌বো ভাই, যেমনি বাড়ি হোক, হাজার হোক বাপের ভিটে তো? সে বাড়ি কি ভায়েদের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে এক কথায় ছেড়ে আসতে আছে?

লীলা : (তাকে খুসি করার জন্যে) : তাই কি আর আছে?

সুব্রত'র মামিমা : ঠিক বলেছো ভাই। কিন্তু ওই এক মানুষ ভাই, আমার স্বামী। এই বেশ ভালোমানুষটি, হাসছেন, কথা কইছেন—চক্ষের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তেই রেগে এক্কেবারে অগ্নিশর্ম্মা! এই করে তাঁর চাকরি গেল, বাড়ি গেল; ভাগ্যিস ঠাকুরজামাই এখানে মাথা গুঁজতে দিয়েছিলেন।—কিন্তু যাই বল ভাই, ঠাকুরজামাই ও রকম কল্লেন বটে কিন্তু আসলে উনি এক্কেবারে মাটির মানুষ। ওর এই মুর্ত্তি আগে তো আর কখনো দেখিনি। দেখে, আমার তো ভাই ভয়ে গলাশুদ্ধ শুকিয়ে গিয়েছিলো। —(একটু থেমে) এই মুংলি, ও কি হচ্ছে? বৌদির রঙ্‌-টঙ্‌ নিয়ে ওকি করছিস? ছি-ছি তোর যে নিন্দে হবে।

[মুংলির দিকে তারা দু'জনে চাইলো। ইতিমধ্যে এক আশ্চর্য উপায়ে মুংলি লীলার স্যুটকেস খুলে ফেলেছে আর সবকটা কুঁচোকুঁচো ছেলেমেয়ে মিলে মহানন্দে পাউডার-স্নো-লিপ্‌স্টিকের শ্রাদ্ধ করছে। সবচেয়ে যে ছোটো, এসেন্সের শিশিটা খুলে মাথায় ঢেলে সে নাচছে। তার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে দামি এসেন্স। লীলা অসহায় ভাবে তাদের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলো।]

সুব্রতর মামিমা : তুমি তো ভাই অনেক সব রঙ্‌-টঙ্‌ মাখো। আমার বড় মেয়েটাকে বিয়ের সময় তোমাকেই কিন্তু সাজিয়ে দিতে হবে। এই তো ছ'য়ে পড়লো। মেয়েদের বাড় ভাই, কলাগাছের বাড়। দেখবে তড়তড় করে বেড়ে যাবে।—আমার তো এগারোয় বিয়ে হল, বারোতেই মুংলি হ'ল। তেরোয়······

[সুব্রতর মামিমা কথা শেষ করতে পারলো না। ডানদিকের দরজার কড়াটা হঠাৎ ভীষণ জোরে বেজে উঠলো]

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর : মহী, মহী কোথায় আছিস্ রে?

সুব্রতর মামিমা : এই রে। ঠাকুর জামাইয়ের দাদা এসেছে। চলো বৌমা, শিগ্‌গীর ভেতরে চল।

[এক রকম টেনেই লীলাকে নিয়ে সুব্রতর মামিমা বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল। কুঁচো-কুঁচো ছেলেমেয়েরাও তাদের সঙ্গে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় অদৃশ্য হল।]

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর : মহী, মহী বাড়ি আছিস্ তো?

[গুম্-গুম্ করে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খানিকটা খুলে গেল। ভেতরে এলো একটি গোলগাল চেহারার ভদ্রলোক। বয়েস প্রায় পঞ্চাশ। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, গলায় সিল্কের চাদর, পরনে দেশী ধুতি। ভদ্রলোক বিশ্বলোচন শর্ম্মা, মহীতোষের বড় ভাই। তিনি ভেতরে এসে ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসলেন তারপর সিল্কের চাদর ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগলেন।]

বিশ্বলোচন : ঘর খোলাই রয়েছে। মহী আছে তো? (গলা চড়িয়ে) মহী, মহী কোথায় গেলি রে?

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ দিকের দরজা দিয়ে আলুথালু বেশে মহীতোষ এলেন। বিশ্বলোচনের পায়ের ধুলো নিয়ে তিনি বল্‌লেন]

মহীতোষ : এসো দাদা। কতক্ষণ এলে?

বিশ্বলোচন : আস্‌বো যে তার কি আর মুখ রেখেছে সুব্রত?—(একটা দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে) সবি শুন্‌লুম ভাই। একটু আগেই খবর পেয়েছি। খবর পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছি। কী কাণ্ড! কী ভীষণ কাণ্ড! তখন বলছিলুম—ওরে মহী, ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখাস্ নে, ইংরিজি

শেখাস্ নে। তখন তো আর কথাটা কানে তুল্‌লি নে। এখন ছাখ, ফল হাতে হাতে। জাত গেল, ধর্ম্ম গেল, মান্ গেল, ইজ্জত গেল। তুই মুখ দেখাতে পার্‌বি না। আমি মুখ দেখাতে পার্‌বো না।—তোর বাড়িতে কেউ জলস্পর্শ কর্‌বে না। আমিও না—এই গরমে গলা শুকিয়ে গ্যাছে, কোথায় হেঁকে বল্‌বো, বৌমা একটা ডাব আনিয়ে দাও তো!—কিন্তু সে পথ আর নেই। গলা শুকিয়ে গেলেও কিছু বল্‌তে পাবো না।

মহীতোষ: সবি তো শুনেছো দাদা। আমার মাথা কাটা গ্যাছে। এখন কী যে করবো জানি না। মনে হচ্ছে বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে। এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিশ্বলোচন: ওরে ভাই রে! বিশ্বেস কি আর আজকের দিনে কাউকে আছে? বিশ্বেস কাউকে নেই এই কলকেতার সহর বড় ভয়ানক জায়গা। ছদিনে ছেলেদের বিগড়ে দেয়। সেই ভয়েই তো আমার ছেলেটাকে দেশে রেখে এসেছি। পড়াশুনো শিখ্‌লো না, তাতে কী হয়েছে? দিব্বি আছে। জজ্‌মানি করে বেশ ছ পয়সা কামায়। মোটা ভাত-কাপড়ের দুঃখু নেই। জমিজমা দেখাশোনা করে আর জজ্‌মানি করে—ব্রাহ্মণের ছেলের এই তো কাজ। আজ বাদে কাল তার বিয়ে দোবো। নাতি-নাৎনি নিয়ে সুখে থাকবো। আমার ছেলে মুখ্যু বটে, কিন্তু মরে গেলে জলপিণ্ডিটা মারা যাবে না। কিন্তু তোর? রাশি-রাশি টাকা ঢেলে বিএ পাশ করিয়ে ছেলেটাকে যে বাঁদর গড়্‌লি এখন তার ফল হাতে হাতে ভোগ। তোর ইহকাল গেল পরকাল গেল, পরকালে যখন জল-জল করে ঘুরে বেড়াবি তোর মুখে একফোঁটা জল দেবার ক্ষ্যামতা শুদ্ধু তখন তার থাক্‌বে না। তোর বি-এ পাশ ছেলে তখন চুরোট মুখে, আদ্দির পাঞ্জাবি চড়িয়ে বাজারের মেয়ে নিয়ে ট্যাক্সিতে ফুর্তি করে বেড়াবে।—কুলাঙ্গার, কুলাঙ্গার কোথাকার। আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারিস্ নি? (একটু থেমে অন্য স্বরে)। সে গেল কোথায়? মাগিটাকে বিদেয় করেছিস্ নাকি এখনো ঘরে পুষ্‌ছিস্?

মহীতোষ: না দাদা, তারা বাড়িতেই আছে। কোথায় তাড়াই? হাজার হোক্ আমারি ছেলে তো? জীবন পাত করে যাকে বড় করলুম, ভাবলুম বুড়ো বয়েসে আমাকে খাওয়াবে-পরাবে—তার কিনা এই কাণ্ড? ঘোর কলি, ঘোর কলি। এখন কি আর প্রতিদান বলে কিছু আছে?—

কী যে কর্‌বো কিছুই ভেবে ঠিক কর্‌তে পারছি না। আমি তাদের তাড়ালে তো তারা না খেয়ে মরে যাবে। আমার স্ত্রীও সে-কথা বল্‌ছিলেন। যদি আলাদা-টালাদা করে কোনো একটা ব্যবস্থা করা যায় এ বাড়িতেই……

বিশ্বলোচন (হুঙ্কার দিয়ে উঠে): ফের মেয়েমানুষের কথা শোনা! এক বিপদ থেকে আর এক বিপদে যাবি? খবরদার! অমন কাজও করিস্ নে। শোন্, আমার একটা মৎলব মাথায় আছে, সেটা বল্‌তেই এসেছি। (তারপর গলাটা একটু নামিয়ে) শোন্, আমার কাছে একটা ওষুধ আছে, গাছের একটা শেকড়। আজ রাত্রে সরবতের সঙ্গে সেটা বেটে তোর ছেলেকে খাইয়ে দে। ব্যাস্, দেখতে হবে না। কাল সে উন্মাদ পাগল হয়ে যাবে।—তারপর আর কি? পাগল হলে তো আর কাউকে চিন্‌তে পারবে না। তখন তার পিরিত টিরিত সব ছুটে যাবে। মাগিটাকে তখন দূর করে দিস্। এমনিতে যেতে না চায় তো খোরপোষ বিদেয় করিস্। নয় তো কিছু টাকা ধরে দিস্।—তারা জানে রে কী করে চরে বেড়াতে হয়। হাঃ হাঃ হাঃ……

মহীতোষ: (শুধু তাঁর লালচে চোখ মেলে বিশ্বলোচনের দিকে চেয়ে রইলেন।)

বিশ্বলোচন: আরে এই তো তাদের পেশা। সুব্রতটা যেমন গাধা। ফুর্তি করবি, তা না হয় কর। একটু ঢেকে ঢুকে সাম্‌লে-সুম্‌লে চল্‌তে দোষ কি?—তা নয়, একেবারে বিয়ে? বেশ্যামাগির আবার বিয়ে! কেমন এখন কাঁধে চেপেছে!

মহীতোষ: (নিরুত্তর)

বিশ্বলোচন: যাক্, হ্যাঁ যে কথা বল্‌ছিলুম। ছেলেটা পাগল হয়ে গেলে (মহীতোষ স্পষ্ট শিউরে উঠলেন) একটা প্রাতিচ্ছির টাতিচ্ছির কিছু করিয়ে যে কোনো একটা মেয়ের সঙ্গে পুরুত ডাকিয়ে বিয়ে দিইয়ে দে। জাতধর্ম্মও বাঁচবে, আর ছেলের বিয়েতে মোটা কিছু পাবিও। যদি বলিস্ পাগল ছেলের কী করে বিয়ে দোবো? আর বাংলাদেশে কি আর ছেলের বিয়ে আট্‌কায়? পাগল-ছাগল লোকে দেখে না। ছেলে হলেই হল। তা ছাড়া আমরা আছি কী করতে? বিয়ের আগে জানতে দোবো কেন, ছেলে পাগল? একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে করতে পারলেই হল। তুই হয়তো বল্‌বি, ছেলের মা-

খারাপ হবে সেটা কী আর ভালো? কিন্তু ভাইরে,—এখন কী আর ভালো মন্দ বিচার করার সময় আছে? আগে জাতধর্মটা বাঁচা, পরে অন্য কথা।—আর তা ছাড়া দেখলিই তো মাথা ভালো ছেলের কিত্তিখানা! অমন ছেলের মাথা ভালো হওয়ার চেয়ে মাথা খারাপ হওয়াই ভালো। তখন তাকে বেঁধে রাখতে পারবি। এখন কী আর তা পারিস্, না পেরেছিস্?—আর এতে যদি তোর মত না থাকে তা-ও বল্, আরো একটা উপায় বাৎলে দিচ্ছি।

মহীতোষ: (বড় বড় চোখ মেলে নিরুত্তর হয়েই রইলো)।

বিশ্বলোচন: হ্যাঁ, আরো একটা উপায় হতে পারে। আজই ওদের দূর করে দে। সুব্রতকে ত্যাজ্যপুত্তুর কর। তারপর আমার ছেলেটাকে এখানে রাখ। তাকে পুষ্যিপুত্তুর নে। তার নামে এই বাড়ি-ঘর-দোর তোর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি লিখে দে। তার বিয়ে দে ঘটা করে। তারপর নাতি-নাৎনি নিয়ে সুখে ঘর-সংসার কর। সে তোর ছেলের কাজ করবে। শেষ সময়ে তোর মুখে গঙ্গাজল দেবে, তোর শ্রাদ্ধ-শান্তি করবে।—অমন সোনার চাঁদ ছেলে লাখে একটা মেলে না রে এ কথা আমি জোর করেই বল্‌তে পারি। মুখে রা-টি নেই। যা বলবি তা-ই হাসিমুখে করবে। (অন্য সুরে)—ছাখ্ মহী, মাথা ঠিক করে ফ্যাল্। আজকেই আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলি। তোকে কিচ্ছুটি করতে হবে না। আমার হাতে সব ছেড়ে দে। কী করে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া দরকার। তোর মত অমন ভালোমানুষটি সেজে বসে থাকলে চল্‌বে না। এ সব বাপু-বাছার কথা নয়। বুঝেছিস্?

মহীতোষ (অকস্মাৎ বারুদের মত ফেটে পড়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো তারপর ডানদিকের দরজার দিকে আঙুল তুলে চীৎকার করতে লাগলো): বেরোও, বেরোও। এক্ষুনি দূর হও আমার বাড়ি থেকে।

বিশ্বলোচন (চম্‌কে ও ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে): কী, আমাকে তুই অপমান করে বার করে দিচ্ছিস্?

মহীতোষ (সগর্জনে): হ্যাঁ দিচ্ছি। বেরোও, দূর হও।—কী ভয়ঙ্কর কথা—বিষ খাইয়ে ছেলেটাকে পাগল করে দাও, আমার সম্পত্তি ওঁর ছেলেকে লিখে দাও।—বেরোও, এক্ষুনি বেরোও।

বিশ্বলোচন (বেরিয়ে যেতে যেতে): দেখে নোবো। আমাকে অপমান করা! যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা।....

[বিশ্বলোচনের প্রস্থান]

[মহীতোষের চীৎকার শুনে যাঁ দিকের দরজা দিয়ে বাড়ীর সবাই এ ঘরে চলে এসেছে।]

সুব্রতর মা (মহীতোষের কাছে গিয়ে): ওগো চুপ্ করো, চুপ্ করো।

মহীতোষ (তখনো কাঁপতে কাঁপতে): শয়তান, শয়তান! বলে কি না ছেলেকে পাগল করে দাও, তাড়িয়ে দাও—আর ওর গাঁজাখোর ছেলের নামে বিষয়-সম্পত্তি লিখে দাও! (সামনেই লীলা আর সুব্রতকে দেখে প্রায় জড়িয়ে ধরে) আয় বাবা, এসো বৌমা, তোমার নিজের বাড়িতে এসো। সতী হও, লক্ষ্মী হও সুখী হও।—ওগো এদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

সুব্রতর মা: ঠাকুরঝিকে বলেছি। সে নিয়ে আস্‌ছে।

[এক হাতে বড় এক থালায় মিষ্টি ও অন্য হাতে আসন নিয়ে বুড়ি ঝির প্রবেশ। সে আসন পেতে খাবারের থালা নামালো।]

মহীতোষ (লীলাকে আসনে বসিয়ে): খাও বৌমা। সকাল থেকে তো শুধু বকুনিই খাচ্ছো!

[লীলা বসলো। সুব্রতর মা তার ঘোমটা সরিয়ে একটা মিষ্টি ভেঙে লীলাকে খাইয়ে দিলেন।]

সুব্রত: বারে! আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না? (সে নীচু হয়ে বসে টপ্ করে ডাঁই মিষ্টিটুকু খেয়ে ফেললো।)

মহীতোষ (হাঁ-হাঁ করে উঠে): ওরে কর্‌লি কি রে, কর্‌লি কি! বামুনের ছেলে হয়ে কায়েতের এঁঠো খেলি?

[যবনিকা পড়তে লাগলো। পথে ফেরিওয়ালার হাঁক শোনা যেতে লাগলো: Happy boy, happy boy, happy boy.

বস্তির ঢোলকের শব্দ এখন সবচেয়ে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ডুম্-ডুম্ ডুম্-ডুম্ ডুম্-ডুম্।]

পদ্মনাভ

জ্যোতির্ম্ময় রায়

অবাক হবার ক্ষমতাটা শশীমোহনের আশ্চর্য্য রকমের। আকাশে উড়ো-জাহাজ দেখে যে-আন্দাজ অবাক হয়, বাজারে ঢুকে মাছের দাম দু'পয়সা চড়তি দেখলেও সে-আন্দাজ অবাক হয়। আজ বাড়ীর লোকগুলোর কাণ্ড দেখেও সে কম অবাক হয়নি; ছেলে পরীক্ষা দিতে যাবে তা নিয়ে সকাল থেকে অমন হুড়োহুড়ির দরকারটা কি। এত এত টাকা খরচা ক'রে মাষ্টার রাখা, বইপত্তর কিনে দেওয়া, সবই তো করা হয়েছে, এখন শুধু দুটো নাকি জবাব লিখে আসা, এ নিয়ে আজ ক'মাস যাবৎ কি চিন্তা আর কি কাণ্ডই না চলছে। এদিকে মেয়েটা যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না সেটা যেন কিছুই নয়, আজ পর্য্যন্ত একবার ডাক্তার দেখানো হলো না। বৌমা তার ছেলে ছেলে ক'রেই অস্থির—শশীমোহনের মন রীতিমত বিরূপ হয়ে উঠে সুহাসিনীর উপর।

সুহাসিনী বলেন, 'একটু হাত চালিয়ে নাও শশী, বিমল চান ক'রে এলো ব'লে—তুমি বড়ো ঢিলে।'

অতি পুরোনো চাকর গরুর গাড়ীর চাকার মত নড়বড়ে চালে চলে কম শব্দ করে বেশি—শশীমোহনের কাজ যা এগুলো তার চেয়ে বা[illegible]শ কথার-বিড়বিড়ি। আজ সকাল থেকে মেজাজটা তার বিগড়ে আছে, থেকে-থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে ব'লে ঢিলেমিটাও একটু বেড়েছে।

সকালে উঠেই শশীমোহন তার নারায়ণের ছবির সামনে মাথা ঠুকে প্রণাম জানায়। আজ প্রণাম সেরে উঠতেই দেখতে পেয়েছে ছবিখানা দুলছে। এমন অবাক কাণ্ড আর কখনো সে দেখেনি। খোলা দরজার কাছে হাত রেখে হাওয়ার জোরটা একবার পরখ করেছে—কিন্তু হাওয়া নয়, হাওয়া হলে সেটা তার গায়েও লাগতো। ছবিখানা সামনে ঝুঁকে, না এপাশ-ওপাশে দুলেছে সে গবেষণাতেও অনেকটা সময় তার কেটে গেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছবির অনুকরণে মাথা দুলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে সেটা হ্যাঁ কি না।

শেষ পর্য্যন্ত সম্মতিসূচক ব'লেই যখন সাব্যস্ত হলো তখন শশীমোহনের খটকা বাজলো নিজের মনের কথাটি নিয়ে। ঠিক সেই সময়টাতে কি তার

মনে ছিল? 'সুমিদিদির কোনো অমঙ্গল হবে না তো?'—সর্ব্বনাশ, এমন কথা নিশ্চয়ই তার মনে ছিল না। শশীমোহন বড়ই ভয় পেয়ে যায়; সুমিতা ভালো হয়ে উঠবে কিনা, এ প্রশ্নটা বারবার গুঁজে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেষ্টা করে। সমস্তটা দিন তার কাটে মনের এই খুঁৎখুঁতি নিয়ে।

সন্ধ্যার পর থেকে সুহাসিনীর হাবভাব দেখেই শশীমোহন বুঝলো অসুখটা সুমিতার বেড়েছে। সে অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়লো। সুহাসিনীর মুখের গুমট ভাবটা তার ভাল লাগে না; এমন যার মায়ার শরীর সে এখনও ডাক্তার না ডেকে আছে কি ক'রে সেটাও দুর্ব্বোধ্য মনে হয়। কিছুক্ষণ প্যানপ্যান ক'রে কোনই যখন সুসার হয় না, শশীমোহন ত্যক্ত হয়ে চলে যায় বিমলের ঘরের দিকে।

বিমলের মাষ্টার বিদেয় না হওয়া পর্য্যন্ত শশীমোহন আজকাল বিমলের ঘরে ঢোকে না। পড়ার সময় একদিন আলাপ জমাতে গিয়ে মাষ্টারের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল, সেই থেকে হুতোম-প্যাচার মতো ঐ গম্ভীর মুখটা দেখলেই তার গা জ্বালা করে। আজ ওঁকে গ্রাহ্য করবে না মনস্থ ক'রে ঘরে ঢুকেই সে বলতে লাগলো, 'দেখো দাদাবাবু, পরীক্ষা তো খুব দিচ্ছ, এখন পড়া রেখে আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শোনো তো বাপু—'

বিমলের মাষ্টারমশাই খাতার উপর পেন্সিলটা টিপে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'উজবুকের মতো কথা ব'লো না, এখান থেকে এখন যাও বলছি।'

লোকটির কথা অমান্য করতে বা তার মুখের উপর জবাব দিতে সাহস পেল না বলেই শশীমোহনের অন্তর্দ্দাহটা বেড়ে গেল। ঝাপটা মেরে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে এল।—বলে কিনা উজবুকের মতো! গাধার মতো কথা বলার কথা সে শুনেছে, কিন্তু উজবুকটা আবার কেমন জানোয়ার—নিশ্চয়ই গাধার চেয়েও হীন কিছু হবে; ভয় ঝেড়ে রাগটা শশীমোহনের চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

একটু থম্ মেরে থেকে নিষ্ফল ক্রোধে জোরে জোরে পা ফেলে সে চলে গেল বাড়ীর ভেতর।—নারায়ণ এদের মঙ্গল করুন, এদের মেয়ে এরা যেমন খুসি ফেলে রাখুক, তা নিয়ে তার এতটা হেনস্তা হবার দরকারটা কি।

আপন মনে বকতে বকতে শশীমোহন রাতের কাজ শেষ করলো, তারপর আর তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

মণ্ট ছেলেমানুষ, সে অনেকক্ষণ হলো [illegible] পড়েছে। আলো জ্বলছে বিমলের ঘরে। সুহাসিনী সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, তারপর এগিয়ে গিয়ে ভাল ক'রে দেখে এলেন সদর দরজাটা বন্ধ আছে কিনা।

ফিরে এসে যখন বিমলের ঘরে ঢুকলেন মা'র মুখের দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বিমল প্রশ্ন করলো, 'কি মা—দিদির অসুখ কি খুব বেড়েছে? ডাক্তারকে—'

'একটু বেড়েছে, তা—ডাক্তারের দরকার নেই, দেখি কি হয়।'

এক মাসের উপরে হতে চললো মেয়েদের শারীরিক নিয়মের ব্যতিক্রম-জনিত অসুস্থতায় সুমিতা ভুগছে, তাই ঘর ছেড়ে সে বড় একটা বেরোয় না, এটুকুই বিমল জানে। ডাক্তার ডাকবার কথা পূর্ব্বেও সে দু'একবার বলেছে, কিন্তু মা তেমন গা করেননি ব'লে চুপ ক'রে গেছে। আজ সন্ধ্যার পর থেকে মা সুমিতাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, এখন তার চোখ-মুখের ভাব দেখে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে বই রেখে বিমল উঠে দাঁড়ালো।

'না মা, কিছু একটা বাড়াবাড়ি হবার আগেই ডাক্তার দেখানো ভালো।'

'ভয়ের কোনো কারণ থাকলে আমি বুঝতাম—তোকেও বলতাম। এখন যা তো বাবা শুয়ে পড় গে, পরীক্ষা চলছে, রাত জেগে তোর আবার কিছু একটা না হয়ে পড়ে।'

'বারোটা অবধি তো আমি রোজই পড়ি, মা।'

'না বিমল, অসুখ-বিসুখ দেখে মন আমার ভারি খারাপ হয়ে গেছে—তুই শুতে যা।' একরকম জোর ক'রেই বিমলকে শুইয়ে দিয়ে সুহাসিনী ঘরের লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিলেন।

ঘণ্টাখানেক পর সুহাসিনী বেরিয়ে এলেন সুমিতার ঘর থেকে। বাইরের ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন—ভয়ে তাঁর হাত পা ভারি হয়ে এসেছে। স্বামীর কথা সুহাসিনীর মনে পড়ে, তিনি জীবিত থাকলে এতটা ভয় ভাবনার ভেতরও এমন নিঃসহায় বোধ তিনি করতেন না। সুমিতার বিয়ে দিয়েই তিনি চিরদিনের জন্যে ছুটি নিলেন। কিন্তু তাঁর দেওয়া কোনো কর্ত্তব্যই তো সুহাসিনী অবহেলা করেননি; তা ছাড়া জীবনে এমন কোনো অন্যায় করেছেন বলেও তার মনে পড়ে না যার প্রতিফলে এতবড় অভিশাপ তাঁর প্রাপ্য হতে পারে।

ছোট মেয়ে অমিতা[illegible] দিয়েছেন সুহাসিনী নিজে। দিন দুই হলো জামাই লিখেছে, অমিতা অন্তঃসত্ত্বা। এই প্রথমবার, অমিতা নাকি অস্থির হয়ে উঠেছে মা'র কাছে আসবার জন্যে—শিগগিরই তাকে পাঠাবে। এই মেয়ে-জামাই, আত্মীয়-স্বজন, মান-সম্ভ্রম সবই বুঝিবা ছাড়তে হবে—সুহাসিনী নড়ে চড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন, না, ভয় পেলে তাঁর চলবে না।

ঘরে ঢুকে আঁচ ক'রে দেখলেন বিমল ঘুমিয়েছে কি না। ব্যাপারটা বিমলের চোখের আড়ালে রাখতে সুহাসিনীকে কম বেগ পেতে হয় নি। এসব বিষয়ে বিমলের দৃষ্টিটা একটু ভোঁতা, তার উপর দু'তিন মাস যাবৎ সে তার পড়াশুনা নিয়েই অতিমাত্রায় ব্যস্ত—তাই বুঝিবা এতটা সম্ভব হয়েছে।

বিমল ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাগ্যি তখন তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একা সবদিক তিনি সামলাবেন কি ক'রে! সাহস সঞ্চয়ের সব চেষ্টাকে তাঁর ব্যর্থ ক'রে হাত পা যেন ভয়ে গুটিয়ে আসতে চাচ্ছিল। একজন কাউকে তাঁর দরকার যার উপর নির্ভর করা যায়, যাকে বিশ্বাস করা যায়।

অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে সুহাসিনী আঙিনায় নেবে এলেন। পশ্চিমের ভিটেয় একখানা একতলা, তাতে দুটোই মোটে ঘর; তারই একটার জানালার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো দেখা যাচ্ছিল। একটু ঠেলে দিতেই জানালা খুলে গেল। ভেতরে দেয়ালের নীচের দিকে পেরেকে লটকানো একখানা নারায়ণের ছবি, যাঁর নাভি-পদ্মে বসে আছেন চার মাথাওলা ব্রহ্মা, তারই সামনে চোখ বুজে বসে আছে মস্তিষ্কহীন শশীমোহন।

শশীমোহন চোখ বুজে থাকে ইহলোক ভুলবার জন্যে নয়, ইহলোকের আবেদনকে একাগ্র করতে। নিজের হয়ে চাইবার মত কিছু তার নেই, সব আবেদন নিবেদন তার সুমিতারই জন্যে—সুমিতাকে সে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছে। সুমিতার এবারকার অসুস্থতা নিয়ে তার মনে বড়ই অশান্তি; সামনে থেকে দেখাশুনা না করতে পারাটাই হয়েছে তার সব চাইতে বড় অসোয়াস্তির কারণ। সুমিতার অসুখটা আজ বেড়েছে কিন্তু প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থাই হয়নি সে জানে, তাই নিরুপায় হয়ে চোখ বুজে বসেছে তার দেবতার কাছে।

৭

এ পরিবারে প্রথম প্রবেশ করে শশী ভৃত্য ছোকরা চাকর হিসেবে। যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমা রেখায় আজ এসে পৌছেছে কিন্তু আপনার বলতে এ পরিবারের বাইরে কেউ তার নেই, হবে বলেও আশা রাখে না। শান্ত, সরল, ভাল মানুষ এই শশীমোহন—নির্ভর করতে যদিও বা চোখ মেলতে হয়, বিশ্বাস রাখা যায় তার উপর চোখ বুজে। বিশেষ ক'রে সুমিতার ভালর জন্যে সে যে সব কিছু করতেই রাজি এ-কথা সকলেই জানে।

সুহাসিনী জানালায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'শশী—'

শশীমোহন চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। 'কে—বৌমা!' ত্রস্ত উঠে এসে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলো, 'কি বৌমা, কি হয়েছে?'

সুহাসিনী আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তার মুখ দেখে শশীমোহন থমকে গেল। অমন শান্ত সুন্দর মুখখানা যেন জমে শক্ত হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে ফ্যাকাশে গলায় সে জিজ্ঞেস করলে, 'কি বৌমা, আমার সুমিদিদির কিছু হয়নি তো?'

'ভারি বিপদ আমাদের শশী—'

বিপদ শশীমোহন সেটা বুঝেছে—কি বিপদ জানবার জন্য ভীত ব্যাকুল চোখে সে তাকিয়ে থাকে।

শুকনো গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে সুহাসিনী বললেন, 'সুমি'র সন্তান হবে শশী।'

সন্তান হবে! এ তো আনন্দের কথা। অনেক কালের সাধ শশীর সার্থক হতে চলেছে; খুসির হাসিতে তার মুখ চোখ উজ্জল হয়ে উঠলো। এমন ক্ষেত্রে সচরাচর যা ব'লে ভরসা দেওয়া হয় তাই তার মনে পড়ে, 'ভালোয় ভালোয় দু'ভাগ হয়ে যাবে বৌমা কিছু ভেবো না'—ছবিখানার দিকে একবার তাকায়, 'মাথার ওপর নারায়ণ আছেন,' উবু হয়ে জোড়হস্তে প্রণাম জানায়।

সুহাসিনীর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে আসে। স্নেহপ্রবণ সাদাসিধে লোকটিকে বোকা বলতে তাঁর বাধলো, বললেন, 'বুড়ো হতে চললে শশী তবু সামান্য হুঁসটুকু তোমার হলো না। আজ তিন বছর হতে চললো জামাই-এর সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে সেটা কি ভুলে গেছ—এ যে ভয়ানক কলঙ্কের কথা।'

শশীমোহনের মাথায় যেন ঝাঁকুনি লাগে। তাই তো, ভগবানের কাছে চাইবার সময় অত হিসেব তো সে করে নি। সুমিতার মঙ্গল কামনা করতে

গিয়ে কি সে চাইতে পারে ভুলে দিশা পেত না। যার স্বামী বোম্বাই না কোন সহরে বে-থা ক'রে সংসার পেতে বসেছে তাকে ভগবানই বা কোন পথ দিয়ে সুখ শান্তি দেবেন। এমন অবস্থায় শুধু একটি খোকা বা খুকী থাকলে তার ও তার সুমিদিদির দিন বেশ কেটে যেত, এ কথাই সে চোখ বুঁজে ভেবে এসেছে। তা ছাড়া এ তার আজকের আকাঙ্ক্ষা নয়; সেই সুমিতা যখন তার কোলে চেপে বেড়াতো তখন থেকেই সুমিতার ছেলেকে কোলে নেবার বাসনা তার মনে বাসা বেঁধেছে। এতদিনকার অতৃপ্ত বাসনাটা তাই আকস্মিক মুহূর্ত্তে আগু পেছু না ভেবেই বুঝিবা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল।

শশীমোহন তার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়। ধীরে ধীরে বিষয়টা তার কাছে সহজ হয়ে আসতে থাকে। কিছুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে। লম্বা-চওড়া সুন্দর মতো চেহারার এক ভদ্রলোক আসতো এ বাড়ীতে, যার নামটা সে সঠিক উচ্চারণ করতে পারতো না ব'লে সবাই কত না হাসাহাসি করতো—সেই লোকটির সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা করবার অপরাধে সুমিতাকে অনেকবার সে বকুনি খেতে শুনেছে বুউমা'র কাছে। শেষ পর্য্যন্ত ভদ্রলোককে এ-বাড়ীতে আসতে বারণ ক'রে দেওয়া হয়েছিল, এও সে জানে।

ঘটনার গুরুত্ব খানিকটা উপলব্ধিতে আসতেই সম্ভব-অসম্ভব বিবেচনা না ক'রে শশীমোহন বলে বসলো, 'সুমিদিদিকে কোথাও পাঠিয়ে দেও বৌমা, আমি ওদের প্রাণ দিয়ে দেখাশুনা করবো।'

'তুমি বড়ো কম বোঝ শশী, তা সম্ভব নয়।'

'তবে সন্তানটাকে দেও, নিয়ে চলে যাই একদিকে।'

'ওটাকে বাঁচাবার কোনো মানে হয় না শশী—সারা জীবন দশজনের কাছে ঘৃণ্য অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।'

'তবে—তবে কি করবে বৌমা, মেরে ফেলবে?' ভীত অসংযত কণ্ঠে শশীমোহন ব'লে ওঠে।

'চুপ, আস্তে—'সুহাসিনী চাপা গলায় বলতে থাকেন, 'এ ভয়ানক অপরাধ—এর ভয়ানক শাস্তি···কিন্তু উপায় নেই,' সুহাসিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, 'জীবনে এ-কথা মুখে এনো না শশী।'

মূঢ় শশীমোহন অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এসব কেমন কথা! এর জন্ম

অপরাধ, জীবন অপরাধ, জীবন নষ্ট করা অপরাধ—কী তবে করতে হবে! বড়ই জটিল মনে হয় শশীমোহনের কাছে, হতাশ হয়ে বলে, 'যা হয় তুমি কর বৌমা, আমি মূর্খ মানুষ আমি কি আর বলবো।'

শশীমোহনকে নিয়ে সুমিতার ঘরে ঢুকে সুহাসিনী দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। বিপদের মুখে আবার লজ্জা-সরম কিসের। একজন কাউকে তিনি প্রতিটি মুহূর্ত্তের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চান—অনভ্যস্ত এ অন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গতা তাঁর দুঃসহ মনে হয়।

সুমিতা শুয়ে আছে একটা তক্তপোষের উপর। মাথার আশপাশে ছড়ানো একরাশ চুল; এলোমেলো সেই কালো চুলের মাঝখানে তার শুভ্র সুন্দর মুখ এলিয়ে পড়েছে। ক্লান্ত চোখ মেলে সে একবার তাকালো। শশীমোহনের স্তিমিত চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন তার মনে অনেকখানি ভরসা এনে দেয়—ও চোখে ত্যক্ততা নেই, তিরস্কার নেই। তার বেঁচে থাকবার সবটুকু যুক্তি, সবটুকু শক্তি সে বুঝি খুঁজে পায় ঐ দুটি চোখের ভেতর। অশিক্ষিত এই বোকা লোকটিকেই আজ তার সব চাইতে আপনার মনে হয়।

সুমিতার ব্যথাটা আবার তার উরু বেয়ে কোমর অবধি উঠে অসহ্য তীব্রতায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কলঙ্কের ভয়ে নয়, সহ্য করবার ক্ষমতাটাই সুমিতার অপরিসীম। বেদনা-সূচক ক্ষীণ শব্দটুকুও তার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয় না। উদ্গত আর্ত্তনাদ রোধ করতে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে যায়, মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো আপ্রাণ শক্তিতে শক্ত হয়ে আসে। শুধু মাঝে মাঝে সজোরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস।

সুহাসিনী সুমিতার দেহকে প্রয়োজনীয় ভঙ্গীতে শুইয়ে দিলেন। সুমিতার সঙ্কোচের অন্ত থাকে না। কিন্তু স্নেহান্ধ এই প্রৌঢ় লোকটির অনুপস্থিতি সে বুঝি ভাবতে পারলো না,—তাই নিঃশব্দে চোখ বুজে মাথাটাকে অন্য পাশে এলিয়ে দিল।

শশীমোহনের কৃষ্ণবর্ণ দীঘল দেহ দেয়ালের গা ঘেঁষে নিশ্চল হয়ে রইলো। অনাবৃত সুকুমার দেহে, মাতৃজঙ্ঘার বিস্তৃত তোরণ তার চোখে ফুটিয়ে তুললো অগাধ বিস্ময়—গত ও ভবিষ্যৎ তার মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। পশুর জন্ম সে দেখেছে কিন্তু মানুষের আবির্ভাব কখনো দেখেনি; মন তার উৎকণ্ঠিত সশ্রদ্ধ-আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে মানুষের শিশু মানুষের জঠর থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের হাতে আশ্রয় নিল; আর মুহূর্ত্তে সে-হাত শিথেন থেকে স'রে এসে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ দুটোকে রুদ্ধ করে দাঁড়ালো। সদ্যজাত দুর্ব্বল স্নায়ুর ক্ষণিক কুঞ্চন ও প্রসারণের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেল ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষীণ প্রতিবাদ।

শশীমোহনের অন্তরটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো, কিন্তু ভয়ে তার মুখ দিয়ে সামান্য শব্দটুকুও বেরুলো না।

সুহাসিনী সন্তানটাকে তেমনি ধরে থেকে বললেন, 'শশী, শিগগির এসো সুমি'র নাভির উপরটায় খুব জোরে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরো।'

কেন, তার সুমিদিদিকেও মেরে ফেলতে চায় নাকি! 'না বৌমা এ আমি পারব না, এ আমি হতে দেব না।' দৃঢ় স্বরে শশীমোহন প্রতিবাদ জানালো।

'আঃ—' চাপা গলায় সুহাসিনী ধমকে উঠলেন। শশীমোহনের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, 'ওর ভালোর জন্যেই ওরকম করা দরকার। বলছি যা শোনো, খুব জোর দিয়ে চেপে ধরো।'

এবার শশীমোহন সুহাসিনীর কথায় বিশ্বাস ক'রে এগিয়ে গেল।

খুবই সহজে ও স্বল্প সময়ে গর্ভকুসুম খ'সে পড়লো। সুহাসিনীর যে-হাতের তলায় মুহূর্ত্ত আগে একটা জীবন নষ্ট হয়ে গেছে, সে-হাতই সুমিতার জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে সন্তর্পণে ফুলটাকে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো সবটা বেরিয়েছে কিনা।

সুহাসিনীর নির্দ্দেশ মত হাতের চাপ ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই শশীমোহনের যা নজরে পড়লো তাতে সে ভয়ে ও বিস্ময়ে আঁৎকে উঠলো। এবার আর নিজেকে সে দমন করতে পারলো না, ব'লে উঠলো, 'আঃ হা—কি সর্ব্বনাশ করেছ বৌমা, এ যে স্বয়ং নারায়ণ, দেখছ না নাভিপদ্ম রয়েছে যে!'

'আঃ, চুপ করো শশী, তুমি বড়ো বোকা—এরকমই হয়।'

এরকমই হয়, বৌমা বলে কি! নাভির বোঁটায় ওরকম পদ্ম নারায়ণ ছাড়া আর কারুর হ'তে পারে নাকি, হয় বললেই শশীমোহন বিশ্বাস করবে কেন? ভয়ে চোখ বুজে সে ব'সে পড়ে; মনে মনে কেবলই বলতে থাকে, সর্ব্বনাশ হবে, সর্ব্বনাশ হবে।

সুহাসিনী ডাকলেন, 'শশী—'

শশীমোহন চোখ মেলে উঠে দাঁড়ালো, তারপর যন্ত্রচালিতের মত সে সুহাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে অভিনায় নেবে এল।

শশীমোহনের দিন এক রমক কেটে যায় কিন্তু মন থেকে ভয় তার কিছুতেই কাটতে চায় না। তার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে এ-পরিবারে একটা সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

সুহাসিনীর মনও আশঙ্কায় ভীরু হয়ে আছে, তবে কিনা নিজেকে প্রবোধ দেবার মত যুক্তি তিনি খুঁজে পান। ক্ষুদ্র নাক ও মুখের উপর যারা তাঁর হাতটা চেপে ধরেছিল তিনি তার একটা অসহায় অংশ মাত্র; এ-কথা যখন ভাবতে পারেন, অসংখ্যের দায় ক্ষুদ্রাংশ হয়ে মনটাকে তাঁর একটু হালকা ক'রে আনে।

কিছুদিন হলো অমিতা এখানে এসেছে।

কোনো শুভ কাজে হাত দেবার মত সাহস আর সুহাসিনীর নেই। তাঁর ইচ্ছা ছিলনা অমিতা এবার এখানে আসে। কিন্তু এই তার প্রথম বার, কি অজুহাতে আসতে তাকে বারণ করা যায় ভাবতে ভাবতেই সে একদিন এসে উপস্থিত হলো।

অমিতার সাধভক্ষণের দিন অতিথি অভ্যাগতায় বাড়ী ভ'রে ওঠে। সুহাসিনীর দেওয়া 'সাধে'র শাড়ী প'রে অমিতা ঘুরে বেড়ায়; ছিপছিপে লম্বা মানুষটিকে একটু যেন খাটো দেখায়।

অমিতাকে দেখলেই শশীমোহনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। নূতন শাড়ীর শক্ত ভাঁজের উপর দিয়ে আসন্ন মাতৃত্বের আভাস যদিও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় না, তবু শশীমোহনের চোখ সেখানটায় থেমে থাকে। ঐ তো ওখানটায় তেমনি ছোট্ট একটি মানুষ লুকিয়ে আছে, একদিন অমনি ক'রেই বেরিয়ে আসবে—ভয়াবহ সেই রাত্রের রূপ, রক্ত ও জীবনের ছবি শশীমোহনের চোখের সামনে ভেসে উঠে, মনে মনে বলতে থাকে, 'ভগবান যা শাস্তি দেবার আমাকে দাও, ওদের কোনো অমঙ্গল তুমি কোরো না।

পদ্মের কথাটা মনে পড়ে। এরও নাভিতে ওরকম পদ্ম আছে কিনা জানবার জন্যে শশীমোহনের কৌতূহল হয়। এ প্রশ্নটা আজও সে মুখ ফুটে

কারুর কাছে করতে পারেনি, কেমন একটা অহেতুক ভয়ে ও দ্বিধায় জিভ তার আটকে গেছে।

অমিতার ব্যথা উঠলো একদিন দুপুর বেলায়। ব্যথাটা এক-একবার উঠে কেবলই প'ড়ে যেতে লাগলো। সন্ধ্যার দিকে ব্যাপারটা রীতিমত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

সুহাসিনী শশীমোহনের চোখের দিকে তাকাতে পারেন না, শশীমোহনও তাকে দেখলেই স'রে যায়। একটা কিছু অমঙ্গল যে ঘটবে এ তো তারা জানতোই।

আত্মীয়স্বজন ও পাড়ার প্রবীণ-প্রবীণায় বাড়ী ভ'রে গেল। অবশেষে এল ডাক্তার, সঙ্গে তার যন্ত্রপাতি।

শশীমোহন প্রয়োজনের তাগিদে ছুটোছুটি করে, আর মনে মনে নারায়ণকে স্মরণ করে। গরম জল এগিয়ে দিতে গিয়ে একটা যন্ত্রের চেহারা দেখে সে আঁৎকে উঠলো; ওটা দিয়ে কি করতে পারে ভাবতে গিয়ে ভয়ে মাথা তার ঝিমঝিম করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর জানা গেল সন্তানটা বের করা হয়েছে কিন্তু সেটা বোধ হয় মৃত।

শশীমোহনের আন্তরিক প্রার্থনা বন্ধ হয়ে গেল। অমিতার হয়েও আর কোনো আবেদন জানাতে সে ভরসা পেলো না। কা'কে শাস্তি দিতে হবে না হবে তা নিয়ে তার মতো অপরাধীর উপদেশ ভগবান শুনবেন কেন! এ পাপের শাস্তি সে পাবে, সুহাসিনী পাবে, এ-পরিবারের সবাইকে পেতে হবে।

এত বড় দুর্ঘটনার মধ্যেও সেই কৌতূহলটা তার জেগে উঠে। ধীরে ধীরে আঁতুড় ঘরের দিকে শশীমোহন এগিয়ে গেল। ঘন ঘন ঘর-বার করার দরুণ দরজা অনেকটা ফাঁক হয়েই ছিল, শশীমোহন দেখতে পেল সুহাসিনী সেই রকম একটা রক্ত-পদ্মের উপর তেমনি করেই ঝুঁকে আছে, আর ডাক্তারবাবু মৃত-শিশুর মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে পায়ে ধ'রে ঝাঁকছে। দাই বেটি হাত নেড়ে বলছে, 'আহা, অমন ক'রে ঝেঁকো নি বাবু, আদা চিবিয়ে নাকমুখে ফুঁ নাগালেই হবে—'

আর হয়েছে, যেটুকু প্রাণ ছিল ঐ ঝাকুনিতেই ধড় ছেড়ে পালিয়েছে। এ তো আর মানুষে ঝাঁকছে না, ঝাঁকছে দৈবে—শশীমোহন দরজার সামনা

থেকে সরে এল।—কিন্তু বৌমা তার ঠিকই বলেছিল, ওরকমই হয়। আঁতুড়-ঘরে মানুষ তবে তার ঐ দেবতার মত হয়েই দেখা দেয়। সেই দেবতার অভিশাপ লেগেছে—অকস্মাৎ শ্বাস টানতে শশীমোহনের কেমন যেন কষ্ট হতে থাকে, কেউ বুঝি তার নাকেমুখে জাপটে ধরেছে—

হঠাৎ মরা সন্তানটার কান্নায় শশীমোহনের অবশ চেতনা গা ঝাড়া দিয়ে চম্‌কে উঠলো ; এমন অবাক কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

মেয়েরা শাঁখ বাজালো, ঝাঁকে ঝাঁকে উলুধ্বনি করলো—মানুষ মানুষের সন্তানকে অভিনন্দন জানালো।

সুট-পরা ডাক্তার খট্‌খট্ শব্দে বেরিয়ে গেল, শশীমোহন বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো। লেখাপড়া জানা লোকগুলোর উপর মন তার অসীম শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠলো। যারা মরা সন্তান পেট থেকে টেনে বার ক'রে বাঁচিয়ে তুলতে পারে, ভগবানের অভিশাপকে যারা হার মানাতে পারে—তারা সব পারে—

কিন্তু এত যারা পারে তারা তার সুমিদিদির সুখ-শান্তির—তার বাঁচা ছেলেটাকে কোলে তুলে নেবার একটা পথ ক'রে দিতে পারে না কেন!

মূর্খ শশীমোহন এর কোনো কারণ খুঁজে পায় না।

শোভাযাত্রা

বিষ্ণু দে

বনে বনে দেখি বসন্তের
যাওয়া-আসা চলে ফুলে ফলে।
বাগানের ফুলই ফোটে না আর,
কেয়ারি ঢেকেছে জঙ্গলে,
বন আর ক্ষেত ফুলে ফলে।

নীল নবঘনে গগনে সেই
আঁধার ঘনায়, বৃষ্টি ঝরে,
মাটির গন্ধে, ভিজে হাওয়ায়
মজা পুকুরেই মজা করে,
মরা নদী সেই ঘুরে মরে।

মাঘের সকালে সূর্য ছড়ায়
দুই হাতে সোনা মুঠি মুঠি।
তবুও কোটরে অন্ধকার,
শীতে হিহি হাড়, বন্ধ-দ্বার
ভাঙা ঝরঝরে নীল কুঠি।

পথে পথে পালে পালে কুকুর,
ভিখারিরা করে নালায় ভিড়।
সুখী দম্পতি, প্রণয় কিবা
ঘরোয়ানা নেই, নিশা কি দিবা!
আমাদেরই প্রেমে লাগ্‌ল চিড়।
—রাজপথে চলে প্রজার ভিড়।

বসুধারা

বিষ্ণু দে

কন্যাদানে ধরারে করেছে ধন্য
পিতা যে তোমার, তাই তো সন্ধ্যা রাঙবে।
থাকবে না জানি সেদিন এ জনারণ্য,
কাঁদুনিতে নয়, সহজে হৃদয় ভাঙবে,
রূপসীর মেয়ে! চড়া জয়গান গাও রে
নবজাতকেই নূতন আলোক পাও।

জানি হে নবীনা! তোমার যুগের কর্মে
আত্মগ্লানির ব্যর্থতা থেকে বাঁচবে;
শূন্যের নয়, পূর্ণের প্রাণ-ধর্মে
হাহাকারে নয়, সম্ভাবনাই আঁচবে।
অতএব দায়ভাগে জয়গান গাও রে
ভাবী সৃষ্টিতে জীবনধর্ম চাও।

সূর্যাস্তের সোনাকে হান্‌বে হাস্যে,
সূর্যোদয়ের হাল্‌কা আলোয় হাসবে,
পিতৃলোকের স্বপ্ন তোমার লাস্যে
সমসুযোগের সহজ জীবন আস্‌বে,
প্রৌঢ়ত্বের ফেরানো ঘাড়েও গাও রে
যদি আসে প্রাণ মৃত্যুকে কেন চাও রে॥

মিশ্র-রাগিণী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

করছিল হাসি মস্করা বেকার ক'জন পাশ করা
পাছে বেড়ে যায় আস্কারা পরোয়ানা এল সরকারী,
প্রভুদের খাস কামরাতে, গুন্‌গুন্ করে ভোম্‌রাতে
বেকারেরা পেল দিন রাতে, ছায়াধরা কাজ দরকারী।

বিরহিণী রাত্রি, মিছে কেন কাঁদছো?
সেতারে ও বেতারে মেকী সুর সাধছো,
ও পাড়ার মেয়েটার হারিয়েছে মাকড়ী
থামাও কাঁদুনে গান এল লাল পাগড়ী।

পাখীদের গান কই কোঁথা সুর আকাশে
ভেসে আসে কলরব এলোমেলো বাতাসে
কোথা বন গন্ধ
কোথা তার ছন্দ,
কুম্‌ড়ো কাস্তে চাঁদ, পাণ্ডুর ফ্যাকাসে।

খেতাব টেতাব থাক্‌লে পরে কেতাব লেখায় সুখ,
ছাপমারা বাঘ আঁচড়ে চলে দেশের নরম বুক।

অন্তরে কাঁদে যুধিষ্ঠিরের শরীরী প্রেত
মুখে বলি তাই 'অশ্বত্থামা হতঃ',
কূট-নীতিজ্ঞ বিধাতার ফাঁকি অভিপ্রেত
সোজা শিরদাঁড়া আঁজা চলি উন্নত।

পরমত-অসহিষ্ণুতা করি বর্জ্জন
ধার্ম্মিক খ্যাতি সহজে করেছি অর্জ্জন ॥

কেতাবী প্রেমে মত্ত ছিনু যৌবনে
কাজের বেলা দেখিনু হায় সব ফাঁকি,
নারীরে আজ নারীই দেখি বাস্তবে
ফাল্গুনে তাই কোকিল বৃথা যায় ডাকি।

মরণের বুদ্বুদ ওঠে আর নিভে যায় জীবনের পঙ্কিল পাথারে,
কিছু নাই সম্বল শুধু ছেঁড়া কম্বল তাই দিয়ে ঢাকি প্রেম-গাথারে,
পরাণের ভাঙা হাটে আজো তবু দিন কাটে তুমি মোর
সে গাথার নায়িকা
পথে পথে ফুল ফোটে আঁচল ধুলায় লোটে গান কেন
ভুলে গেলে গায়িকা ?

বন-ময়ূরের নীল পাখা বেগুনী সোনালী রঙ মাখা
কা'র তুলিকায় হ'ল আঁকা আমার স্বপ্ন-রজনীতে,
পেলব পেখম তুলে নাচে কোন ময়ূরীর প্রেম যাচে ?
গুরুগুরু ডাক শুনে বাঁচে মেঘ-মল্লার রাগিনীতে।

শিল্পী : নন্দলাল বসু

মাধবীর জন্য

প্রতিভা বসু

হঠাৎ মাধবীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আমি নিউমার্কেটে ফুল কিনতে গিয়েছিলাম, দেখি এক ভদ্রমহিলা ওজন নিচ্ছেন দাঁড়িয়ে। ওজন নেবার মতনই বটে। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একজন মেয়েমানুষের যতখানি বাড়া সম্ভব উনি ঠিক ততখানি বেড়েছেন। আগে লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ চোখে চোখ পড়লো। সাহেবী পোষাকে সজ্জিত পুরুষটিকে দেখে ওঁকে তাঁরই স্ত্রী ভেবে পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছিলাম, কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম ভদ্রমহিলাটি আমাদেরই মাধবী এবং ভদ্রলোকটি মাধবীর নতুন স্বামী। স্তম্ভিত হলাম।

—'এ কী, বকুল যে।'

'বাঃ তুমি কোত্থেকে।' এই হল আলাপের সূত্রপাত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাধবী আমাকে রেহাই দিল না, জোর করে নিয়ে এলো ওর বাড়িতে, বল্ল, 'আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে, আমি যে একটা অমানুষ বা পাষণ্ড নই সে কথা তোমার জানা দরকার।'

বাড়ীটি বেশ। একতলা ছোট বাড়ি, সাজানো গুছোনো—মাধবীর নিখুঁত হাতের ছাপ সর্ব্বত্র। বছর দশেকের একটি মেয়েকে ও নিয়ে এলো—'মাসীমাকে প্রণাম কর, লক্ষ্মী।' আমি দুই চোখ মেলে লক্ষ্মীকে দেখতে লাগলাম—দেখতে লাগলাম বল্লে ভুল হয়, গিলতে লাগলাম, আর আমার চোখের তলায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী অস্বস্তিতে ম'রে যেতে লাগলো। অবশেষে দুই হাতে ওকে কোলের উপর টেনে এনে মাথায় অজস্র চুমু খেয়ে বল্লাম, 'ওকে তো আমার কিছু দেওয়া উচিত, না, মাধবী? আমি হলাম মাসীমা!' হাত থেকে অতি প্রিয় এবং অতি দামী একমাত্র গহনা আমার হীরের আংটিটি ওর কচি নরম আঙুলে পরিয়ে দিলাম। ঢলঢল করতে লাগলো, মাধবী রাগ করতে লাগলো, কিন্তু তবু আমি কিছুতেই আর না খুলে নিলাম না।

মাধবীর নতুন স্বামীটি দেখলাম বেশ ভালমানুষ। চা খেতে-খেতে

সামান্য আলাপ হ'ল। কথাবার্ত্তায় অতিশয় ভদ্র এবং মার্জ্জিত। চা খেতে উনি বেরিয়ে গেলেন কোথায়। মাধবী এবার ঘনিয়ে বসলো কাছে।—'লক্ষ্মী, যা তো বাবা—তোর মাসীর সঙ্গে আমার কথা আছে।'—আমার বুকের মধ্যে টিপটিপ করতে লাগলো—কী বলবে মাধবী, কী কথা আছে ওর?

'তুমি নিশ্চয়ই ভয়ানক অবাক হয়েছ—'

মাথা নেড়ে বল্লাম 'বলাই বাহুল্য।'

'তবে যে কিছু জিজ্ঞেস করছ না?'

'কিছু একটা হয়েছে।'—নেহাৎ উদাসীনভাবে কথাটা এড়াবার চেষ্টা করলাম।

'তোমার কী মনে হয়?'—আমার যা মনে হয়েছিল তা যে ঠিক নয় সে বিষয়ে যেন হঠাৎ আমি সন্দিগ্ধ হলাম। বল্লাম, 'তুমি যা বলবে বল না।'

মাধবী কথা ঘোরালো, 'আমার স্বামীকে তোমার কেমন লাগলো?'

'ভালই ত।'

'কে বেশী ভাল—অশোক না এই ভদ্রলোক?'

এ নামটা আমার সয় না। শুনলে ভিতরে ভিতরে বিশ্রীরকম একটা যন্ত্রণা হয়। জবাব যে কী দেব ভাবতে একটু সময় নিয়ে বল্লাম, 'আমার চেয়ে তা তুমিই ভাল জান।'

মাধবী একটু চুপ ক'রে থেকে বল্ল—'তোমার সঙ্গে আমার প্রায় দশ বছর পরে দেখা, এই ক' বছরে যদি আমার স্বামীর মৃত্যু হয়ে থাকে তা কি খুব আশ্চর্য্য?'—একটু থেমে—'আর মৃত্যুর পরে যদি আমি আবার বিয়ে করি সেটা কি খুব অন্যায়?' মাধবীর কথার ধরণে প্রথমে যে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম তা ধূলিসাৎ হল। অশোকের মৃত্যু যে আমার পক্ষে বেদনা-দায়ক হবে এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম কিন্তু সে-বেদনা যে এত গভীরেও নাড়া দিতে পারে তা আমি জানতাম না। অনেকদিন আগেকার আরেকটা দুঃখের স্বাদ মনে পড়লো। নতুন ক'রে অভিভূত হলাম। মুখ নিচু ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম 'কী হয়েছিল ওর?'

'খুব সম্ভব যক্ষ্মা।'

'যক্ষ্মা!'

'বোধ হয়।'

মুখ তুলে বল্লাম, 'বোধ হয় কেন? ব্যারাম কি ওর শেষ পর্য্যন্তও নির্দ্দিষ্ট হয়নি?'

'শেষ পর্য্যন্ত আমি জানিনে—কেননা আমার যখন সন্দেহ হতে সুরু হল তখনই আমি ওকে পরিত্যাগ ক'রে আসি।'

'পরিত্যাগ?' কথাটা আমার মুখ থেকে যেন সঙ্গে-সঙ্গে খ'সে পড়লো—'তবে যে তুমি বল্লে অশোকের মৃত্যু হয়েছিল?'

'পরিহাস করেছি।'

'এ-সব নিয়েও কি পরিহাস তোমার আসে?'

'স্বচ্ছন্দে! আমাকে নিয়েই বা অশোক কম পরিহাসটা করলো কী!

'অশোক বেঁচে আছে?'

'তাই তো জানি।'

ন'ড়ে চ'ড়ে সহজ হয়ে ব'সে বললাম, 'তবে ওর জীবদ্দশায় ওর মেয়েকে তুমি পেলে কী ক'রে?'

'সেটুকু দয়া করবার উদারতা ও শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়েছিল আমাকে।' নিঃশ্বাস ফেলে নীরবে ব'সে রইলাম। মাধবী বলতে লাগলো, 'অশোকের সঙ্গে বিয়ে হবার পরে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম ভাঙা আর জুড়বে না, তালি আর টিঁকবে না। খুব অবাক হবে এবং বিশ্বাসও করবে না হয়তো যে বিয়ের পরে পুরো চার বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম কিন্তু একদিনের জন্যেও আমরা একসঙ্গে শুইনি। প্রত্যেক রাত্রে একই ঘরে পাশাপাশি খাটে দু'জনে দু'জনের নিঃশ্বাস শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। একদিন আমি সারারাত কেঁদেছিলাম, আর সারারাত চুপ ক'রে ব'সে ও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। আমি বল্লাম, "এরকম যন্ত্রণা কি জীবন ভ'রেই পাব?" বল্লে "কেন, আমি কি তোমাকে কষ্ট দিই, আমি কি ভাল ব্যবহার করিনে?"

'কাঁদতে-কাঁদতে বল্লাম "ভয়ানক কষ্ট দাও—ভাল যদি নাই বাসবে তবে কেন এ রকম করলে?"

'বিষণ্ণ মুখে বল্ল, 'মাধবী, আমি লম্পট, আমি পাপিষ্ঠ কিন্তু আমারো তো হৃদয় আছে, আমারো তো সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে—অনুতাপ আছে। কয়েকটা দিন, কয়েকটা দিন অন্তত আমাকে তুমি ভিক্ষা দাও—একলা থাকার অবসর দাও।—দুই হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে ও কাঁদতে

লাগলো পাগলের মত। আমি হাত ধ'রে উঠিয়ে বসালাম, শান্ত করলাম—বল্লাম, "অশোক, আর আমি তোমাকে পীড়ন করবো না, যেদিন মনে পড়বে আমার কথা সেদিনই তুমি আমার কাছে এসো, আমাকে ডেকো—কিন্তু দায়ে প'ড়ে ভালবাসার ভাণ দেখিও না, সে আমার সইবে না।"

'তার পরদিনই আমি মার কাছে চলে এলাম।

'টানা ছ'মাস ছিলাম কিন্তু তবুও সে আমাকে ডাকলো না। ফিরে যেতে সে লিখেছিল, কিন্তু আমি জানতাম সেটা তার একান্তই আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে। স্ত্রীকে পিত্রালয়ে ফেলে রাখতে তার রুচিতে বেধেছিল। আমি ফিরে গিয়ে তার একটুও পরিবর্ত্তন দেখলুম না। তবে শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে কী হত জানিনে কেননা শেষের দিকে আমাকে যেন ও ভালবাসতে সুরু করেছিল মনে হত। কিন্তু আমি তার অবসর দিলাম না। অনেকদিন এমন হয়েছে যে শুতে এসে দেখেছি আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে মেয়ে নিয়ে খেলা করছে। বলেছি, "ওঠ, এবার আমি শোব।" হাত দিয়ে নিজের পাশে দেখিয়ে দিয়েছে, "শোও না"—"ধ্যেৎ!" আমি অমনি প্রতিবাদ করেছি—"তবে কিন্তু মেয়ে নিয়ে যাবো।" "অনায়াসে।" আমি সাংঘাতিক ঠাণ্ডাভাবে জবাব দিয়েছি।

'"উঁহুঁ", অশোক হেসে বলেছে—"মেয়ে যদি সত্যিই নিয়ে যাই তখন আর ফুটুনি খাটবে না। তার চেয়ে লক্ষ্মী মাঝখানে শুয়ে থাক্, আমি আর তুমি দু'পাশে শুয়ে থাকি।"

'"পাগল"—আমি আমলেই আনিনি কথাটা।

'নিঃশ্বাস ফেলে উঠে গেছে নিজের বিছানায়, আর আমি শুয়ে-শুয়ে চিন্তা করেছি কেন আমার এই প্রতিশোধ নেবার এমন দুরন্ত অভিলাষ? বিবেক বলেছে এত দম্ভ ভাল নয়,—কিন্তু তবু আমি নিজেকে খর্ব্ব ক'রে ওর ডাকে সাড়া দিতে পারিনি, কেননা এটুকু আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতাম এখনো ও সম্পূর্ণভাবে তোমাকে ভোলেনি, ক্ষতের উপর সামান্য একটা প্রলেপ পড়েছে মাত্র। আর সেই প্রলেপটি হচ্ছে আমাদের সন্তান। অপমানের কথা নয়, তবু সন্তানের জন্যই আমার মূল্য। এ-কথা ভাবলে আমার দাহ হত। ঠিক এইরকম সময়ে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা। বিলেত থেকে

ফিরে এসেছেন খনিবিদ্যা শিখে। মেজদার সতীর্থ, সেই সূত্রে আলাপ হ'তে-হ'তেই যে কেমন ক'রে এত সহজে ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে গেল তা নিজেও বুঝতে পারলাম না। প্রথম প্রথম কিছুটা ভাণ করতাম অশোককে দেখিয়ে, মনে হ'ত অশোকের ঈর্ষাবৃত্তিটা হয়তো জেগে উঠবে এ দেখে এবং ও কষ্ট পাবে, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য—তা ও পেতো না, বরং আমার ন্যাকামির আভাস পেলেই ও স'রে পড়তো সেখান থেকে। শেষ পর্য্যন্ত দেখি আমার ভাণকে বিনয়বাবু সত্যি মনে ক'রে ব'সে আছেন, আর আমারও মনে হ'ল আমি অশোককে কখনোই ভালবাসিনি—স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর ভালবাসা না পাওয়ার মত পরাজয় আর নেই—আমি এতদিন সেই গ্লানিতেই গুড়ে পুড়ে সারা হয়েছি। আজ আমার দুয়ারে সত্যি-সত্যিই যে প্রার্থী তাকে আমি ফেরাবোই বা কেন। বঞ্চিত হবার জন্য জীবন নয়—বঞ্চনা যে করে তাকে পূজো করবার জন্যও জীবন নয়। সুখ চাই সমৃদ্ধি চাই প্রেম চাই—কেন প'ড়ে থাকবো এখানে। কী আছে অশোকের, কী পেয়েছি আমি ওর কাছে থেকে। মনকে শক্ত করে ফেল্লাম আমি। একদিন রাত্তিরে ঘুমুতে গিয়ে বল্লাম, "তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" বই পড়ছিল শুয়ে শুয়ে—মুখ তুলে তাকালো। আমি বল্লাম, "আর কতকাল ভার হয়ে থাকবো—তুমিই বা আর কতকাল তা বইবে!" "কী হল তোমার?" অত্যন্ত মধুর ক'রে ও হাসলো।

'তুমি তো জান হাসলে ওকে কী আশ্চর্য্য ভাল লাগে, মুহূর্ত্তের জন্য মনটায় একটু মোহ এলো, আমল দিলাম না। অত্যন্ত সহজভাবে বল্লাম, "বিনয়বাবু আমাকে ভালবাসেন, তা বোধ হয় তুমি জান না।"

'"জানি—" কথাটা ব'লেই বইয়ে চোখ ডোবালো, আর আমি স্তব্ধ হয়ে চুপ ক'রে রইলাম। তারপর বুঝতেই পার—মাস ছ'য়েক এইভাবে চল্ল, আর তারপর একদিন ওঁকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এলাম। সমস্যা হয়েছিল মেয়ে নিয়ে—অশোক নিজে থেকেই বল্ল, "বিনয়বাবু রাজী থাকলে মেয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই। আমার আয়ু হয়তো শেষ হয়ে এসেছে কেননা ভিতরে ভিতরে আমি বড় শ্রান্ত, আমার এই ঘুষঘুষে জ্বর আর ঘুরে-ঘুরে কাশি, এটা আমার ভাল মনে হয় না, এজন্যেও লক্ষ্মীকে সরানো দরকার।"'

মাধবী চুপ করলো, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে এমন একটা নিস্তব্ধতা এলো যে আমি ভয়ংকর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'লক্ষ্মী তখন কত বড়?'

ভাঙা ভাঙা গলায় মাধবী বল্ল, 'চার বছরের'—একটু থেমে বল্ল, 'প্রথমটা খুব কাঁদতো বাপের জন্যে, কিন্তু বিনয়বাবু অসাধারণ লোক, তিনি স্নেহ দিয়ে প্রেম দিয়ে আমাদের মা মেয়েকে একেবারে ভ'রে রেখেছেন।'

আমার গলা দিয়ে আওয়াজ আসছিল না—কেশে বল্লাম, 'অশোক এতদিনও বেঁচে আছে কিনা কী ক'রে জানলে?'

'পরশু কাগজে কি দেখনি তার ছবি বেরিয়েছে—সমস্ত সম্পত্তি সে গরীব ছাত্রদের বৃত্তির জন্য দান করেছে, বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি।'

না ব'লে পারলুম না, 'মাধবী, ছবিটা একটু দেখাতে পার?' মাধবী তক্ষুনি উঠে ভিতরের ঘর থেকে কাগজখানা নিয়ে এলো, ছবিটার দিকে তাকাতে আমার ভয় করছিল, একটুখানি চোখ বুলিয়েই এ-কথা সে-কথার পরে অনেক সংকোচ নিয়ে বল্লাম, 'তোমার তো প্রয়োজন নেই বোধ হয়, ছবিটা আমি নিলে কি ক্ষতি হবে?'

মাধবীর মনের ইচ্ছে বোঝা গেলো না, কিন্তু সহজভাবেই সে ছবিটা আমাকে দিল। তারপরে আর বেশীক্ষণ সেখানে আমি ছিলাম না। হস্টেলে ফিরে এসেই অত রাত্তিরে স্নান করলাম, তারপর খাব না ব'লে এসে ঘরে শুয়ে রইলাম। সমস্তটা রাত্তির একবিন্দু ঘুম এলো না, জানালা দিয়ে রাস্তার আলো আসতো ব'লে জানালাটা বন্ধ ক'রেই রাখতাম রোজ, মধ্যরাত্রিতে উঠে সেটা খুলে দিলাম, তারপর আবছা আলোতে সন্তর্পণে ব'সে বার-বার দেখতে লাগলাম অশোকের ছবিখানা। ছবিখানা বোধ হয় বর্ত্তমান চেহারার, তাই এমন বিবর্ণ বিষণ্ণ। মনের মধ্যে গুমরে উঠতে লাগলো কত কথা, তন্নতন্ন ক'রে যাচাই করতে লাগলাম কী সুখ আমি পেয়েছি এ জীবনে। মা নেই, বাপ নেই—সাতকুলে কেউ নেই। দুটো ছোট বোন আছে, তাদের তো কোন জন্মে বিয়ে হয়ে গেছে, দেখাও হয় না। থার্ডক্লাশে উঠেই মাষ্টারি ক'রে-ক'রে পড়তে হয়েছে। মা বাবার মৃত্যুর পরে কাকার আশ্রয়ে দু'বছর ছিলাম কিন্তু দুটো যুগও মানুষের এর চেয়ে সহজে কাটে। কাকীমা মানুষ ভাল ছিলেন, কিন্তু কাকা একটি মূর্ত্তিমান শয়তান। আমরা তিন বোনে তাঁর কাঁধে

যে কী ভীষণ বোঝা এ-কথা তিনি দিনে অন্তত তিরিশবার শোনাতেন এবং ঝি চাকর রাখবার আর তাঁর ক্ষমতা নেই ব'লে আমাদের দিয়ে সব কাজ চালাতেন। কোনোরকমে ম্যাট্রিকটা পাশ ক'রেই আমি বোনেদের নিয়ে হস্টেলে এসে উঠলাম। দিনে তিনটে টিউশানি ক'রে তবে বোনেদের খরচ চালিয়েছি, কাকার অর্দ্ধপয়সাও আর গ্রহণ করিনি। আই, এ পাশ ক'রে যখন বি, এ, তে ভর্ত্তি হলাম, তখন আমার বন্ধুতা হয় মাধবীর সঙ্গে। সে-বন্ধুতা এমন প্রগাঢ় হয়েছিল যে মাধবীর মা বাবার সঙ্গেও শেষ পর্য্যন্ত আমার একটা সম্বন্ধ হয়ে গেল।

আমি তখন বাইশ বছরের মেয়ে, বিদ্যাসাগর কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ি। সেই হস্টেলেই বোনেদের নিয়ে থাকি এবং সকাল সন্ধ্যা দুটো টিউশানি করি। একদিন সন্ধ্যাবেলা টিউশনি সেরে ফেরবার পথে মাধবীদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম মাধবীর মা বসবার ঘরে একটি যুবকের সঙ্গে ব'সে কথা বলছেন। আমি যেতেই বল্লেন, 'ওমা, তুই জানিস না বুঝি, মাধবী তো চুঁচুড়া গেছে ওর পিসি-বাড়ি।' আমি সঙ্কুচিতভাবে দরজায় দাঁড়িয়েই বল্লাম, 'তাই নাকি?'

'তাই ব'লে কি ঘরেই ঢুক্‌বিনে নাকি?'—মাধবীর মা সস্নেহে আমাকে ডেকে আনলেন তারপর যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অশোক, এই দেখ আমার আর একটি মেয়ে। অশোককে তো তুই দেখিসনি, না? তুই যেমন আমার মেয়ে, এও তেমনি আমার আর এক ছেলে।'

আমি চোখ তুলেই দেখলাম অশোক নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি চোখ তোলাতেও ওর চোখ নামলো না। আমার মুখে কী দেখছিল জানি না, পরে ওর মুখেই শুনেছি এ-মুখ নাকি অতুলনীয়।

মাধবীর মা বল্লেন, 'মাষ্টারি তো ক'রে এলি, খাবিনে কিছু?' জড়োসড়ো হ'য়ে বল্লাম, 'না, মাসীমা, আটটার মধ্যে আমাদের ফিরতে হয় জানেন তো?'

"ওঃ, আটটার এখনো ঢের দেরী—' মাসীমা কথা শুনলেন না, খাবার আনতে উঠে গেলেন। অশোক আমাকে বল্ল, 'আপনার কথা মাধবীর কাছে অনেক শুনেছি।'

মৃদু হেসে চুপ ক'রেই রইলাম। অশোকের কথা আমিও মাধবীর কাছে শুনেছিলাম, কিন্তু কথা বলতে আমার সংকোচ হচ্ছিল। একটুখানি চুপ

ক'রে থেকে আবার বল্ল, "শুনেছি পার্টটাইম একটা ইস্কুলেও পড়ান—এখনো তো দেখছি পড়িয়েই এলেন। এত পেরে ওঠেন আপনি?"

আমি সকুণ্ঠে জবাব দিলাম, 'না পেরে উপায় কী?'

'কেন?'—অতিশয় অসঙ্গত এই প্রশ্ন, উচিত ছিল রাগ করা কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রাগ করতে পারলুম না, ঈষৎ হেসে বললুম, 'যদি জানতেই চান, আরো দুটি ছোট বোন আছে আমার।'

'ও—' অশোক চুপ ক'রে গেল। আমিও আর কথা বললুম না।

মাধবীর মা এলেন খাবার নিয়ে—"এ কী অশোক, তুমি যে বড় চুপচাপ। মাধবীর সঙ্গে বুঝি কিছুতেই জমাতে পারছ না?'

অশোক মৃদু হাসল। মাধবীর মা হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চেনা-অচেনার বালাই তো ওর দেখিনি কখনো—আজকে কিন্তু তোকে খুব সমীহ করছে অশোক।'

হঠাৎ আমাদের চোখাচোখি হয়ে গেল এ-কথার পরে।

মাধবীদের বাড়ি থেকে আমাদের হস্টেল মিনিট দশেকের রাস্তা। অশোক আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। ফিরে যাবার সময় বল্ল, 'আশা করি আবার আপনার দেখা পাব।'

'আপনি তো এখানে থাকেন না।'

'থাকি না বটে, কিন্তু আসি প্রায় রোজই। তাছাড়া, সম্প্রতি দিনকয়েক তো এখানেই আছি। আসুন না এর মধ্যে আর একদিন?'

'আচ্ছা'—নমস্কার ক'রে বিদায় নিলাম।

অবিবাহিত যুবক দেখলেই আমার তার সম্বন্ধে কৌতূহল হয়, কেননা সম্প্রতি আমার কনের বিবাহ দেবার কথা আমি ভাবছিলাম। এদের দু'বোনের বিবাহ দিয়ে উঠতে পারলে আমার অনেক কষ্টের লাঘব। ছোটটি পনের বছরের, থার্ড ক্লাসে পড়ছিল, কিন্তু তার উপরেরটির সতের তো হল। বিয়ের পক্ষে এমন সুন্দর বয়স আর নেই; সবে কুঁড়ি ফুটেছে। মাঝে-মাঝে ওকে ঠাট্টা ক'রে দেখেছি ও খুব উপভোগ করে। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছিল, একটা টিউশনিও করে—নিজে এত কষ্ট করছি ব'লে আমার কষ্টটা লাগে বেশী। আমি বড়, দায়িত্ব আমার, ওকে কেন কষ্ট করতে দেব। বাণী তা শোনে না, তাই আমি ভেবেছি ওকে এখুনি বিয়ে দিয়ে দেব।

রাণী বলে, 'বিয়ে তো দেবে কিন্তু পয়সা পাবে কোথায়?'—কথাটা ভাববার মতই, কিন্তু এমনো তো মানুষ আছে যারা পয়সা নেয় না। তাছাড়া মার গহনা আমরা কিছু পেয়েছিলাম। সাবেকি—তাই শুধুই সোনা। তিন বোনেরটা দিয়ে এক বোনকে নিশ্চয়ই পার করা যাবে। রাণী বলে, 'নিজের কথা তো তুমি ভাবই না, কিন্তু রাণীকেও তো বিয়ে দিতে হবে?' 'ওঃ রাণী! রাণীর জন্য ভাবনা নেই, ও বড় হতে হতে আমি বি, এ পাশ ক'রে একটা ভাল চাকরী পাবই, তারপর না খেয়ে টাকা জমাবো।' রাণী ভবিষ্যৎ শুনে হাসে।

অশোককে দেখে আমার মনে কেমন একটা আশা হ'ল। পরের দিন মাধবীকে কলেজে বল্লাম কথাটা। আমার যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকতো তবে দেখতাম মাধবীর মুখ সাদা দেখাচ্ছে, কিন্তু নিজের চিন্তাতেই আমি অভিভূত। মাধবী বল্ল, 'ক্ষেপেছিস্—বাপের এক ছেলে—গাড়ি বাড়ি দাসদাসী নিয়ে মশগুল—সে কি আর অনাথ নিয়ে উদারতা দেখাবে?'—ভয়ানক আঘাত লাগলো মাধবীর কথায়। চাপতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমার মুখ গম্ভীর হল, না-ব'লে পারলাম না, 'অনাথ মানে—রাস্তার ভিখারীও নয়, কারো কৃপাপ্রার্থীও নয়।'

মাধবী অপ্রস্তুত হল। যদিও কিছু না-ভেবেই ফস্ ক'রে কথাটা ব'লে ফেলেছিল, তবু আমার মর্মমূলে তা এমন বিদ্ধ হয়ে গেল যে মাধবী অনেকবার ক্ষমা চেয়েও আর তা উপড়ে আনতে পারলো না। বুঝতে পারলো আমার মন মেঘমুক্ত করা সহজ হবে না, তাই হয়তো ভাবলো মার হাতে ফেলে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ—অগত্যা পরের দিন ওদের বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করে চ'লে গেল বিষণ্ণ মনে।

আবার আমার সঙ্গে অশোকের দেখা হল।

প্রায় সমস্ত দিনটাই ওখানে কাটিয়ে যখন হস্টেলে ফিরে এলাম তখন কেবলি মনে হতে লাগলো এত তাড়াতাড়ি দিন কাটলো কেমন ক'রে? আর আমিই বা এত শীগ্‌গির চ'লে এলাম কেন? ঘর থেকে ঘরে, বারান্দা থেকে বারান্দায়, জানালা থেকে জানালায় এমন চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম যে হস্টেলের প্রত্যেকটি মানুষ আমার ভাবান্তরে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বড়মানুষের ছেলেদের সাধারণত যা হয়ে থাকে, অশোকেরও ঠিক তাই হয়েছিল। বাপ মাইকার ব্যবসা ক'রে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছিলেন।

চেহারা ভাল আর বাপের টাকা আছে এটাই তো শ্রেষ্ঠ গুণ—উপরন্তু ওর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল ব'লে যে-কোনো যুবতী মেয়ের মায়ের মনোহরণ ক'রে বহু মেয়ে নিয়ে খেলবার একটা অনায়াস অবকাশও পেয়েছিল। আমাদের মাধবী তখন ওর নতুনতম আবিষ্কার। ঠিক এই সময়েই আমাদের দেখা। কী যে নেশা হল জানি না, আমি ওকে প্রশ্রয় দিলাম এবং কয়েকদিনের মধ্যেই এমন হল যে দেখা না হ'লে আমাদের আর দিন কাটতো না। প্রথম প্রথম মাধবীদের ওখানেই চলছিল, কিন্তু সেটা সুবিধের হল না, শেষে কোনোদিন গড়ের মাঠে, কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন গঙ্গার ধারে, কখনো বা ট্যাক্সিতে—এই ক'রে ক'রে দিন কাটতে লাগলো। মাসখানেক পরে ও একদিন বল্ল, 'বকুল, আমাকে কি তোমার কখনোই খারাপ লোক মনে হয়েছে?'

নিঃসংশয়ে বল্লাম, 'না'।

'আমাকে ভাল ক'রে জানবার অবকাশ তুমি পাওনি, তাই। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিনই মনে হয়েছিল আর সকলের মত এ অবকাশ আর তোমাকে দিতে পারবো না, আমার মধ্যে যা মেকি তা সমস্তই এবার পুড়ে যাবে তোমার উত্তাপে। অনেকে অনেক বলতে পারে—যদি শোনো মন খারাপ কোরো না। তোমার কাছে আমার যে-রূপ সেই তো আমার আসল।'

কথা বলতে-বলতে ও কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমি বল্লাম, 'তুমি কি ভাবো আমার মন এতই কাঁচা—লোকের চোখ দিয়ে আমি যাচাই করবো তোমাকে?'

'হ'তেও তো পারে?'

'কখনোই না।'

'আচ্ছা ধর, কোনো সূত্রে যদি জানতে পার যে আমি দেবতার ছদ্মবেশে একটি শয়তান—'

'থাম, থাম'—আমি ব'লে উঠলাম—'আর বিনয়ে কাজ নেই। তাছাড়া শয়তানকেও তো মানুষ ভালবেসে ফেলতে পারে। জান না রবীন্দ্রনাথের কথা "খোকা ব'লেই ভালবাসি ভাল ব'লেই নয়"।'

ও বল্ল, 'তবু আমি আশ্বাস পাচ্ছিনে, বকুল। বকুল, তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ঠকাইনি, আমার সমস্ত প্রাণে-মনে আমি তোমাকে গ্রহণ

করেছি।' এমন ব্যাকুলতা ছিল কথাগুলোতে যে আমি বলবার কিছু খুঁজে পেলাম না। চুপ ক'রে ব'সে রইলাম অনেকক্ষণ, তারপর ফিরে এলাম হস্টেলে।

তার দিন কয়েক পরে একটু বিষণ্ণ মুখে বল্ল, 'বকুল, আমাকে বোধ হয় শীগ্‌গিরই বাইরে যেতে হবে।'

'কেন?'

'বাবার বাত হয়েছে, ডাক্তারেরা তাঁকে নিয়ে পুরী যেতে বলেন।'

'ও।'

আমার এই সংক্ষিপ্ত জবাবে ও সুখী হল না—একটু অপেক্ষা ক'রে বললো, 'আর কিছু বলছ না যে?'

'কী বলবো?'

'কেন, বলবার কি কিছুই নেই?'—মৃদু হাসলাম, জবাব দিলাম না।

'না, না—ওরকম বিমর্ষ হ'লে চলবে না।' অধীর আগ্রহে ও আমার হাত ধ'রে নাড়া দিল। আমি বল্লাম, 'খবরটা কি আমার পক্ষে খুব হর্ষ করবার মতো?'

'ও, তাই!' একটু থেমে— 'কিন্তু দুঃখ করবারও বোধ হয় কিছু নেই, কী বল? তোমাকে তো কম জ্বালাই না আমি। কিছুদিন—'

'নাও, ছেলেমানুষী কোরো না'—প্রায় ধমকে উঠ্‌লাম—'এখন যে আমাদের কত ভাববার দিন এসেছে তাও কি তোমাকে ব'লে দিতে হবে?'

'ভাবনা আবার কী। বাবাকে বলবো, মত দিলে ভাল, না-দিলেও ক্ষতি নেই—তোমার অনুমতি পাওয়া দিয়েই হচ্ছে কথা—কিন্তু বকুল, একটা কথা—'

'বল—'

'মানে—এই—' অনেক ইতস্তত ক'রে থেমে থেমে ও বল্ল,' 'বলছিলাম কী, মাধবীরা কি এসব জানে?'

'খুব সম্ভব না—আর জানলেই বা কী।'

'না, না, খবরদার'—অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে অশোক ব'লে উঠলো। আমার তা ভাল লাগলো না, বল্লাম, 'কেন বল তো?'

'না, কারণ কিছুই নেই, তবে ওরা আমাকে আশা করেছিলেন এই আর কি।'

হঠাৎ আমার মাধবীর কথা মনে হল, 'বড়লোকের ছেলে বাড়ি গাড়ি দাসদাসী নিয়ে মশগুল, সে আর অনাথ নিয়ে উদারতা দেখাবে না।' প্রতিহিংসার একটা আনন্দ বিদ্যুতের মত খেলে গেল হৃদয়ের মধ্যে।

বল্লাম, 'অশোক, তোমাকে বলাই ভাল—ছাখ, আমি একান্তই নিঃসম্বল মেয়ে, বাপ দাদার সাহায্য কী বস্তু তা আমার জানা নেই—মাধবীর ভাষায় নিতান্ত অনাথ,—এখনো সময় আছে ভেবে দেখবার—' বলতে বলতে আমি অশোকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার কথায় ওর মন নেই, অন্য দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কী চিন্তা করছে।

'কী ভাবছ?'

'উঁ'—হঠাৎ যেন জেগে উঠলো। 'না, বলছিলাম কী'—সেই পূর্ব্ব কথারই জের টেনে বললো, 'পাঁচজনকে জানাবার দরকারই বা কী, আর দেরিই বা মিছিমিছি করছি কেন?'

'দেরি মানে?'—আমি অবাক্ হয়ে বল্লাম, 'তুমি মনে মনে কী যেন ভাবছ।'

'বকুল, আমার যেন মনে হয় পুরী থেকে ফিরে এসে আর তোমাকে পাব না, তার চেয়ে এসো কালকেই আমরা নোটিশ দিয়ে আসি, তারপর যে ক'রেই হোক, আর পনেরো দিন আমি বাবাকে ঠেকিয়ে রাখবো—একেবারে রেজিস্ট্রি ক'রে শেষে পুরী যাব।'

'পাগল!'—আমি আমলই দিলাম না কথাটায়। 'এ কি সম্ভব নাকি?' আমার টাকা কোথায়? তা ছাড়া দু'টো বোন মাথার বোঝা। কত দায়িত্ব, কত ভাবনা, হট্ ক'রে একটা বিয়ে করলেই হল নাকি?'

'তোমার আবার বাড়াবাড়ি'—অধীর হয়ে অশোক বল্ল। 'টাকার জন্য যদি আবার ভাবনাই করবে তবে এ অভাগাকে দিয়ে হবে কী? আর রাণী বাণী? বেশ তো, তোমার কাছেই থাকবে ওরা।'

'ওরে না, না, আমার অবস্থা তুমি বুঝবে না—আজন্ম সুখে লালিত তুমি, যখন যা ভাব নিমেষেই তা করতে পার, কিন্তু আমি—'

অশোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে গেল।

আর দু'দিন পরে ও পুরী চ'লে গিয়েছিল। যাবার আগে একটা মাস ওকে নিয়ে আমি এমন মত্ত হ'য়ে ছিলাম যে অন্যদিকে মন দেবার আর আমার অবকাশ ছিল না। মাধবী কলেজে আসতো না, শুনেছিলাম ওর অসুখ। এবার মনে হল খুব অন্যায় করেছি। সেদিনই বিকেলে টিউসানির পরে ওকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম বাড়ি ফাঁকা—শুনলাম আজ প্রায় পনেরো দিন ওরা কোথায় গেছে, কবে ফিরবে তাও কেউ জানে না। মনে-মনে যেন কেমন একটা মুক্তি পেলাম। আমার কেবলি ভয় হচ্ছিল ওরা বুঝি সব জেনে ফেলেছে—ওদের দেখা না পেয়ে দুঃখিত হবার অবকাশ আর আমার হল না।

অশোক গিয়ে আমাকে রোজ একখানা চিঠি লিখতে লাগলো। জীবনে চিঠি লেখা বা পাওয়া কী বস্তু তা আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। আমি পেরে উঠতাম না ওর সঙ্গে। শেষে মাস দেড়েক পরে মনে হ'তে লাগলো এখনো যদি অশোক ফিরে না আসে আমিই বুঝি চ'লে যাব ওখানে। দিন আর কাটে না—রাত্রে ঘুমুতে পারিনে। লিখলাম, 'অশোক, তুমি তখন যা বলেছিলে তাতে সম্মত না হ'য়ে ভুল করেছি, চিরটা দিন কেবল ভেবে ভেবে আমার স্বভাবই গেছে খারাপ হয়ে, সব বিষয়েই আমার ভাবনার বাড়াবাড়ি। তুমি নেই, এখন তো আমার দিন কাটে না। তুমি কি আমাকে আরো কষ্ট দেবে?'

এর দিন দশেক পরেই ও ফিরে এলো কলকাতায়। দেখা হ'তেই বল্ল, 'বকুল, বাবা কিন্তু খুব খুসী হয়েছেন। একদিন তোমাকে যেতে হবে বাবার কাছে। আর ওঁর ইচ্ছে বিবাহটা হিন্দুমতে হয়।'

মুখে বল্লাম, 'ভালই তো'—কিন্তু মনে আবার চিন্তা এলো। আমার বিবাহ আমাকেই যেখানে দিতে হচ্ছে সেখানে রেজিস্ট্রিই উৎকৃষ্ট পন্থা। কোথায় নেব বাড়ি, কে আসবে কনে সাজাতে, কে করবে সম্প্রদান, কে কিনবে বিবাহের দান-সামগ্রী—এ-সব বিলাস কি আমার মত নিঃস্ব মেয়ের জন্য? হিন্দুমতে বিবাহ ব্যাপারটাই আসলে বড়লোকের জন্যে, যাদের টাকা এত বেশী আছে যে খরচ না করলে আর ধরছে না ঘরে, তাদের জন্যে। তা নয় তো এক রাত্তিরের একটা সামান্য আমোদের জন্য হাজারে হাজারে টাকা কী ক'রে মানুষ অকাতরে খরচ করতে পারে? অশোক বল্ল, 'আজকে ধর আষাঢ়

মাসের সাতাশে—শ্রাবণ মাসের আঠারো তারিখেই একটা বিবাহের দিন আছে।'

'ওরে বাবা, একেবারে দেখছি তারিখও মুখস্ত ক'রে এসেছ।'

'তবে কী—তোমার কি এখনো আরো কিছুদিন ভাবতে হবে নাকি?'

'ভাবনার অবসান তো ক'রেই ছিলাম', হেসে হেসে সত্যি কথাটাই বল্লাম। 'নতুন ক'রে ভাববার খোরাক তো তুমিই জোগালে।'

'কেন বল তো?'

'বাঃ, হিন্দুমতে বিয়ে, সে কি একটা সামান্য কথা? কোথায় রে বাড়ি, কোথায় রে টাকা—কেনো লাঠি, কেনো ছাতা, বাসন, কোসন—'

'নাও, ভারি তোমার গরব। দৈন্য না দেখিয়ে কাজের কথা শোনো তো। কাল রোববার। সকালবেলা আমি আবার আসবো—তোমাকে নিয়ে যাবো আমাদের বাড়ী। রাণী বাণীও যাবে।'

'ওদের আর কেন—ও বেচারারা এখনো জানে দিদি তাদের জন্যেই ব্যবস্থা করছে—'

'আহা, ওরা কি আর কিছু বোঝে! নেহাৎ খুকী কিনা!'

'তা মুখোমুখি যখন কিছু বলেনি তখন নেপথ্যে থাকাই ভাল।'

'বেশ, যা ভাল বোঝো কোরো, কিন্তু প্রস্তুত থেকো মোটমাট।'

পরের দিন বেলা প্রায় আটটার সময় ও আমাকে নিয়ে গেল। গাড়িতে ব'সে সাংঘাতিক ঝগড়া, কেন আমি সাদা শাড়ি পরে এলাম। আমি ছেলেবেলা থেকেই মিলের সস্তাদামের সাদা শাড়ি পরেই অভ্যস্ত—নিজে উপার্জন করবার পরে, কখনো-কখনো যে সখ না হত এমন নয় কিন্তু দু'টি ছোট বোন আছে, কেন্‌বার সমস্ত সখ ওদের দিয়েই মেটাতে হত। তাই সত্যি বলতে আমার ছিলই না রং করা কোনো ভাল শাড়ি। বলতে গিয়ে তাড়া খেলাম এবং গাড়ির মোড় ফিরলো অন্যদিকে। শাড়ির দোকানে এসে গাড়ি থাম্‌তেই আমার মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। কারো কাছে কখনো পাইনি, কাজেই কেউ কিছু দিতে চাইলে সেটা মনে হ'ত দয়া। অনর্থক ঘা লাগলো আত্মসম্মানে, বল্লাম, 'ছি, ছি, এটা তোমার বোঝা উচিত অশোক, এখনো আমি তোমার স্ত্রী হইনি, আমার জন্য উপহার কেনা তোমাকে মানায় না।' আমার কথা না

শুনে তবুও নামতেই আমার মুখের ভাব বদলে গেল। বল্লাম, 'অশোক, আমাকে গরীব পেয়ে অপমান করছো?'

'অপমান! তোমাকে!'—অশোকের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ দেখালো। নিঃশব্দে উঠে এসে গাড়িতে বসলো, আর দ্বিতীয় কথা আমাদের হ'ল না গাড়িতে।

ওদের বাড়ি এসে পৌছুতেই বছর আঠারোর একটি মেয়ে এসে আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেল ঘরে। কার্পেট মোড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়—উপরের সিঁড়িতে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। অশোক বল্ল, 'আমার বাবা, প্রণাম কর।' ভদ্রলোককে আমি জীবনে ভুলবো না। অমন অদ্ভুত স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর আমি কখনো কোনো মানুষের শুনিনি—মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্লেন, 'থাক্ মা।' যে-ঘরখানায় গিয়ে বসলাম সেখানা বুঝলাম আমার জন্যেই বিশেষরূপে সাজানো হয়েছে। প্রায় মাটি সমান নিচু বিরাট একটি তক্তপোষে ধবধবে সিলকের পুরু চাদর পাতা—তার পাশে পাশে চোখ ঝলসানো ব্রোকেডের তাকিয়া—মাঝখানে মস্ত বড় এক রূপোর থালায় ধান-দূর্বা আর ফুলচন্দন। মেঝেতে কাশ্মিরী কার্পেট। ভদ্রলোক আমাকে সস্নেহে সেই তক্তপোষের উপর নিয়ে বসালেন, বল্লেন 'অশোকের মা নেই তা তো জান—তিনি থাকলে ব্যবস্থা হত অন্যরকমের—এমনই অদৃষ্ট ক'রে অভাগা এসেছে যে একটা দিদি ছিল সেটাও সইল না কপালে—এই ছাখো তার স্মৃতি বহন ক'রে বেড়াচ্ছি আজো—' মেয়েটিকে তিনি আঙুল তুলে দেখালেন। ঠিক যেন বাণী। অকৃত্রিম মমতায় তাকে কাছে কাছে টেনে নিলাম।

'তোমারই সমস্ত, মা—তুমি হবে আমার ঘরের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী। তোমাকে দেখার আগে তোমার কথা শুনেই আমি ভেবেছিলাম এ-কথা—দেখে মনে হচ্ছে তুমি তার চেয়ে অনেক বেশী।'

এতখানি স্নেহভাষণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না—আমার আঁশা অতদূর যায়নি—সহসা চোখ ভ'রে জল এলো আমার। মায়ের মৃত্যুর পরে বোধ হয় এই প্রথম চোখে জল। স্পষ্টই মনে হল এত সুখ আমার জন্যে নয়—সুখী হবার জন্য আমি জন্মাইনি। দাউ-দাউ ক'রে উঠলো মনের মধ্যে। অবশেষে এতদিনকার দুঃখের পাষাণ গ'লে গ'লে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো। অশোক অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, আর ওর বাবা

হাত বুলুতে লাগলেন মাথায়। একটু শান্ত হ'লে উনি আমাকে একজোড়া জড়োয়ার কঙ্কন—আর এক ছড়া সোনার হার দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং একখানা মোহর দিলেন হাতে।

ফেরবার পথে অশোক বল্ল, 'তুমি অত কাঁদলে কেন?'

'কাঁদবো না? তোমার বাবা আমাকে অত আদর করলেন কেন? আদর কি এর আগে কখনো আমি পেয়েছি, সংসারে কি আমার জন্যেও আদর আছে?'

'পাগলী।' অশোক ঝুঁকে পড়লো আমার মুখের উপর—এই প্রথম ও এই শেষ—ও আমার সঙ্গে একটু অসংযত ব্যবহার করলো, এবং আমিও প্রশ্রয় দিলাম।

হস্টেলের দরজায় নেমে প্রথমেই সেই কঙ্কন আর হার ছড়া খুলে ভিতরে এলাম—কেউ জানতে পারলো না। কিন্তু আগুন কি ছাই চাপা থাকে? সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমাদের হস্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বল্লেন 'বকুল, এ-সব কী শুনি?'

'কী শোনেন?'

'তুমি নাকি একজন যুবকের সঙ্গে প্রণয় করছো? এ-রকম অপরিণামদর্শী হলে তার জন্য যথেষ্ট দুঃখভোগ করতে হয় শেষে তা জান?'

আমাদের হস্টেলের এই কর্ত্তৃঠাকুরাণীর এ-সব বিষয়ে অসাধারণ ঈর্ষার খবর হস্টেলবাসিনী আমরা প্রত্যেক মেয়েই জানতাম। তিনি দেখতে অসাধারণ খারাপ—যৌবনে নাকি এত বেশী খারাপ ছিলেন যে তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বলতেই ভয় করতো। হৃদয়ের দিক থেকে তিনি তো আর পাঁচজন মানুষের মতই, কাজেই শারীরিক রূপের জন্য পৃথিবী যে-বঞ্চনা তাঁকে করেছিল আসলে তারই একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মনে মনে। অন্যের প্রেম ইনি সইতে পারতেন না। যাকে চেনেন না, তারও যদি বিবাহের খবর পেতেন রাগে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়ে দাঁত বার ক'রে আমাদের ভয় দেখিয়ে আধ মরা ক'রে রাখতেন।

সভয়ে বল্লাম, 'আমি বিয়ে করছি।'

'বিয়ে!'—বোমা এবার ফাটলো। 'এ হস্টেলে ও-সব চলবে না, এত সব অবিবাহিত মেয়ে আছে, কই, কেউ তো তোমার মত এরকম বিয়ে করতে চাইছে না।'

'আর কাউকে দিয়ে আমার কী হবে? বিয়ে তো করছি আমি। আর তাছাড়া এ হস্টেলে তো এমন কোনো নিয়ম নেই যে এখানে থাকলে কেউ বিয়ে করতে পারবে না।'

'যাও, যাও, জ্যাঠামি কোরো না।' একটু পরে—'বকুল, তুমি ভেবে ছাখ, কাজটা কিন্তু ভাল করছ না।

'আমার ভাবনার জন্য আপনার উপদেশের প্রয়োজন নেই।'

এর পর সুর বদলিয়ে কর্তৃঠাকরুণ বল্লেন, 'বকুল, তোমাকে কি আমি ভালবাসি না? আমি কি তোমার চেয়ে ঢের বেশী অভিজ্ঞ না?—আমার কথা শোনো, বিয়ে তুমি কোরো না। পুরুষরা ভারী অমিতাচারী জীব। আজকে তোমার চেহারা সুন্দর আছে, তাই—' এবার আসল কথায় উনি এলেন, 'ধর কাল তোমার বসন্ত হ'ল, তারপর তোমার মুখ বীভৎস দাগে ছেয়ে গেল—চুল উঠে টাক প'ড়ে গেল—তখন তোমার উপায়?' ভদ্র-মহিলার কথা শুনে বুক কেঁপে উঠলো, বললাম, 'ও-সব বলছেন কেন—আপনার অসুবিধে ক'রে আমি হস্টেলে থাকবো না—আমি কালই চ'লে যাব।'

'না, না, চটো কেন—আহা চটো কেন।' উনি দাঁত বার ক'রে হাসতে লাগলেন।

পরের দিন ভোরে উঠেই বেরিয়ে গিয়ে ফোন করলাম অশোককে। দেখা হ'তেই সব বল্লাম। 'তবে উপায়?' অশোকের মুখ শুকিয়ে গেল। বল্লাম, 'ভয় পাচ্ছ কেন? আমি আপাতত আমার কাকার বাড়ীতে গিয়ে উঠি। এর মধ্যে তুমি আমার জন্যে একটা বাড়ীর খোঁজ কর এক মাসের জন্যে—আজকে ছাখো উনত্রিশ তারিখ, আর ক'টা দিন বাঁ আছে, কেটে যাবে।'

'কোন পাড়ায় বাড়ি নেবে?'

'হস্টেলের কাছেই নেয়া ভাল—কেননা আমার তো বন্ধু-বান্ধবরাই সব—ওদের যেখানে সুবিধে সেখানে থাকাই ভাল।' ফিরে এসে রাণী-বাণীকে জিনিষপত্র গোছাতে ব'লে যারা বিশেষ বন্ধু তাদের ডেকে বল্লাম সমস্ত কথা—মুহূর্তে হস্টেলটি সরগরম হ'য়ে উঠলো—কেউ উলু দিতে লাগলো, কেউ গান ধরল, কেউ বা তবলা বাজায়—বেলা বারোটার সময় এমন মারাত্মক গণ্ডগোল

আরম্ভ হল যে চেয়ে দেখি আশে-পাশের বাড়ির জানালায় সব জোড়া জোড়া চোখ। উত্তেজনা থামলে বল্লাম, 'ছাখ, তোদের মেকুরঠাকরুণ তো আমাকে হস্টেলে থাকতে দেবেন না।'

আমাদের হস্টেল সুপারিডেন্টের একটি বদ অভ্যাস ছিল, কয়েকজন মেয়েকে একসঙ্গে জটলা করতে দেখলেই উনি টিপে টিপে এসে পেছনে দাঁড়াতেন—তাঁর ধারণা মেয়েরা একসঙ্গে হ'লে নিশ্চয়ই প্রেমের গল্প করে।—পুষ্প আমার সহপাঠিনীও ছিল এবং সবচেয়ে অন্তরঙ্গও ছিল—ঢাকার মেয়ে সে—ঢাকার প্রাদেশিক ভাষায় বেড়ালকে 'মেকুর' বলে—এ নামকরণ—পুষ্পেরই কীর্তি। ও অবিশ্যি 'মেকুর ঠাকরুণ' বলতো না, বেশীর ভাগই মেকুরনিটা'—কখনো কখনো রাগ কম থাকলে 'মেকুরঠাইন'। কী ভীষণ হাসাহাসি হ'ত আমাদের মধ্যে এ নামকরণ নিয়ে—সে-কথা ভাবলে এখন অবাক লাগে। ওর আসলনাম সুললিতা ব্যানার্জি। এই সুললিতা নামটির জন্যও বেচারা অসম্ভব লাঞ্ছিত হত। আমাদের শান্তিদি—তিনি আবার একটি পদ্যও লিখেছিলেন এই নিয়ে—

শোন মিস্ ব্যানার্জি
মা-বাপের মরজি
তাই করি সহি—
তোমার ও-নাম।
হ'তো যদি হিড়িম্বা,
হস্তিনী, কিম্বা
জয়জগদম্বা,
মিলতো স্বনাম!

ওর বাথরুমের দেয়ালে অতি সুরূপা একটি নারী-মূর্তি এঁকে তার পাশে এই পঙ্‌ক্তিটি লেখা হয়েছিল।

পুষ্প বল্ল, 'কেন, হস্টেল কি মেকুরনির সম্পত্তি নাকি? কিছুতে তুই যাবিনে বকু—দিক্ তো তোকে তাড়িয়ে, দেখি না কত বড় বুকের পাটা।—কিন্তু ভাই বকু—' আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে ও রঙ্গ ক'রে বল্ল 'তুই তো দিব্যি টেপ গেলালি—আর এ-অভাগিনীগুলোকে কি ভাসিয়ে দিবি?'

'তুমি বাবা গভীর জলের মাছ—আর আমরা চুনোপুঁটিরা—হায় হায়রে—'

ব'লে অনিমা ঠাস্ ঠাস্ কপাল চাপড়াতে লাগলো। শান্তিদি গানে মত্ত ছিলেন, কান এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'এই—কী বল্লি তোরা ?'

আমি বল্লাম, 'শান্তিদি, কাজের কথা শোন। মেকুরনির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এখানে থাকা আমার ভাল মনে হয় না—আজ আমি আমার কাকার বাড়ি চ'লে যাই, কাল ভোরে তুমি আর পুষ্প হস্টেলে অপেক্ষা কোরো, তিনজনে মিলে একটা বাড়ি খুঁজে বার করবো।' পুষ্প খুনোখুনি করতে লাগলো, 'ক্ষেপেছিস্ নাকি ?—অত মিনিমুখো হ'য়ে অন্যায় সহ্য ক'রে তুই চ'লে যাবি ? না—তা হবে না।' অনেক ব'লে ক'য়ে ওকে শান্ত করলাম আর তার ঘণ্টা কয়েক পরে আমার শান্তির আবাস চিরতরে ভেঙে ফেলে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

তিন বছর পরে আবার দেখা কাকার সঙ্গে। বাইরের ঘরেই বসেছিলেন, ট্যাক্সি থামতেই হুঁকো হাতে এগিয়ে এলেন 'একি তোরা যে।'—হাসি মুখে বল্লাম 'এলাম'।—বলেই ব্যাগ থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বার ক'রে কাকার হাতে দিয়ে বল্লাম, 'ট্যাক্সি ভাড়াটা চুকিয়ে, টাকাটা আপনার কাছেই রেখে দেবেন।'

কাকা ইঙ্গিত বুঝে খুসী হ'য়ে অভ্যর্থনা করলেন 'যা, যা, ভিতরে যা, এতদিনে মনে পড়লো !'

তারপরের কয়েকটা দিন অবর্ণনীয়। সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি—জিনিষপত্র কেনা—বাড়িঘর ঠিক করা—টাকাটাও আমার, পরিশ্রমটাও আমার তবু কাকাকে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে রাখতে হ'লো। আমার নতুন বাড়ি ঝম্‌ঝম্ করতে লাগলো আর এতদিনের সমস্ত সঞ্চয় আমি দু'হাতে উড়িয়ে দিলাম মনের আনন্দে।

বিবাহের তিনদিন আগে অশোক বল্ল, 'চল তোমাকে নিয়ে আংটি কিনতে যাব।' বেরুলাম দু'জনে, এখানে ওখানে ঘুরে কেনা হল আংটি—গাড়ীতে ব'সে ও আমার আঙুলে পরিয়ে দিল। হেসে বল্লাম, 'হীরের আংটি দিয়ে ভালই করলে, প্রয়োজন হলে আত্মহত্যা করা সহজ হবে।' ফেরবার পথে হস্টেলে নামলাম। যেতেই শান্তিদি বল্লেন, 'আজ দু'দিন ধ'রে মাধবীর বাড় থেকে তোকে এমন জরুরি ডেকে পাঠাচ্ছে কেন রে ?'

'মাধবীরা এসেছে ?'

'নিশ্চয়ই, নয়তো ডেকে পাঠাবে কেন ?'

'তবে তো আজই যাওয়া উচিত আমার।'

'পুষ্প বল্ল, 'আরে বোস্ বোস্—'

'না ভাই, মরবার সময় নেই আমার।'

গেলাম মাধবীদের বাড়ী। বসবার ঘর পার হয়ে খাবার ঘরে ঢুকতেই মাধবীর সঙ্গে চোখাচোখি।

'কোথায় গিয়েছিলি তোরা ?' উৎসাহভরে কাঁধে হাত দিলাম—মাধবী নিঃস্পন্দ। 'কী হয়েছে তোর ?' ব'লেই মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওকে আর মাধবী ব'লে চেনা যায় না। অমন সুন্দর লাবণ্যভরা মুখময় কে যেন দোয়াতের কালি ঢেলে দিয়েছে। একখানা রঙিন খদ্দরের চাদরে সমস্ত দেহ আবৃত ক'রে অতিশয় নীচু সুরে বল্ল, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, আমার ঘরে এসো।'

ঘরে গিয়ে বসতেই বল্ল, 'তোমার নাকি বিয়ে ?'

'হ্যাঁ'

'কার সঙ্গে ?'

'তুমি কি কিছুই জান না ?'

'জানি না ঠিক, তবে জনরব কানে এসেছে। সত্যিই কি অশোক ?'

'হ্যাঁ।'

'অশোক তোমাকে বিয়ে করছে ?'

'আপাতত তো তাই ঠিক।'

'অশোক কি কখনো বিয়ে পর্য্যন্ত এগোয় ?'

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বল্লাম, 'এ-সব বলে এখন লাভ কী, মাধবী, যা হচ্ছে তা আর ফিরবে না।'

আমার কথায় একটু ঝাঁঝ ছিল। কেন না অশোক বলেছিল মাধবী আশা করেছিল ওকে—বুঝলাম সেই ঈর্ষায় মাধবী আজ এত বিচলিত।

'আলবৎ ফিরবে।' আমি হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম ওর গলার জোরে।

'তুমি কি পাগল হলে মাধবী ? এমন করছো কেন ?'

'এমন করছি কেন'—মাধবী উত্তাল হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বল্ল, 'আমি ওকে ভালবাসি বকুল—বকুল, ওকে তুই ছেড়ে দে। বকুল, তোর

কাছে আমি আজন্ম কেনা রইবো—তুই ওকে ছেড়ে দে।—তুই ওকে ছেড়ে দে।'

আমি কী বল্‌বো ভেবে পেলাম না—উঠে প'ড়ে বল্লাম, 'মাধবী, আমি আজ যাই।'

হঠাৎ মাধবী দুই হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরলো, 'বকুল, তুই কথা দিয়ে যা এ বিয়ে তুই ভেঙে দিবি।'

'মাধবী, তা আর হয় না, তুমি ভালবাস একা, আমাদের ভালবাসা পরস্পরের। তা ছাড়া তোমার সুখী হ'তে ইচ্ছে করে, আমার করে না? কী পেয়েছি এ জীবনে—অনাথ ব'লে তুমিও অবহেলা করেছ, আমি ছাড়বো না—কক্ষণো ছাড়বো না—ওঠ তুমি পা ছেড়ে।' ছিনিয়ে আনলাম পা। মাধবী চোখ মুছে মুখোমুখি দাঁড়ালো। 'বকুল, সব সত্যি—কিন্তু আমাকেও তো পথ ব'লে দেবেন তোর স্বামী। তাঁর সন্তান যে আমি এই চারমাস ধ'রে এত কষ্টে এত দুঃখে এই জঠরে লালন করছি তার কী উপায় হবে?'

'তাঁর সন্তান!' বজ্রাহতের মত আমি ব'সে পড়লাম মাটিতে।

'হ্যাঁ, তাঁর সন্তান!'

'অশোকের সন্তান?'

'হ্যাঁ, অশোকের সন্তান। শুধু আমাকে নয়, বকুল, ফাঁদে ফেলে সে অনেককেই এই উপহার হয়-তো দিয়েছে, কিন্তু ভালবাসার ভাণ আমরা বুঝিনি।'

'এত বড় লম্পট অশোক! এত বড় লম্পট!'

ঘৃণায় দুঃখে-অভিমানে অপমানে জর্জরিত হয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। সমস্ত রাত্রি জেগে চিঠি লিখলাম দু'খানা। একখানা অশোককে, একখানা মাধবীকে। পরের দিন ভোর হ'তেই তা ডাকে ফেলে বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে। ট্রামে বাসে রিক্‌সাতে সমস্তটা দিন কী ক'রে যে কাটালাম জানিনা। এ লজ্জা আমি রাখবো কোথায়? কী কৈফিয়ৎ দেব সকলকে? বাড়ি ফিরলাম চারটাতে। ফিরেই শুনলাম অশোক প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ব'সে আছে আমার জন্যে। কী করি—ইচ্ছে ছিল না দেখা করবার, কিন্তু ছোট বোনদের সামনে 'সীন্' করতে পারলাম না।

আমি যেতেই অশোক মাথা নিচু করলো। বললাম, 'আমার চিঠি পাওনি?'

'পেয়েছি।'

'তবে এসেছেন যে?'

'পাপ করেছি আমি, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত কি তুমিও করবে?'

'আমি করবো কেন?'

'আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ না হওয়া মানেই তোমারো প্রায়শ্চিত্ত। বকুল, মাথা ঠাণ্ডা করো—আমাকে ক্ষমা করো।'

'অশোকবাবু!'—আমার ডাক শুনে অশোক কেঁপে উঠলো। 'যা বল্‌ছি শুনুন—আপনি আর আমার বাড়িতে আসবেন না।'

'এই কি শেষ কথা?'

'হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।'

অশোক বেরিয়ে গেল বিবর্ণ মুখে।

মাধবীকে বিয়ে করতে ও বাধ্য হয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত। আমি সেই সময়ে ময়মনসিংহে কাজ জোগাড় ক'রে চ'লে এসেছিলাম।

অশোকের বাবার দেওয়া সেই জড়োয়ার কঙ্কন আর হার আমি আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছিলাম মাধবীকে। হীরের আংটিটি পারিনি খুলতে। কত রাত্রে, কত দিনে, কত নিরালা অবকাশে এই আংটিটা আমাকে দুঃখ দিয়েছে, তবু খুলিনি। মৃতমানুষের চিহ্ন যেমন তার সন্তান—এই আংটিটাও আমার কাছে তেমনি ছিল, আজকে দিয়ে এলাম অশোকের সন্তানকে সেটা। সেই থেকে এই তো দশ বছর কাটলো। মাষ্টারি ক'রে ক'রে হাড় পাকা হ'য়ে গেল। এমন কি আমাকে দেখলে পর্য্যন্ত লোকেরা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি বুঝি মাষ্টারি করেন?' তবু কেন পোড়া জায়গায় চাপ দিলেই ঘা বেরিয়ে আসে?

কিন্তু অশোক কেমন আছে এখন? কে ওর সেবা করে?···কী নিষ্ঠুর মাধবী!

ভাবছি কাল একবার অশোককে দেখতে যাব।

ব্ল্যাক-আউটে বিপত্তি

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

পা টিপে টিপে আমরা চলি। সিনেমা-হাউসের আড়াল-করা আলোর—নামমাত্র আলোর—আওতা ছাড়াতেই একেবারে ঘুট্‌ঘুট্টির মধ্যে এসে পড়েচি। এর আগের ব্ল্যাক্-আউটে তবু একটুখানি আলোর আভাস ছিল, ফিকে জ্যোৎস্নার আবছায়া,—এক কাস্তে চাঁদের আলো পৃথিবীর পক্ষে নেহাৎ কম নয়। (দুজনের পক্ষে তো খুবই বেশী!) কিন্তু এ বারের এই ব্ল্যাক্-আউটে একেবারেই সেরে দিয়েছে।

তবে এই অন্ধকারই ভালো! এমন ঘুট্‌ঘুট্টিই বা মন্দ কি? পা টিপে টিপে পাশাপাশি চল্‌তে ভালোই লাগে। তবে পাশে, নিতান্তই নিজের—[illegible]লে গিয়ে—এই যা!

ব্ল্যাক-আউট, নির্জ্জনতা এবং একটা খাস্‌া ছবি—যুগপৎ উপভোগ করবার লালসায়, এই বেহালা পর্য্যন্ত আমাদের ঠেলে আসা। ছবিটাই বিশেষ করে'। নামজাদা ছবি, কিন্তু কলকাতার বড় বড় সিনেমায় যখন এটা দেখানো হচ্ছিল, তখন ছোটখাটো কত কাজে জড়িয়ে থেকে দেখা হয়ে ওঠেনি, তারপর আজ হঠাৎ কলকাতার উপকণ্ঠে এর পুনঃ প্রদর্শনীর ঘোষণা দেখে এবং তার সঙ্গে ব্ল্যাক্-আউটের যোগাযোগ লক্ষ্য ক'রে ভাবলুম এ-সুযোগ আর ফস্‌কানো যায় না!

এইমাত্র সিনেমা ভেঙেচে, এবং আমরা—আমরাও ভেঙে পড়েচি!

যে ব্ল্যাক্-আউটের অপরূপ উপভোগ্যতা নিয়ে আজ সকালেই আমরা ঘোরতর আলোচনা করেচি, এখন তার গর্ভে পদার্পণ ক'রে তার চেহারা দেখেই চম্‌কে উঠতে হোলো।

এই সূচীভেদ্য যবনিকা ভেদ ক'রে আজ বাড়ী পৌছতে [illegible]রব তো?

কল্পনাকে বল্লাম: "আমার হাত ধরো, নইলে হারিয়ে যাবে।"

কল্পনার হাত আমার বাহুর আশ্রয় নেয়, এবং বলতে কি, নি[illegible] হয়ে হলেও আমার বেশ ভালোই লাগে।...আমি কল্পনাকে, মানে, কল্পনা[illegible] সেই

ভ্যাংশকে বগলদাবা ক'[illegible]র্পণে পা বাড়াই, [illegible] ধারে, ঠিক্ যে কোনখানে, পা দিয়ে হাতড়াতে থাকি।

"উঃ, কী অন্ধকার!" কল্পনা দম নিয়ে বলে: "ভারী বিচ্ছিরি!"

সিনেমার গহ্বর থেকে বার হবার তোড়ে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছল—ক্ষণেকের জন্যেই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের মধ্যেই চারিধারের এই আঁধার আরো ধারালো, আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল নাকি? অনুভূতিটা, নানা দৃষ্টি-কোণ থেকে, নানান্‌ভাবে রোমন্থন করার আগেই কল্পনা আমার বগলে ফিরে এসেছে। ভালো ক'রে হারাবার আগেই আবার আমরা পরস্পরের করতলগত কুক্ষিগত হয়ে পড়েচি।

এবং সেজন্যে তেমন দুঃখিত কি?

ব্ল্যাক্-আউটের অবশ্যম্ভাবী সুযোগটা, মাধুর্য্য-কণ্টকিত সম্ভাবনাটা নিতান্তই মাঠে মারা গেল না তো?

পেয়ে হারাবার এবং হারিয়ে পাবার এই ফাঁকতালে, কল্পনার বদলে, আর একটি মেয়ে, (কল্পনার মতই সুন্দর আর মিষ্টি, কল্পনা করা যাক্ না!) অপর একটি মেয়ে হস্তগত হয়ে এলে নেহাৎ মন্দ হোতো কি?

যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলি। না, ঠিক ও-কথাটা বলি না। বলি: "কতক্ষণ আর! এও সয়ে আসবে। সয়ে যাবে ক্রমশই!"

কিন্তু ওর মধ্যেও অনুশোচনার সুর বেজে ওঠে—ঘোরালো একটা প্যাঁচ যেন থেকে যায়। "মানে, অন্ধকারটা আস্তে-আস্তে আমাদের চোখে স'য়ে যাবে। সেই কথাই বল্‌ছি।" অন্ধকারকে পরিষ্কার ক'রে দিতে হয়।

এবং অন্ধকারের অরণ্য ভেদ করে' আমরা দুজনে দুঃসাহসের দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ি।

"[illegible]—!" অকস্মাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠি: "চারধারেই জল যে! এবার [illegible] ছেঁ:পকতে হয়!"

"[illegible]? কি বল্‌ছ? গঙ্গায় এসে পড়্‌লাম নাকি?" কল্পনাও আঁৎকে ও[illegible]

"প্রায় ... বইকি" ! জলমগ্ন পা-টাকে ফুটপাথের উপকূলে টেনে তুলি : "কুলকলধ্বনি শুনছ না ? এখন সাঁৎরে পার হতে হবে।"

ইতস্ততঃ-প্রজ্জ্বলিত জোনাকি পোকার আলোয় যতদূর দৃষ্টি চলে, চারিধার জলে জলাকার। এই ব্ল্যাক্-আউটের অজুহাতে, রসিকতা করে' রাস্তার মোলাটে জলের উৎস-মুখটা কে-মজাদার খুলে রেখে চ'লে গেছেন, (সমস্ত কলকাতাকেই জলাঞ্জলি দেবার মৎলবে কিনা কে জানে!) তাইতেই এই কলোচ্ছ্বাসিত জলাতিশয্য !

"তাহলে কি হবে ?" কল্পনা আর পা বাড়ায় না।

"কী আবার হবে! যুগে যুগে গন্ধমাদন কারা বহন করে' এসেছে ? চ'লে এসো।"

"উঁহু।" আমার সাদর অভ্যর্থনার বিজ্ঞাপনেও ও অবিচলিত।

"তাহলে সারারাত এইখানে দাঁড়িয়ে থাকা যাক্! সেই ভালো।"

"এই দ্বীপে ?"

"দ্বীপে!" আমার বিস্ময়াক্ত কণ্ঠ থেকে প্রতিধ্বনি হয়।

"বাঃ, দ্বীপ কাকে বলে তাও জানো না ?"

"জানি বইকি। দ্বীপ হচ্ছে, ফুটপাথের অংশবিশেষ, এমন একটি স্থলখণ্ড যা চারিধারে জলবেষ্টিত হয়েও সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করছে। তাই না-কি ?"

"হয়তো এটা ব-দ্বীপও হতে পারে।" কল্পনা নিজেকে ফাঁপিয়ে তোলে।

"তাও হতে পারে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে রাতারাতি যেসব দ্বীপ গজিয়ে ওঠে তার একটা হওয়াও বিচিত্র না! খুব অসম্ভব নয়।" আমিও কল্পনার রাশ ছেড়ে দিই। রাশ ছেড়ে দেয়া খুব শক্তও ছিল না। এই সুপরিচিত সহরতলীও অন্ধকারের অপরিচয়-সূত্রে এমন অবাস্তব আর রহস্যময় হয়ে উঠছিল যে এহেন জগতে এই মুহূর্ত্তে সব কিছু সম্ভব বলে' বোধ হচ্ছিল।

"আচ্ছা, এই রকম একটা দ্বীপে উৎক্ষিপ্ত হবার বাসনা তুমি মনে মনে কখনো পোষণ করোনি, ঠিক করে' বলো ?"

"কক্খনো না।" কল্পনার সুদৃঢ় কণ্ঠ : "আমার ভারী ঠাণ্ডা লাগ... । আমি বাড়ী যেতে চাই।"

ঠাণ্ডা লাগার অপরাধ কি ? সাড়ে এগারোটায় সিনেমা ভেঙে...—

এমনিতেই তো অর্দ্ধেক ...। তার ওপরে অন্ধ ... এই নির্জ্জনতা মানুষের পাঁজরার ভেতরে ঢুকে হাড় কাঁপিয়ে দ্যায়।'

"বাড়ী যেতে চাইবে, সে আর আশ্চর্য্য কি ?" আমি ওকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করি : "যারাই কিনা মরুদ্বীপে উৎক্ষিপ্ত হয় তারাই বাড়ী ফিরে যেতে চায়। কিন্তু কদিন আর ? অভ্যাস হয়ে যেতে আর কদিন ? প্রথম প্রথম ওই রকম—তারপর আর কিছুতেই তাদের সেখান থেকে—সেই মরুদ্বীপের স্বর্গোদ্যান থেকে ছাড়ানো যায় না। মেরে ধরে'ও না। রবিন্সন্ ক্রুসো পড়েচ তো ?"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস", কল্পনা বলে, "তুমি একটা খ্যাপা।"

"কেন, এমন হতে পারে না কি ?—" আমি ওকে বোঝাতে চাই : "মিরাক্‌ল কি ঘটে না পৃথিবীতে ?—"

বাস্তবিক, যেখানে চিরকাল এত আলোক-ঝলমলানি দেখে এসেছি, চাঁদের আলোটুকুও যে পথে কদাচ পড়তে পায়নি, যেখানে কোনোদিন অন্ধকার দেখব এমন প্রত্যাশা ছিল না, সেখানে এই বিপুল—অদ্ভুত—অপরূপ অন্ধকার, এই অপরিমেয় রহস্যঘনতা, যে আপনা থেকেই যত অসম্ভব কল্পনা মনের বল্গামুক্ত হয়ে এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি লাগিয়ে দ্যায়।

"...মিরাক্‌ল্ কি ঘটে না পৃথিবীতে ?..." আমি বলে' চলি : "এইমাত্র সিনেমার এক অবাস্তব জগত থেকে আমরা উঠে এসেছি ; আবার সেই আমাদের পুরনো পরিচিত পচা একঘেয়ে জীবনে ফিরে যাবার অভিপ্রায় নিয়ে ; কিন্তু এর মধ্যে কী এক অঘটন ঘটে' গেছে, না জানি কী যাদুবলে কলকাতার মায়া কাটিয়ে কোন্ এক সুদূর আদিম দ্বীপের উপকূলে আমরা উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়েচি—যেখানে সভ্যতা নেই, অশান্তি নেই, যুদ্ধবিগ্রহ-মারামারি-কাটাকাটি নেই, নিত্য নবযুগ, নিত্য নব হুজুগ নেই—কেবল চারিধারে নীলাম্বুরাশি আর তালীবন আর—আর—।...কেন, এমন হতে পারে নাকি ?'

"তুমি একটা খ্যাপা।" কল্পনার কণ্ঠে সু-প্রাচীন ঘোষণা। পুরাতন ...বৃত্তি।

"এটা কি একটা কথা হোলো ?" ক্ষীণ আপত্তি আমার।

"তুমি আস্ত একটা—।" কথাটা সম্পূর্ণ না ক'রেই, আমার কবল ...

থেকে সবলে [illegible] ছাড়িয়ে নেয় : "আমি বাড়ী যেতে চাই।" সে বলে।

"যাবে বই কি! নিশ্চয়ই যাবে।" আমি ওকে ভরসা দিই : "যথাসময়েই যেতে পাবে। আশ-পাশ দিয়ে একটা জাহাজ গেলেই হোলো! আর জাহাজরা গিয়েই থাকে, কালে ভদ্রেই যায়। তখন আগুন জ্বেলে নিশানা দাও কিম্বা তোমার পাঞ্জাবী খুলে ওড়াও! ছাখো, ছাখো, কী একটা আসছে যেন!—"

রক্তচক্ষু অতিকায় কী একটা, ভোঁস্‌ভোঁস্ গর্জ্জনে, দারুণ আওয়াজ ছেড়ে, বঙ্কিম দৃষ্টিতে আমাদের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই, তীর বেগে অন্ধকারের মধ্যে তিরোহিত হয়ে গেল।

"বাস্ গেল না?" কল্পনা আর্ত্তনাদ করে' উঠল : "বাজে বক্‌বক্ করে' বাস্‌খানা হারালুম! বাস্‌খানা থামালে কাজ দিত। থামালে না কেন?"

"কি করে' থামাব?" আমি বিস্মিত হই : "পাঞ্জাবী খুলে ওড়ানো এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া, সময় পেলাম কই? আর এই ব্ল্যাক আউটে, আগুন জ্বালালে, বুঝতেই তো পারছ, পাক্কা ছ' মাস!—"

"পরের বাস্ আস্‌তে আবার সেই আধ ঘণ্টা!" কল্পনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে : "আর আস্‌বেই কিনা কে জানে!"

"নাই বা এলো!" আমি ওকে সান্ত্বনা দিই : "মরুদ্বীপে সময় হু হু করে' কেটে যায়। টেরই পাওয়া যায় না। আর এমন আরামেই কাটে! এমন কি, সেখানে বসে' এক আধটু রোমান্সও করা যায় না যে তা নয়!"

"ছবিতে দেখেছি বটে।" কল্পনা শুষ্ক কণ্ঠে বলে।

"দেখলেই বা, রোমান্সে কোনো দোষ নেই", আমি ওকে বুঝিয়ে দিই : "আর তাছাড়া রোমান্স করতে হলে মরুদ্বীপে নিক্ষিপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তারও কোনো মানে হয় না। যখনই সুযোগ পাবে—বাগিয়ে নাও। রোমান্সের চুলের টিকি পাকড়ে ধরো। অনেক বছর আগে, এমন একটা চমৎকার অন্ধকার রাত পেলে তুমি কী উচ্ছ্বসিতই না হতে!—"

"অনেক বছর আগে, তার মানে?" কল্পনা প্রতিবাদ করে।

"না, তত বেশী বছর আগে নয়।" আমি ক্ষতিপূরণ ক'রে দিই : "[illegible], তোমার গলার সুরে তো বোধ হচ্ছে যেন এই সেদিনের কথা! মনে [illegible],

সেই তুমি, সেই প্রথমবয়সী তুমি, অনেক বছর—অল্প কিছুদিন আগের সেই তুমিই!—"

ওর গলার রেশ আমার কানে এসে লাগে; বেশ লাগে। নিজের স্ত্রীকে কেমন যেন পরস্ত্রী ব'লে মনে হয়।

"—এখনো তুমি ঢের কাঁচা, ঢের কচি। এখনো তোমাকে নিয়ে রোমান্স করা চলে।…" আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলি। আমার আত্মপরভেদ লোপ পায়,—নিজের স্ত্রীর প্রতি কেমন একটা অদ্ভুত টান অনুভব করি—কেমন যেন পরস্ত্রীকাতরের মতো হয়ে পড়ি ক্রমশঃ।

"…এমন চমৎকার রাত…এমন সুমধুর অন্ধকার…তুমি আর আমি এত পাশাপাশি…"

নিজের গলা শুনে নিজেই বিগলিত হয়ে যাই। আমার ভেতরে এত মাধুর্য্য আছে জান্‌তাম না তো! এমন মধুর কণ্ঠ যে অদূর অতীতেও শোনা যায়নি কখনো!

"…এসো, আরো কাছে এসো। আমায় একটা চুমু দাও!" এই বলে' কস্তুরীমৃগসম আপনগন্ধের বিভোরতায়, তাকে কাছে টেনে একটা চুমু খেয়ে দিই।

এবং সঙ্গে সঙ্গে, প্রেয়সী, এক চড় কসিয়ে ছান্! বেশ মজবুৎ এক চড়!

"কী সাহস তোমার!" কল্পনা হাঁপায়। "কতদূর আস্পর্দ্ধা!"

"বা রে, নিজের বৌকে যদি চুমু খেতে না পাবো," আহত গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলি : "তাহলে কার বৌকে আবার চুমু খেতে যাবো, শুনি?"

"অ্যাঁ? তার ওপরে আবার বউ আছে? বিবাহিত?" কল্পনা ফোঁপাতে থাকে : "আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার।"

এই বলে' কল্পনা, আর একটি কথাও না বলে' অশ্রুপ্লুত লোচনে, মরুদ্বীপ পরিত্যাগ করে' জলে নেমে পড়্‌ল এবং টল্‌তে টল্‌তে জলাশয় পার হয়ে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

বাড়ীর দোর গোড়াতেই কল্পনার সঙ্গে দেখা।

"উঃ! আজ খুব একটা ফাঁড়া গ্যাছে!" কল্পনা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে : "বাড়ি, ভিতরে চলো।"

"ফাড়া—— বল্লে কি ?"

"যখন ছবি দেখে আমরা বেরুলুম, তুমি বল্লে না যে, আমার হাত ধরো,—তোমার মনে আছে ?"

"আছে বইকি !" আমাকে স্বীকার করতে হয়।

"আমি ধরেও ছিলাম, কিন্তু অন্ধকারে প্রত্যেক হাতই প্রায় এক রকম। আমি তোমার হাত মনে করে' আরেক জনের—লোকটা কিন্তু ভারী রোমান্টিক ! ভয়ঙ্কর রকম। বিয়ের আগে তুমি যেমনটা ছিলে অনেকটা তেমনি আরকি !"

"বুঝেছি, এই ব্ল্যাক্-আউটের সুযোগে বেহাত হয়ে—" আমি কঠোর ভাষায় ব্যক্ত করি : "তুমি বেশ একটু পরস্মৈপদী ফুর্ত্তি লুটে নিয়েচ।·· ভালো করোনি।···ছিঃ !"

"বাঃ, আমি কি করে' জান্‌ব ? আমি ভেবেছিলাম, তুমিই। অনেকটা তোমার মতই গলা। যতক্ষণ না লোকটা আমার চুমু খেল আমি সন্দেহই করতে পারিনি। তারপরই তো আমি টের পেলুম যে তুমি নয়। তুমি কখনো চুমু খাবার কথা ভাবতেই পারো না ! নিজের বউকে কেউ চুমু খায় ?···"

ফলে ব...

THE SARADA CHARAN ARYAN INSTITUTION
LIBRARY
&
READING ROOM
CALCUTTA

ওটীন ক্রীম

নিদ্রাবস্থায় আপনার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

ওটীন ক্রীম

সেই সৌন্দর্য্য সারাদিন অক্ষুণ্ণ রাখে।

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের সুন্দরী ও প্রসিদ্ধা তারকা

লীলা দেশাই

লিখিতেছেন :—

I always use Oatine Cream before retiring. It is so pleasant and soothing and cleanses my skin from anything left by dust or make up. I recommend it to all my friends.

Jany. 28th 1939.

Oatine CREAM for nightly massage
SNOW for daily protection

THE SARADA CHARAN ARYAN INSTITUTION
LIBRARY & READING ROOM
CALCUTTA

অসময়ে

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমার বাগানে ফুল নাই আর কি দিব তোমার হাতে,
হয়ত ফাগুন এসেছে কোথাও, তাই তুমি আজ এলে,
কুসুমমাসের মরস্থমি হাওয়া ঝড় হয়ে এল রাতে—
ঝরা মালতীর বেদনার গান হেলায় সে গেছে ফেলে।

কাল রাত্রের সে ঝড়ে আমার ফুল-ফুটিবার আশা
নির্ম্মূল হয়ে ঝরিয়া পড়েছে কঠিন মাটির পরে,
সেই সে মাটির অভিমান বুঝি রাখিল সর্ব্বনাশা
ফণিমনসার গূঢ় অভিশাপ কাঁটায় কাঁটায় ভরে'।

বন-জ্যোৎস্নার আলোক-আঁধারে হারান স্বপন মাখা
নব কিশলয়ে নয়ন মেলিল ফুলের সম্ভাবনা,
মন-বিহঙ্গ আকাশের গায় মেলিল রঙীন পাখা
সে দিনে তুমি যে আসিবে না হেন ছিল না দুর্ভাবনা।

আজ তুমি এলে মনের বনের সন্ধ্যা-সরসী তীরে
মরা জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর গায়ে ধূসর নিরাশা জাগে,
দূরে কোথা যেন গন্ধ-বিধুর বেদনা ঘনায় ধীরে
তারি সকরুণ আমেজ বুঝি বা চামেলির গায়ে লাগে।

মুখপানে কেন চেয়ে আছ সখী, চিনিতে পারনা মোরে ?
আঁখি হতে বুঝি মোছেনি এখনো গোধূলির ম্লান ছায়া,
স্মৃতি-বলাকার ঝরা পালকের মধুর স্বপন ঘোরে
আপনার মাঝে ঘনায়ে তুলিছ বুঝি মহুয়ার মায়া।

আমার বাগানে একদা যখন ফুলের জোয়ার ছিল,
নানান রঙের আশায় রঙীন গন্ধ-বিভুল বনে,
তুমি কোথা ছিলে উদাসিনী মোর, আজি কে খবর দিল,
গত বসন্তে ফুল-উৎসব বসেছিল মোর মনে।

বাসন্তিকার কণ্ঠের মালা ম্লান হয়ে ঝরে যায়,
বসন্তে যদি ফুল না ফুটিল কি দিয়ে গাঁথিব মালা,
মাধবীর বনে আজি ক্ষণে ক্ষণে কী বেদনা গুমরায়,
বকুল-গন্ধে অন্ধ রাতের বাড়িছে বিরহ-জ্বালা।

চতুর্দশপদী

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

রণক্ষেত্রে

সন্ধ্যার হিরণ্য গর্ভে ডোবে যদি বিপুল পৃথিবী,
তমসার অন্তরালে ভাবি আর ফিরিবে না তুমি ;
স্বর্ণভারে পরিব্যাপ্ত চক্রবাল ছিঁড়ে দেবে নীবি ;
হতজাত ক্লীব দেহে বয়ে যাবে কান্নার মৌসুমী।
সুবিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে মিলিবে না বাহুর বন্ধন ;
শেষ হয়ে গেল বুঝি যুগলের পথে আনাগোনা ;
ধ্বংসের এ স্তূপে বসে অনর্থক আমার ক্রন্দন,
পৃথিবীর শেষপ্রান্তে স্মৃতির এ কল্পজাল বোনা।

তবু এই পরিহাস : ইতিহাস ভাঙে আর গড়ে।
খুঁজে ফিরি পুনরায় সমন্বয়, ব্যক্তি ও সমাজ।
বিপুল পৃথিবী আর নৈরবধি কাল চিরতরে
যাবে না কখনো ফেলে এ মোহিনী রুকলাস সাজ।
তাই ভাবি যদি আস পার হয়ে বিষম দুর্গতি,
ক্ষমা তবে আরবার পৃথিবীর মুছে দেবে ক্ষতি।

ভগ্নদূত

অবশেষে ভগ্নদূত ; নগরেতে করি কথকতা।
যুদ্ধের প্রাঙ্গণে শেষ শতাব্দীর রক্তের শোণিমা।
ভবিষ্যত অন্ধকার ; দেখে যাই অলস শঠতা,
অনাচার চতুর্দিকে ; ভেদ করে যার যত সীমা।
কেবা কার কথা শোনে—সমাধির আছে উজ্জীবন।
নির্বেদ হৃদয়ে ফিরি মোর গৃহে প্রত্যেক সন্ধ্যায়।
অতীতের বীরগাথা কল্পলোকে তবু ভরে মন।
মৎস্যের ভঙ্গিমা দেখি সাঙ্কেতিক আলোর শিখায়।

নীরব আমার গৃহে অন্য কোনো রণক্ষেত্রে শোভে ;
মুছে যাবে গ্লানি যেথা, বারে বারে হেন পরাজয় ;
যেথায় রয়েছে বাকী হতাহত,—নিদারুণ ক্ষোভে
বিদীর্ণ ভূগর্ভ হতে সমুত্থিত সৈনিকের ভয়।
আর ভাবি শেষ কোথা পৃথিবীর প্রবাহ রক্তের !
প্রাণের প্রতীক বুঝি রণক্ষেত্রে, এই জীবনের।

শেষ বসন্ত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

জীবনের শ্রীহীনতা ঘুরে ফিরে রোজ মনে পড়ে।
বারান্দার টবে আসে বসন্তের রঙ—
দিগন্তপ্লাবিত মাঠে সূর্য্য ওঠে, পাতা ঝরে নিরালা প্রান্তরে,
ছিন্নভিন্ন এ পৃথিবী আজিও বজায় রাখে পুরাতন ঢঙ।

নিথর আকাশ-ভালে জ্বলে কার আরক্ত ভ্রুকুটি
ত্রাসে কাঁপে কণ্টকিত কাল,
সতর্কতা অবিরাম, তবু যেন অগোচরে রয়ে গেলো ত্রুটি—
তারকাঁটা চারিদিকে, বিপদের গূঢ় বেড়াজাল।

তবে শোনো, বলি সোজাসুজি—
বর্দ্ধমান অসন্তোষে ছাখো চেয়ে ধারালো বাতাস,
কারো পৌষমাস আর কারো সর্ব্বনাশ
অনায়াসে এইটুকু বুঝি।

রূপালী জ্যোৎস্নার ধারা আজো রাতে এই পৃথিবীতে
সুতীক্ষ্ণ হুইস্‌ল্ শুনি, ট্রেনের ছায়ায়
বিনিদ্র মৃত্যুকে যেন টের পাওয়া যায়—
সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধে রূপ পায় প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায়।

শিল্পী : যামিনী রায় চিত্রকরের সৌজন্যে

চিঠির কথা

লীলাময় রায়

চিঠি পেতে আমার এখনো ভালো লাগে, কিন্তু লিখতে ?

লিখতে ভালো লাগে না বললে বাড়িয়ে বলা হয়, অথচ ভালো না লাগে বলতেও বাধে। অনেক দিন থেকে শরীরে এক প্রকার ক্লান্তি বোধ করে আসছি, বোধ হয় দোষটা তার। অথবা মনের, কেননা মনেও এক প্রকার নির্লিপ্ত ভাব। এমন হুজুগ বেশী নেই যা আমাকে উস্‌কে দিতে পারে। আর সমস্যা যা আছে তা যত সোজা ভেবেছিলুম তত নয়, সমাধান শোনাতে যাওয়া ছেলেমানুষী। এই ধরুন হিন্দু মুসলিম সমস্যা। এককালে এর জন্যে যত রক্ত ক্ষয় করেছি তা প্রায় রক্তপাতের সমান, সে সব চিন্তা চিতার মতো আমাকেই জ্বালিয়েছে, আর আমার প্রবন্ধ পড়ে পক্ষপাতী পাঠক পাঠিকারা জানিয়েছেন, "এর চেয়ে একটা গল্প লিখলে পড়ে তৃপ্তি হতো।"

দেহ মনের এই অবস্থায় চিঠি লিখতেও উৎসাহ পাইনে। অবশ্য যে চিঠি সরকারী বা দরকারী তার জবাব দিতে হবে, তার বাঁধা ভাষা আছে। লিখতে কষ্ট যেটুকু হয় সেটকু মানসিক নয়, শারীরিক।

কিন্তু যেসব চিঠি নেহাৎ অ-দরকারী তাদের বেলায় আমার হাতের চেয়ে মাথার ঝঞ্ঝাট বেশী। একদা আমি অকাতরে চিঠির বুদ্বুদ উড়িয়েছি, ছেলেরা যেমন সাবানের ফেনার বুদ্বুদ ওড়ায়। তখনকার দিনে সব বিষয়েই আমার একটা তৈরি মত ছিল। আইনস্টাইন থেকে সুরু করে গ্রেটা গার্বো পর্য্যন্ত যে কোনো মানুষের সম্বন্ধে, তত্ত্বের সম্বন্ধে, তথ্যের সম্বন্ধে দু' কথা লিখতে ভীত হতুম না, গায়ের জোরে তর্ক করতুম ও কলমের জোরে কাগজ কালো করতুম। ধৈর্য্যও ছিল অসীম, কেউ যদি না বুঝত আমি চিঠির পর চিঠি লিখে বোঝাতুম। সে সব দিন গেছে।

এখন যে আমার তর্কের ঝোঁক নেই তা নয়। মত জাহির করার রোগও আছে। সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে বারো বছর পরে দেখা হলো, যতক্ষণ একত্র ছিলুম দু'জনে তুমুল বকেছি, কেউ কাউকে ভজাতে পারিনি, সেই তো দুঃখ। কিন্তু শতং বদ মা লিখ। সেই বন্ধু যদি চিঠি লিখতেন আমার অন্য রূপ দেখতেন। কেননা এই বারো বছরে আমি যেমন লিখতে শিখেছি তেমনি না-লিখতেও শিখেছি।

আমার কোনো কোনো চিঠি বন্ধু জনের নির্ব্বন্ধে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর থেকে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে চিঠিরও সাহিত্যিক মূল্য থাকতে পারে। তেমনি ভয়ও হয়েছে যে আমার যেসব চিঠি ছাপবার মতো করে লেখা নয়, ফুর্ত্তি করে লেখা, সেসব চিঠিও এক দিন ছাপার হরফে উঠতে পারে। এখন চিঠি লিখতে বসলে অমনি সতর্ক হই, পাছে এমন কিছু লিখি যা ছাপার হরফে ধরা পড়লে আমাকেশুদ্ধ ধরা পড়িয়ে দেবে। পাঠকরা ভাববেন, "কই, এঁর বই পড়ে যেমন মনে হয় চিঠি পড়ে তো তেমন হয় না!" এতদিনের সাধনায় আমার যে সাহিত্যিক রূপটি দেশের পাঠকদের চোখে পরিচিত হয়ে এসেছে একখানি চিঠি তাকে একদিনেই ধূলিসাৎ করতে পারে। অতএব শতং বদ, মা লিখ।

তার পর সাহিত্যরচনার একটি উৎকর্ষমান আছে, সেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবার একটা প্রয়াস আছে, সে প্রয়াস তো চিঠির বেলায় স্থগিত রাখতে পারিনে। দরকারী বা সরকারী চিঠি হলে অন্য কথা, কিন্তু যে চিঠি কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা তা সাহিত্যের স্বজাতি, কেননা সাহিত্যেও কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা। তফাৎ শুধু এই যে চিঠি লেখার একটা নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ আছে, সাহিত্যের তা নেই। অর্থাৎ প্রবন্ধ বা গল্প এক মাস পরে লিখলেও চলে, চিঠি ফেলে রাখলে চলে না। পত্রলেখকরা পত্রপাঠ উত্তর প্রত্যাশা করেন। আমি এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাইনে, এ সমস্যা হিন্দু মুসলিম সমস্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। যদি রবীন্দ্রনাথ হতুম তবে যাই লিখতুম তাই হতো উৎকৃষ্ট, কিন্তু আজ যা লিখি কাল তা পছন্দ হয় না। সেইজন্যে আমার চিঠি যেদিন লেখা হয় সেদিন ডাকে না গেলে পরদিন ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে যায়। যাঁরা আমার চিঠি পান তাঁরা জানেন না যে, হয় ও চিঠি কোনো মতে ডাকঘরে গিয়ে জান বাঁচিয়েছে নয় ওর বহু জন্ম অতীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে চিঠি হয়ত আমার মনের মতো হয়নি। কী করি, একেবারে জবাব না দিয়ে তো পারিনে।

ফল হয়েছে এই যে আমাকে চিঠি লিখলে আমি তিন মাস থেকে তিন বছর পর্য্যন্ত নিরুত্তর থাকি। এটার মূল কারণ কুঁড়েমি, কিন্তু সেই একমাত্র কারণ নয়। চিঠির যদি সাহিত্যিক মূল্য থাকে আর চিঠিতে যদি কেউ সাহিত্যের স্বাদ আশা করেন তবে তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে, উপায় নেই।

দরকারী কাজ থাকলে জবাব লেখা দরকারের নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু যেখানে দরকারটা কাজের নয়, ভাবের, সেখানে মনোভাবের মর্জির উপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই। ভাবুকের চিঠি ভাবের অপেক্ষা রাখে, ভাব যদি তিন মাস আগে না আসে তবে ভাবের অভাব কি ভাষা দিয়ে পূরণ করা যায়? কিম্বা মামুলি কুশলসম্ভাষণ দিয়ে?

তাই আমার চিঠিতে প্রায়ই দেখা যায়, "উত্তর দিতে দেরি হলো বলে লজ্জিত।" দেরি না হলেও লজ্জার কারণ হতো, সে লজ্জা পত্রপাঠকের কাছে না হোক নিত্য কালের পাঠকের কাছে। কে জানে কোন চিঠির দৌড় কতদূর! কোন চিঠি কবে ছাপা হবে, কাঁর চোখে পড়বে! এমন করে লেখাই শ্রেয়ঃ যাতে লেখার দিক থেকে ত্রুটি নেই, যা রসের তুলিকায় লেখা। তার জন্যে যদি তিন বছর দেরি হয়ে যায় তবে নাচার।

কিন্তু সামাজিক মানুষের লোকভয় আছে। যিনি চিঠি লিখেছেন তিনি কেন মার্জনা করবেন? তাঁর আত্মসম্মান আছে। সসীম সময়ের মধ্যে উত্তর না পেলে তিনি ধরে নেবেন যে লোকটা ভদ্রলোক নয়, চিঠি লিখলে চিঠির জবাব দেয় না। সেই ভয়ে যা হোক একটা কিছু লিখে দিতে হয়। নইলে চিঠির পাহাড় নিয়ে আমি করি কী! এইতো ইতিমধ্যে একটি স্তূপ জড় হয়েছে। একদিন বসে যত পারি লিখব ও ছিঁড়ব, অন্ততঃ জনকয়েকের কাছে ভদ্রতা বজায় থাকবে।

লিখব, "উত্তর দিতে দেরি হলো বলে মনে কিছু করবেন না।" লিখব, "আপনার চিঠি অনেকদিন আগে পেয়েছি, কিন্তু আমার শরীর মন ভালো ছিল না।" মিথ্যা নয়। তবু সত্যও নয়। সত্য হচ্ছে এই যে শিল্পী মন সজাগ থাকে না সব দিন, যে দিন জাগে সে দিন হয়ত তিন মাস বিলম্ব হয়ে গেছে। সে মন ভদ্রলোকের মন নয়, তাই ভদ্রলোক তার জন্যে লজ্জিত।

হাঁ, চিঠি পেতে আমার এখনো ভালো লাগে, মনের সঙ্গে মনে ছোঁয়াছুঁয়ি এখনো মধুর। এমন কি, ঠোকাঠুকিও আমার মন্দ লাগে না। আমি মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত হতে দিইনে। কিন্তু চিঠি লিখতে বসলে আমি হয় ভদ্রলোক, নয় ভাবুক। ধরাছোঁয়া দিতে সাহস হয় না, ফুর্ত্তি করে লেখা বন্ধ। এরজন্যে দায়ী আমার সাহিত্যিক খ্যাতি, এ হচ্ছে খ্যাতির খেসারৎ। ছাপাখানার ভয়ে আমি আড়ষ্ট।

ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা

অজিত দত্ত

ছবি : শম্ভু সাহা

এইমাত্র ঘুরে' এলাম টোকিও, কিয়োটো, য়োকোহামা শহর। তারপর ভোল্গা নদী পাড়ি দিয়ে মস্কৌ, লেনিনগ্রাড্-এর উপর দিয়ে, ইস্তাম্বুল শহর ঘুরে', বোগদাদ, বোখারা, সমরকন্দ দেখে, মোম্বাসার বন্দর পেরিয়ে একেবারে রাসবিহারী এভিনিউ-এর তিনতলায়। দেখলাম মিশর, মিসিসিপি, মিনেসোটা; আল্পস্ পাহাড় পেরিয়ে গেলাম লিস্‌বন, পেরুলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা; এমনি আমার ভ্রমণের নেশা। যাকে বলে মহা-ভবঘুরেত্বর পথে। কিন্তু কেউ যদি আজ, কিংবা যে-কোনো দিন, সন্ধ্যায়, কিংবা যে কোনো সময়ে, আমাকে এসে বলে 'চলো সিনেমা দেখে' আসি,' তাহলে আমি কেবল পাশ ফিরে শোবো।

তার কারণ ঘুরে বেড়াতেই আমার ভালো লাগে, আর নিশ্চিন্ত আরামে হাত পা ছড়িয়ে না শুলে আমার ঘোরাই হয় না। ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে না হওয়ার এ-একটা মস্ত সুবিধা, এবং এ-সুবিধার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারই আমি করে' থাকি।

ভ্রমণ কাহিনী জিনিষটা অবশ্য খুব ভালোই, এবং শুনেছি উপযুক্ত পরিমাণ কল্পনাশক্তি খাটাতে পারলে নাকি কাটেও খুব। কিন্তু তার ভূমিকা বড়ই ভয়াবহ। মনে করুন কোনো এক বিখ্যাত লেখকের কাছে, কোনো এক বিখ্যাত প্রকাশকের কাছ থেকে একখানি বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী লেখবার ফরমাস এসেছে; সামনেই বিখ্যাত লেখকের বড়দিনের ছুটি। বিখ্যাত লেখক একদিন স্থির করলেন কল্‌কাতার বাইরে যাবেন। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, বন্ধু বান্ধবদের স্ত্রীদের কাছে, আত্মীয় ও আত্মীয়াদের কাছে এবং অনাত্মীয় ও অর্ধপরিচিতদের কাছে সগর্বে এবং সস্মিত মুখে বলে বেড়ালেন 'কদিনের জন্য বাইরে যাবো ভাবছি'। উদ্দেশ্য সকলকে যথাসম্ভব ঈর্ষ্যান্বিত করা। কিন্তু সকালে বন্ধু বান্ধবরা যখনো এসে পৌছোয় না, এবং রাত্রে

বন্ধুবান্ধবরা যখন চলে যায়, তখন বাড়িতে বিখ্যাত লেখক এবং তাঁর স্ত্রী গালে হাত দিয়ে বসেন যাকে বলে 'ভয়াবহ ভবিষ্যৎ'-এর চিন্তায় শঙ্কাকুল। ট্রেইনে ছোটো মেয়েটার দুধ গরম করার কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং চারটে বাক্স, তিনটে বিছানা, দুটো ধামা, একটা কুঁজো, এবং ন'খানা আনুষঙ্গিক খুচরো মোট নিয়ে কি উপায়ে আসানসোলে গাড়ি বদল করা যেতে পারে, এসব চিন্তা পরলোকের চিন্তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ।

পরকালের চিন্তার চেয়ে ভয়াবহ

তার উপর বিদেশের বিজাতীয় হালচাল এবং বিখ্যাত লেখকের আসাধারণ হিন্দি জ্ঞানের সমন্বয়ে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে রোমাঞ্চিত না হওয়াই অস্বাভাবিক। আমরা যথারীতি রোমাঞ্চিত হয়ে বলি 'সত্যি তুমি কী ভাগ্যবান্, কত ঘুরবে!' যেন ইঞ্জিনের চাকা হওয়াটাই মানব জীবনের চরম ও পরম পরিণতি হওয়া উচিত।

আমার ছেলেবেলা থেকেই একটা বদ্ধমূল ধারণা যে যারা ঘোরে তাদের ঘোরা হয় না, যারা বেড়িয়ে বেড়ায়—বেড়ানোর মর্ম তারা জানেনি। বড় বড় ট্রেইন্ ভ্রমণ করে' যাদের অভ্যাস ড্রয়িং রুমের প্রতি আকর্ষণ তাদের অসাধারণ। দু'পাশের জলে ডোবা ধানের ক্ষেতের একটু দূরে ব্যাঁকা-চোরা ডোবাটার আর্দ্ধক পানায় ঢাকা টলটলে জলের এক পাশটিতে যে দুধবরণ বকটা এক ঠ্যাং তুলে' চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে, খোঁজ নিয়ে জান্‌বেন, ওটা ওঁদের চোখেই পড়ে নি; আবার শীতে, শুক্‌নো মাঠে কাটা ধানের হল্‌দে আঁটির সারি—আর ভূতের কালো মাথার মত হাঁড়ি বাঁধা এবড়ো-খেবড়ো খেঁজুর গাছ, একটা এখানে একটা সেখানে—মোটেই ছবির মতো সাজানো নয়, বরং ছবি আঁক্‌বার মতো—সেই দেখাটি তাদের মনে হারিয়ে গেছে। আমি অনেক কষ্ট করে' বছরে একখানা করে' ছবি দেখে আসি, তাই ছবি ক'খানা আমার মনে সোনার ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে থাকে, তাতে মরচে ধরে না। আমার দৌড় এই গ্রীষ্মে গিরিডি, আবার ও-ই শীতে শান্তি-নিকেতন; কোনো বার পুরী, কোনো বার বা বিক্রমপুরের জোলো জোলো দেশ—যা মনের প্রাগৈতিহাসিক মেছো জীবটিকে ডানা ধরে' নাড়া দিয়ে যায়। অনেকটা টিকি ধরে' টানার মতো। কষ্ট হয়—খুবই কষ্ট হয়, এবং বাড়ি ফিরে এতো চেঁচাই যে সবগুলো পূজো-ধুম্‌সীতে আমার কবিতার সাক্ষাৎ মেলে। এ-ও এক সাধনা আর কি! জাপানীরা চা খেতে যেমন সাধনা করে এ সেরকম সাধনা নয়, বরং রোদ্দুরে ঘেমে সতেরোজন বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নিয়ে এসে নিজের হাতে স্টোভ ধরিয়ে চা খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করার মতো।

বন্ধুবান্ধবরা আমাকে কুঁড়ে ব'লে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে। তা করুক। অন্যকে গাল দেওয়া মানেই তুলনায় নিজকে খানিকটা বড় করা কিনা! যেন কুঁড়ে হতে সকলেই পারে। বাইরের প্রকৃতি, এমনকি দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি—চোখ মেলে তাকালে যা কিছু চোখে পড়ে—তার সঙ্গে অন্তরের একটা অবিচ্ছেদ্য অনির্বচনীয় মিল না থাক্‌লে কেউ কোনোদিন কুঁড়ে হতে পেরেছে? সুরের সঙ্গে সুর যেমন ক'রে মিশে যায় তেমনিভাবে বাইরের সঙ্গে মনের মিল না হ'লে কি আর আলস্য-যাপন করা যায়? তাই আপিস থেকে ফিরে আমি হাত পা ছড়িয়ে শুই, তারপর চোখ ছেড়ে দি আকাশে—কিম্বা মেঘ, অথবা দুটো পাখী—নিদেন আমার ঘরের দেয়ালে

টিক্‌টিকিগুলোর দিকে। তখন—এবং তখনই আমি হয়ে যাই এই পৃথিবীর অংশ, লুসির মতো

Rolled round the earth's diurnal course
With rocks and stones and trees.

সে-ও এক ভ্রমণ ছাড়া আর কী? একেবারে পরিভ্রমণ, কিম্বা পরিক্রমণও বলা যায়।

তা' ছাড়া ভ্রমণ যে আমি একেবারেই করিনে তাতো নয়। এই যে রোজ ট্রামগাড়ি চড়ে চার মাইল রাস্তা পেরিয়ে আপিসে যাই, আবার চার মাইল অতিক্রম ক'রে বাড়ি ফিরি—এর ভিতরে যদি ভ্রমণের আনন্দ না থাকে তবে আমি বল্‌বো আটশো মাইল ক্রমাগত রেলগাড়ি চড়ে বেড়ানোও নিরর্থক। যে দেখতে জানে সে-ই ছাখে; হগ্ মার্কেটে যে-ফুলওয়ালা লাখো ফুলের মধ্যে বসে ফুলের নাম, ধাম এবং দাম মুখস্থ রাখে সেই কি আমার চেয়ে ফুলের মর্ম বেশি বোঝে? ট্রাম গাড়িতে বসে আমি তো একই রাস্তায় দু' হাজার বার গেছি আর এসেছি, এসেছি আর গেছি, তবু আমার দেখা কিন্তু ফুরোয় নি। এই যে বড় পার্কের পাশের স্টপ্-এ মোটা মোটা কেতাব হাতে আঁটাসাঁট-গেয়েটি জোরে জোরে পা ফেলে ট্রামে উঠেই কোনো দিকে না তাকিয়ে মহিলা মার্কা সীট্‌টা দখল করে সব চেয়ে মোটা বইটা খুল্‌লো—যেন হেড মিস্ট্রেস্ ক্লাস্ রুমে ঢুকলেন—এও যেমন ছাখবার মতো, আবার কালিঘাটে নাদুস-নুদুস বাবুটি যে অন্যকে বস্‌তে দেবার জন্য সীট থেকে রোমশ পা-টা নামাতে হোলো বলে মদনভস্মের পুনরাভিনয় করবার চেষ্টা কর্‌তে লাগলেন সেটাও কম উপভোগ্য নয়। কোনোদিন বা ওই 'লেডি' মার্কা সীটটাতেই দেখি এলো করে খোঁপা বাঁধা কলেজী তরুণী আবার কোনোদিন বা চাকুরী-গর্বিতা দো-আঁশলা মেম-সাহেব। আবার কোনো দিন ঘুমন্ত ছেলে কোলে নতুন মা'টির অবসন্ন ভঙ্গীটিও বেশ। যা-ই দেখি, দেখতে ভালোই লাগে। তারপর শহর ছেড়ে ট্রাম যখন চৌরঙ্গির মেঠো পথে পাড়ি দেয়, তখন তো আর ছবির শেষ নেই। কোনো চিত্রকর যদি ওই মাঠের কোনো এক কোণে কুটির বেঁধে থাক্‌তো, ওই মাঠের নানান্ কোণ থেকে, ওই মাঠ-বিহারী নানান্ লোক্‌কে নিয়ে সে হয়তো পঞ্চাশখানা ছবিই এঁকে ফেল্‌তো। তা' দেখে কেউ বল্‌তো না "ছোঃ ওই তো এক গড়ের মাঠের ছবি, এ আর দেখবো কি!" ক্যামেরা নিয়ে

ফোটোগ্রাফার ওই মাঠের থেকে হাজারো ছবির টুক্‌রো কুড়িয়ে আন্‌তে পারে, কেননা ওই মাঠের যে রূপ সে তো ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লায় মানুষের পদক্ষেপে। আমি হেঁটে গেলে, গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে আমাকে সুদ্ধ যে-ছবিটা চোখে পড়বে, একটু পরেই হাস্‌তে হাস্‌তে তিনটি মেয়ে যখন ঐ পথ ধরেই যায় তখন আর একটা গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেই দেখতে পাবেন বিলকুল আলাদা ছবি, যেন আরেক দেশ।

কোলে ঘুমন্ত ছেলের অবসন্ন ভঙ্গীটিও বেশ

ভাব্‌তে গেলে জীবনে কতটুকুই দেখ্‌লাম। এতবড় পৃথিবী, অথচ আমার কেন্দ্র ছেড়ে হাজার মাইল যদি গিয়েছি তো ঢের। কিন্তু আরো ভাব্‌তে গেলে কী-ই বা দেখিনি! এই গাছ পাতা আর আকাশ; এই আকাশের নীল রং যা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে একদিন ধূসর হয়ে যায়, তারপর হঠাৎ এক আশ্বিনে তাকিয়ে দেখি রাতারাতি আকাশে কে নীল রং মাখিয়ে দিয়ে গেছে, 'কঙ্কাবতী'র ভূতের মতো; এই পাখী, আর অলস মধ্যাহ্নে পাখীর ডাক; এই নদী আর সমুদ্র—কী-ই বা দেখিনি! পঁচিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ হাজার

মাইল দূরে কী আছে অপূর্ব সে ঐশ্বর্য যা আমাকে নতুন জগতে নিয়ে যাবে—যার মোহে আমি আমার এই সাম্‌নের পৃথিবীকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারি? সেখানে কি নেই, এ চাঁদ, আর সূর্য, আর তারা? কূপমণ্ডুক আমি, স্বীকার করি। কিন্তু এ কূপের জল আমার আজও পান করা শেষ হয়নি; আমার ছোটো পৃথিবীর ঐশ্বর্য আমার আজো উপভোগ করা শেষ হোলো না—এর চেয়ে বেশি হলে আর থই পাবো না।

এই রকম সঙ্কীর্ণ হচ্ছে আমার মনোভাব। সে-ই কবে ছেলেবেলায় একটি মেয়েকে ভালো লেগেছিল, পনেরো বছর তাই নিয়েই প্রেমের কবিতা লেখা চল্‌লো। এখন পর্যন্ত বন্ধুরা এ অভিযোগ করেন নি—যে যেহেতু আমি নানা জাতের নানা ছাঁদের নানা মেজাজের দুশো পঞ্চাশটা মেয়ে দেখিনি—এতগুলো প্রেমের কবিতা লেখা আমার উচিত হয়নি। উপন্যাস যাঁরা লেখেন এবং যাঁদের উপন্যাসে নারী চরিত্রের বৈচিত্র্যের কথা সর্বজনবিদিত, দাম্পত্য জীবনে তাঁরা একাগ্র নন এমন কথা কেউ বলে না। তবে আমি যদি আমার রাসবিহারী এভিনিউ-এর তিনতলায় বসে' ভ্রমণ কাহিনীও লিখি তাতেই বা এমন কী দোষ; বাংলা দেশের পাঠকেরা তো আসলে ভ্রমণ কাহিনী নামে উপন্যাসই চান। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ভ্রমণকাহিনী লিখ্‌বার জন্য কোনো প্রকাশকই আজ পর্যন্ত আমাকে ফরমাস্ করেন নি। বিখ্যাত লেখক না হওয়ার ঐটেই ক্ষতিপূরণ।

রাস্তা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বিকেলে ময়দানে জোর সভা
চলছে লোকজন দল বেঁধে
সূর্য পশ্চিমে প্রায় ডোবা
বেকার হাওয়া আহা গায় বেঁধে।
মেজেছি সারাদিন মুখ রোদে
নরম ঘাসে লাগে সুড়সুড়ি,
পেয়েছি কিছু, গেছে ধার-শোধে—
জোটায় কিঞ্চিৎ জোচ্চুরি।
হোটেলে জমকালো লাল, নীলে
তামাসা লোটে শাদা বোম্বেটে।
একদা ছিল কাজ জুট মিলে
পড়তো রোজ মদ থালি পেটে।
আজকে বানচাল নৌকা যে
চুকেছে সংসার, ভালবাসা;
উঠুক ঝড়,—মেঘ তনি ভাঁজে—
নতুন দিন, চাই নব আশা॥

গান

বীরেন্দ্রকুমার মল্লিক

মেরুপ্রান্তে রুগ্ন সূর্য্য।
আকাশের শূন্যপথে ছিন্নভিন্ন মেঘ
চ'লে যায় মন্থর নিথর পায়ে,
শীতের শিশির ঝ'রে পড়ে।
সামনের দাঁড়ে দুটো কাকাতুয়া
এতক্ষণ ব'কে-ব'কে ঘুমিয়ে পড়েছে।
স্তব্ধ রাজপথে শুধু শোনা যায়
ঘরে-ফেরা মজুরের বেসুরো, শিথিল গান,
হাড়-ভাঙা খাটুনির শেষে
তবু গান!

দু'টি কবিতা

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

স্বয়ম্বর

দূর সন্ধানী অঙ্গুলি ইঙ্গিতে
স্বর্ণ-মৃগের চিত্তে ঘনালো আশা।
বৈদেহী মন অনিকেত সঙ্গীতে
সে মায়ালোকের বিত্তে হারালো ভাষা।
হে অরুন্ধতী! তোমার আকাশে নাই
ধ্রুবের ঠিকানা, মুছে গেছে অমালোকে।
মারীচের কায়া মরীচিকা হল তাই,
স্বর্ণ-কুসুম ঝ'রে যায় মহাশোকে।
ওরে মন, ওরে বৈদেহী মন, শোনো,
পুষ্পবৃষ্টি থেমে গেছে হায় কবে।
এবার মাটিতে মুষলের ধারা গোনো,
ভরেছে আকাশ পুতি-বিগলিত শবে।
নিঃস্ব স্বপ্ন-কুবের দগ্ধ হ'ল—
অঙ্গার প্রায় স্মৃতি কঙ্কাল ভোলো॥

ক্রীক্ রো'র মোড়ে

প্রখর শীতে ত' কুয়াশা তাড়িত হও নি তুমি,
ধার করা লেপ—নৈশাবরণে পাওনি ফুটো,
মাঘের হাওয়ার ধারালো দাঁতের কামড় চুমি,
দিন ত' যায় না। তবু ত' আজকে পেয়েছি দুটো
পোড়া সিগারেট, ফিরপোর কেক্ পিঁপড়ে-ঢাকা।
পাকস্থলীর মুখ চেপে ধরি—গ্রন্থ বিহীন
এই মন তবু ক্ষুধার মোহের মোটর চাকা
কেবলি উধাও, গুরু ভোজনের গন্ধ-বিলীন।
সিডান-বিহারী ইন্দ্রের জাল ছড়ায়ে সহর
কত মৃত-প্রায় মধু-মক্ষীরে অন্নে টানে।
কত ক্রীক্ রো'র ধ্বংসের স্তূপে নাচের বহর,
কাম-পত্নীর বিলোল ঘূর্ণী বাতাস হানে।
পায়ের তলার কঠিন মাটির প্রথর স্রোতে,
ভেসে যাই আজ সাইরেন্-নাদী দূরের পোতে।

আলোচনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

সহৃদয় পাঠকের আজ যে একান্ত অভাব সে-কথা ত' প্রত্যক্ষ : সমাজতত্ত্বের অভিজ্ঞ ছাত্র বলেন বণিক সভ্যতার অন্তিম অবস্থাই এর কারণ। ধনবণ্টন ও উৎপাদনের এই উন্মত্ত অব্যবস্থা—প্রাচুর্য্যের মধ্যে এই হাহাকার—এ অবস্থায় লেখক ও জনসাধারণের মধ্যে পর্দ্দা একটা পড়েই। অর্থাৎ সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন যদি হয় তা হলে ভাল সাহিত্যের পাঠক নিশ্চয়ই বাড়বে, আমাদের উত্তরপুরুষ সুখপাঠ্যের সন্ধান হয়ত পাবে পাঠ্যতালিকাতেই।

হয়ত উৎসাহেই নয়, কিন্তু মোটের উপর আজকের বাংলা সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। পাঠকের অবজ্ঞা, প্রকাশকের অশিক্ষিত অবিনয় ইত্যাদির প্রতিকূলতা পার হয়েও বাংলায় আজ অনেক বই বেরুল, অনেক আশ্চর্য্য আর সুন্দর বই : লেখকদের অভিনন্দন জানাই।

হাল বাংলার সাহিত্যে অবশ্যই সব চেয়ে বড় গৌরব রবীন্দ্রনাথের অনির্ব্বাণ প্রতিভার দান। বাংলা ভাষাও আজ অদ্ভুত ধারালো। বাংলা কবিতার পরিণতিও বিস্ময়কর। তা ছাড়া কথাসাহিত্য, বিশেষ করে শিশু-সাহিত্য আজ খুবই সমৃদ্ধ। অভাব কেবল ভাল প্রবন্ধের আর নাটকের।

রবীন্দ্রনাথ

এত দিন পরে বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ যে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ করতে সুরু করেছেন, এবং ইতিমধ্যেই ছ' খণ্ড যে প্রকাশিত হল, হালের বাংলা সাহিত্যে এটা নিশ্চয়ই খুব স্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ভাল ক'রে না পড়লে আমাদের শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না, এ কথা আশা করি বুদ্ধিমান লোককে বোঝাবার দরকার করে না। এবং ভাল ক'রে পড়ার পক্ষে তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রামাণ্য সংস্করণ অনিবার্য্য। যে দিন তাঁর গ্রন্থাবলীর শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবে সে দিন ত' আমাদের জাতীয় উৎসব হওয়া উচিত ; অন্তত শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষরা সে-দিন শিক্ষায়তনগুলি বন্ধ রাখবেন না কি ?

এক দিকে নিয়মিত-ভাবে তাঁর পুরোনো লেখা যেরকম হাতে পাচ্ছি, অপর দিকে, প্রায় একই সময়ে, তাঁর নতুন লেখা নতুন বিস্ময় ব'য়ে আনছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো জাতির এ সৌভাগ্য কি হয়েছে ? ধরুন, হালে তাঁর কাছে শিশুসাহিত্যের বই পাওয়া গেল "সে", "খাপছাড়া", "ছেলেবেলা"। কবিতার বই পাওয়া গেল "প্রান্তিক", "প্রহাসিনী", "সেঁজুতি" "নবজাতক", "সানাই"—এবং খুবই সম্প্রতি "রোগশয্যায়" ও "আরোগ্য"। গল্পের বই বেরুল "তিন সঙ্গী"। এমন কি, বাংলায় যেহেতু বিজ্ঞানের বই লেখবার ভাষা এখনো নেই, রবীন্দ্রনাথ তারও একটা কাঠামো ক'রে দিলেন : "বিশ্বপরিচয়"।

বাংলাভাষা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় আধুনিক বাংলা ভাষার প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। বাংলা ভাষা, গদ্য ভাষা বিশেষ ক'রে, কতদিনই বা এর জন্ম ? তার তুলনায় কী অদ্ভুত ধারালো হয়েছে আজ! আমাদের শিক্ষিত জনসংখ্যার অনুপাতে মোটামুটি ঝরঝরে বাংলা লেখার শক্তি আজ খুবই ব্যাপক।

এর মূল কারণ অবশ্য রবীন্দ্রনাথই। তবু প্রমথ চৌধুরীর নামও এখানে তুলতে হয়। প্রমথবাবুর লেখা অনুকরণ বোধ হয় সম্ভব নয়, এবং সে-দিক থেকে "বীরবলী" লেখক বাংলায় বিরল। কিন্তু আজকের যে কথ্য ভাষার দিকে ঝোঁক, তার প্রধান উৎসাহ এসেছে প্রমথবাবুর কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথও এদিক থেকে প্রমথবাবুর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। অবশ্য তারপর তাঁর নিজের মত ক'রে এই কথ্য ভাষার প্রায় সমস্ত সম্ভাবনাকে তিনি তোলপাড় করেছেন, যার ফলে বাংলা ভাষা আজ এত পরিণতি পেল। আজকে যে-কোনো একজন অতি সাধারণ লেখককে ধরুন না : হয়ত নামগোত্রহীন কোনো কাগজের কোনো সংখ্যায় লেখা বেরুল একটা ; কিন্তু ভাষায় প্রায়ই জড়তা নেই—ঝরঝরে, পরিষ্কার ভাষা প্রায়ই পাবেন।

কবিতা

আজকের বাংলা কবিতা যে খুবই সক্রিয় এ সম্বন্ধে এত দ্বন্দ্ব ও কোলাহলই কি তার একটা প্রমাণ নয় ? রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এতখানি সোরগোল হয়েছিল একমাত্র "কল্লোল" ও "প্রগতির" সময়, এবং আধুনিক সাহিত্যের প্রায় সব কজন ভাল লেখকই তখনকার। তখন অবশ্য প্রধান সংশয় ছিল কথাসাহিত্য নিয়ে, সে সাহিত্যকে এখন মোটামুটি মেনে নেওয়া হয়েছে। আজকের প্রধান সংশয় কবিতা নিয়ে, কারণ প্রসঙ্গ ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই কবিতা আজ এত অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব যে অনভ্যস্ত পাঠকের প্রতিকূলতা প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

এ প্রতিকূলতা থাক, কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রগতি সত্যিই বিস্ময়কর। খুবই সম্প্রতি সমর সেন, অমিয় চক্রবর্ত্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হল। বাংলা কবিতার এ উন্নতির জন্য "কবিতা" কাগজ অনেকখানিই দায়ী, এবং আজ ছ' বছর ধরে বুদ্ধদেব বসু যে অধ্যবসায় ও উৎসাহ নিয়ে যুঝছেন আধুনিক বাংলা কবিতার জন্যে অন্তত শুধু সেদিক থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কবিতার আলোচনায় মোটামুটি কোনো বিভাগ করে অগ্রসর হওয়ার অনেক বিপদ, মানি। প্রথমত, কোনো কবিকেই বোধ হয় "ism" বা "ist"-এর চরম ছাপ দিয়ে চিনে নেবার উপায় নেই। তা ছাড়া, কোনো একটি বিভাগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বশত অনেক সময়ই নিজের প্রিয় কবিকে সেই কোঠায় ফেলার অনিবার্য্য ঔৎসুক্য জাগে। কিন্তু তবুও খুব সংক্ষিপ্ত প্রসারের মধ্যে অনেক কবিকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এক ভাবে গুছিয়ে না নিলে চলে না।

আধুনিক বাংলা কবিতাকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করব: শব্দবিহ্বল ও ভাববিহ্বল। (কথা দুটি শ্রীযুক্ত আইয়ুবের মুখে প্রথম শুনি, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।) অর্থাৎ, এক শ্রেণীর কবিতা প্রধান ঝোঁক দিয়েছে শব্দচয়নের দিকে। আঙ্গিককে কঠিন কাঠামো দেবার আজ যে চেষ্টা তারও মূল কারণ এই শব্দ-চেতনা। অপর দিকে, ভাববিহ্বলতা হয় ত ঠিক আধুনিক মনের ধর্ম্ম নয়, তবুও আধুনিক বাংলার অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কবিতা ভাববিহ্বল। এ ক্ষেত্রে কোনো এক শ্রেণীর কবিতার প্রতিই পক্ষপাত অসঙ্গত। বিশেষত এ বিভাগ নিতান্তই আলোচনার সুবিধের জন্যে: বস্তুত অনেক কবিতাই হয় ত উভয়ধর্ম্মাবলম্বী।

শব্দবিহ্বল কবিদের "কথা" সম্বন্ধে বিশেষ চেতনা কবিতাকে সতেজ শিরদাঁড়ায় দাঁড় করাতে চায়। এঁরা প্রায় সকলেই হাতে খড়ি পেয়েছেন ঘনিষ্ঠ রৈবিক আবহাওয়ায়। তবু এঁদের কাব্যমন নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করতে উৎসুক। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর, এবং আরো অনেকের, এ ঔৎসুক্য ছিল না। তার কারণ তাঁদের উপযুক্ত শিরদাঁড়ার অভাব, কাব্যমনের ক্রমবিকাশের অভাব। কবিতা তাই পরিণত হয়েছিল বন্ধ্যা পুনরুক্তিতে: শিথিল, তরল, পৌরুষহীন। রবীন্দ্রনাথের কোমল সাবলীল ভঙ্গী অনুকরণ করা দুঃসাধ্য, হয়ত অসাধ্যও। কবির একান্ত আত্মকেন্দ্রিক শক্তির কথা বাদ দিলেও সামাজিক পরিবর্ত্তন এর আংশিক কারণ নিশ্চয়ই। শব্দবিহ্বল কবিরা তাই রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে সশ্রদ্ধ আসন দিয়েও নিজেদের জন্যে খুঁজেছেন নিখুঁত শব্দচয়ন, যার প্রমাণ তাঁদের জমাট বাঁধুনি আঁটসাট কঠিন কঠোমোয়।

রবীন্দ্রনাথ
গান্ধী
জহরলাল

তিনজন ভারতীয় মনীষীর তিনখানি ফটোগ্রাফ। উচ্চপ্রশংসিত ও বিশেষভাবে সমাদৃত। সাইজ ৮½"×৬½" তিনখানির প্যাকেট ৫৲। সাইজ ৬"×৪" তিনখানির প্যাকেট ২।০।
ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

শম্ভু সাহা
২।১ লেকভিউ রোড
কলিকাতা

"A BOOK THAT WILL
DELIGHT, ANNOY AND DEPRESS"

দৈনন্দিন

জ্যোতির্ম্ময় রায়

It does not merely pass the time not unpleasantly; it functions positively, it makes you sit up and ponder··· nobody interested in the development of Bengali fiction should be without a copy of 'DAINANDIN'—

Buddhadeva Bose—*Hindusthan Standard*

—সাধারণ ভালো লেখকের এই ভীড়ের ভেতর থেকে পথ করেই ইদানিং কয়েকজন লেখক দেখা দিয়েছেন, যাঁদের অসাধারণ ভালো বলতে পারা যায়। বর্ত্তমান বইয়ের লেখক তাঁদেরই অন্যতম এবং অনেক হিসাবে তাঁকে আমার প্রথমতম বলেই মনে হয়।···গল্পগুলো আমি বিস্ময়ান্বিত কৌতূহলে পড়েছি—

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—**পরিচয়**

—শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় রায় সেই বিরল জাত-লিখিয়েদের একজন, কলমের বেগ যাঁরা বাগ মানাতে জানেন। তাঁর লেখায় উদ্দেশ্যে পৌঁছানটাই একমাত্র কথা নয়, যাবার পথটাও দামি। এমন অকপট প্রশংসা করবার সৌভাগ্য সব সময় মেলে না—

প্রেমেন্দ্র মিত্র

—গল্পগুলি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভের যোগ্য।

পরিচয় কার্য্যালয়
৮-বি, দীনবন্ধু মিত্র লেন

দেশ

গৌরী

সদ্য বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
সুরভি-সংহত চিত্ত-বিমোহী
অপরূপ গন্ধসার
দৈনন্দিন অঙ্গবাসনে অনুপম

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

জীবনবীমা করিবার সময়
এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে
ভুলিবেন না।

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান
লাইফ্ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

১২ মিশন্ রো
কলিকাতা

ছন্দের নিছক ঠুংঠাং নয় আর : মগজকে হয়ত ঘুমপাড়ানী ছন্দে অবশ করা যায় এবং আধঘুমন্ত পাঠকের শিথিল হাততালিও জোটে। কিন্তু তরল ছন্দের প্রাপ্য হাততালিটাও যে খেলো।

সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্ত্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু (তাঁর একেবারে হালের কবিতায়) ইত্যাদি অনেকের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এঁদের পরস্পরের মধ্যে তফাৎ অনেক : সুধীন্দ্র দত্ত ও বিষ্ণু দে'র ঝোঁক কঠিন ও ভারি শব্দ প্রয়োগের দিকে, আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যবহার করেন খুব লঘু আর চলতি কথা। তবু ছন্দ-বৈচিত্র্য ও মিল সম্বন্ধে এঁরা সকলেই খুব বেশী সচেতন। এদিকে অমিয় চক্রবর্ত্তী, ও বিশেষ ক'রে সমর সেন পদ্য কবিতা প্রায় এড়িয়েই এসেছেন। তবে অমিয়বাবুর রচনায় পদ্যের মেজাজ কিছুটা বর্ত্তমান, তাই তাঁর গদ্য কবিতাতেও চকিত মিল দিয়ে তিনি চমক লাগান। আবার অজিত দত্ত পদ্যেই লেখেন, ভাষা চলতিও নয়, ভারিও নয়, এ ভাষায় যে অতখানি সংহতি এনেছেন তা খুব আশ্চর্য্য। এর থেকেই প্রমাণ হয় শব্দচয়নে তাঁর দক্ষতা : একটু সেকেলে ধরণের ভাষা, এখানে গৌড়ীয় আলুথালু ভাব ত এসে পড়তে পারেই। কিন্তু অজিতবাবুর কবিতা-গুলি নিটোল আর জমাট। বুদ্ধদেব বসু যদিও প্রধানত ভাববিহ্বল কবিই, তবুও তাঁর হালের কবিতায় শব্দবিহ্বলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে : যেমন ধরুন তাঁর "দময়ন্তী", "পূর্ব্বরাগ" ইত্যাদি। "বন্দীর বন্দনা"র সে কূলপ্লাবী দুর্ব্বার আবেগ আর নেই, এসব কবিতায় আঙ্গিকের দিকেই জোরটা বেশী।

আবার প্রসঙ্গের তফাৎও এঁদের মধ্যে প্রচুর। সুধীনবাবু "বুদ্ধিজীবী সন্ন্যাসী, পৃথিবীর মায়ায় বিমুখ, পরমের সন্ধানী।" তবে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যর্থতাই যেন শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে পেয়ে বসে। অনেক সময় বিক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার উপর কড়া চাবুক চালিয়ে, আবার অনেক সময় এসব ভুলে থাকতে চান প্রেমের কবিতার ঘোরে। কিন্তু দার্শনিক ভাবটা মোটামুটি সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। এদিকে সমর সেন ও বিষ্ণু দের কাছে তাঁদের আসন্ন পারিপার্শ্বিকের কুশ্রীতা প্রায় "আবেশে" পরিণত হয়েছে। তবে বিষ্ণু দের নায়ক নায়িকারা প্রায়ই চটুল চালিয়াৎ ছেলে মেয়ে বা অর্দ্ধ-ইঙ্গ ফাঁপা মানুষ। এদিক থেকে ছন্দের একটা চালিয়াতি ভাব মানিয়েছেও খুব। অবশ্য "জন্মাষ্টমী" ও "পদধ্বনিতে" তিনি একেবারে সিরিয়াস্। সমর সেনের নায়ক নায়িকারা মধ্যবিত্ত কয়েকটি জীব : সুন্দরের কামনা আছে তবু কুশ্রী পারিপার্শ্বিকের কাছে তা লাঞ্ছিত, সমাজবিপ্লব ও তার সুফল যে আসন্ন ও

অনিবার্য্য সে সম্বন্ধে তারা অর্দ্ধসচেতন (এবং এই অর্দ্ধচেতনা সমরবাবু এঁকেছেন অতি দক্ষ রূপকের সাহায্যে) তবু তারা জানে এর জন্যে সংগ্রামের হিমালয়-দীয়িত্ব চাই, অথচ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মন সেদিকে উৎসাহ পায় না, এমন কি এখান থেকে পলায়নও নিরর্থক—এইসব বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে অনেক সময়ই তারা নিউরটিক, প্রায়ই মনে হয় যেন ডিলিরিয়ম্ বক্‌ছে। আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এই বিষণ্ণতা নেই একটুও: বরং একটা "বেপরোয়া ফুর্ত্তির ভাবই" ধরা পড়ে। পারিপার্শ্বিকের কুশ্রীতা উত্তীর্ণ হয়ে সুদিন যে আসবে, তাঁর তরুণ মনে এ সম্বন্ধে সংশয় মাত্র নেই, তিনি জয়গান করেছেন মুক্তকণ্ঠে সংগ্রামের দিকটা প্রায় ভুলে গিয়েই। পাঠকবিশেষের কাছে অতি-সারল্যের অপবাদ আসা বিচিত্র নয়। তবে আমার মনে হয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বাংলা কবিতায় তিনি রাজনৈতিক শ্লেষমূলক লেখার প্রবর্ত্তন করেছেন। অমিয় চক্রবর্ত্তীর কাব্যমনে প্রধানত দুটি ধারা এসে মিলেছে: রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ইউরোপ। অবশ্য শব্দের দিকে তিনি এত বেশী সজাগ যে প্রসঙ্গ অনেক সময়ই স্পষ্ট রূপ নিতে পারে না, এমন কি তাঁর আন্তর্জ্জাতিক মনে এ যুদ্ধের যে প্রতিক্রিয়া হল তাও যেন খানিকটা ঢাকা পড়েছে কথার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের আড়ালে। অজিত দত্ত প্রাচীন কাব্য ও রূপকথার ভাবে এত বিভোর যে প্রসঙ্গের দিক থেকে আধুনিক বলতে হয়ত দ্বিধা আসে। তাছাড়া আধুনিক সবজান্তার দল থেকে তিনি অনেক সময়ই সবিনয়ে সরে দাঁড়ান। পারিপার্শ্বিক থেকে এও এক ভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। অজিতবাবুর অবশ্য হাল্‌কা ঠাট্টার কবিতাও আছে, এবং সেগুলিও কম উপভোগ্য নয়। তাছাড়া, প্রসঙ্গের দিক থেকে তাঁকে আধুনিক বলা যাক আর নাই যাক তাঁর কবিতার সংযম ও সযত্ন শব্দচয়ন তাঁকে এ আখ্যা দেবেই। বুদ্ধদেব বসু প্রধানতই ভাববিহ্বল কবি, এবং তাঁর এ ধরণের কবিতার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা পরে করব। তবে হালে যে সব কবিতায় তিনি বিশেষ ভাবে শব্দ-সচেতন সেখানে অধিকাংশ সময়ই তাঁর প্রসঙ্গ বিদ্রূপ। অবশ্যই হালকা ঠাট্টা নয়, বরং এ ধরণের কবিতায় ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাই বেশী। উপলক্ষ্য অবশ্য আধুনিক পৃথিবী।

শব্দচয়ন ও সংহতির দিকে দৃষ্টি দিয়ে বাংলায় আর যে সব কবিরা ভাল কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অরুণ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চারুকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দিনেশ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রায়ই বিভিন্ন ধরণের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং অনেক সময়ই রচনা করেছেন সার্থক ও পরিণত কবিতা। তারপর আরও তরুণদের

মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, সরোজ দত্ত ইত্যাদির নামও এ দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

ভাববিহ্বলতা আধুনিক মনের ধর্ম্ম নয়। কারণ আজকের বণিক সভ্যতা পরিবারের মধ্য থেকে টেনে নিয়েছে ভাবালুতার শেষ আবরণ, মানুষ আর মানুষের মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে নির্ম্মম দেনা পাওনা আর নগ্ন স্বার্থপরতার—ভাববিহ্বলতার অবসর কোথায়? কিন্তু তবুও বাংলায় ভাববিহ্বল কবিতা রয়েছে: কারণ বোধ হয় আমাদের দেশে বণিক-সভ্যতার পুরোপুরি প্রকাশ হয় নি।

প্রায়ই শুনতে পাই ভাববিহ্বল কবিতা অনেকের মনে ধরছে না আর। গোঁড়ামির কথা। অনেক সময় অবশ্য সত্যিই আমাদের ব্যবসায়ী মন ভাবাবেগকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু সে-সব সময় ত কবিতারই মেজাজ থাকে না—শুধু ভাবের কবিতার উপর আক্রমণ কেন তা হলে? "বন্দীর বন্দনা" প'ড়ে আমরা অনেকেই ত দুর্লভ আনন্দ পেয়েছি, অথচ এ বই কী ভয়ানক ভাববিহ্বল!

হাল বাংলায় ভাববিহ্বল কাব্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বই প্রেমেন্দ্র মিত্রের "সম্রাট", বুদ্ধদেব বসুর "কঙ্কাবতী" আর "নতুন পাতা" এবং নিশিকান্তর 'অলকানন্দা'। কবিতা যে আজ প্রধানতই শব্দবিহ্বল তার কারণ হয়ত আজকের কবির বলার কথা ফুরিয়েছে। কিন্তু তাহলেও প্রেমেনবাবু আর বুদ্ধদেববাবু এর ব্যতিক্রম—তাঁদের বলার কথা আজও অনেক বাকী। এঁরা উভয়েই নতুন আবেগে ভরপুর: যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্র বাঘের কপিশ চোখে জঙ্গলের ছায়া দেখছেন, থোরাসান থেকে বাদকসানের লুপ্ত পথ তাঁকে আহ্বান করছে, কখনো বা তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে দেখছেন দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে ঘাসের ঘাঘরা পরা ছায়াবরণ সুন্দরীর দলকে। এদিকে বুদ্ধদেব বসু "কবি হয়েও কবিত্ব করতে ভয় পান নি, সেকেলে ভাব সাজিয়ে খেয়ালের দোকান খুলেছেন।" "কঙ্কাবতী" প্রেমের কবিতা, উচ্ছল পরিপূর্ণ প্রেম। কোথাও ব্যবসায়ী বুদ্ধি নেই, লাভ লোকসানের অঙ্ক এখন নয়। কবি শুধু মুগ্ধ, শুধু ভরপুর। শেয়ানার দল হাসবে হয়ত এত উত্তেজনা দেখে, কারণ প্রেমের সঙ্গে পণ্যনারীর অনুপ্রাস না দিতে পারলে তাদের তৃপ্তি নেই। কিন্তু ওদিকের খেয়ালই নেই কঙ্কাবতীতে। তারপর "নতুন পাতা"য় অবশ্য প্রেমের উত্তেজনা শিথিল হয়েছে খানিকটা: এবং কবি অনেক সময় বিহ্বল হয়েছেন প্রকৃতির দিকে চেয়ে। সমুদ্র আর পাহাড়, পাহাড় আর সমুদ্র—প্রকৃতির উদার, গম্ভীর দিক। এখানে আঙ্গিকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ক'রে তাকে আঁটসাঁট ক'রে বাঁধবার মেজাজই নেই: কবি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন যেন।

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'অমাবস্যা' আধুনিক বাংলায় ভাববিহ্বল কবিতার সুন্দর নমুনা, বইখানার যোগ্য সমাদরও যে আমাদের দেশে হয়েছে তার প্রমাণ সম্প্রতি তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে। অচিন্ত্যবাবু প্রেমের কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন কেন?

মণীশ ঘটক, প্রমথনাথ বিশী, হেমচন্দ্র বাগচী, হুমায়ুন কবির, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র—ভাববিহ্বল কবিদের প্রসঙ্গে এঁদের কথাও বলা দরকার। এ ধরণের কবিতা যে এখনো বাংলায় লেখা হচ্ছে তার প্রমাণ রইল। এঁরা অধিকাংশ সময়েই অবশ্য রবীন্দ্রঐতিহ্যকে সবিনয়ে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, এবং এ আঙ্গিকে যে প্রায়ই সুস্থ কবিতা লিখতে পেরেছেন তা অত্যন্ত সুখের কথা। অবশ্য এঁদের পরস্পরের মধ্যে তফাৎ অনেক: যেমন ধরুন মণীশবাবুর গদ্য ও পদ্য উভয় আঙ্গিকেই বেশ ঘরোয়া ভাব, এবং তাঁর সংস্কৃত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে প্রায়ই একটা কালিদাসী আবহাওয়া তৈরী করতে পারেন। হুমায়ুন কবির সব চেয়ে আরাম পান সনেটের বাঁধা গণ্ডীর ভেতর। শ্রীযুক্ত বিশী সনেটে সিদ্ধহস্ত, spenserian stanzaও লিখেছেন, সম্প্রতি ভালো অমিত্রাক্ষর লিখছেন, এবং আরও নানা ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করতে কম উৎসুক নন। মাঝে মাঝে শব্দচেতনার পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁর রচনায়।

জীবনানন্দ দাশের সাম্প্রতিক কবিতায় শব্দবিহ্বলতা ও ভাববিহ্বলতা উভয়ই চরমে পৌঁছেছে। তাঁর ভাবাবেগ কিন্তু একান্তই গূঢ় ও ব্যক্তিগত, এদিকে শব্দচেতনা অনেক সময় প্রায় অস্বস্তিকর। ফলে ব্যাপারটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত তাঁর ভাবরাজ্যের ঠিকানা পাওয়াই কঠিন, কারণ সেটা একান্তই তাঁর নিজস্ব ভাবরাজ্য। তারপর কথার উর্ণনাভে সে-রাজ্য প্রায় ঢেকে রয়েছে। অনেক সময় মনে হয় শুধু কতগুলো কথার উপর মোহ বশতই তিনি সেগুলোকে গুছোতে চাচ্ছেন: হয়ত শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু মানে পাওয়া কঠিন, হয়ত মানের দরকারও নেই। কারণ, প্রতীকী কবিরা মানে জিনিসটাকে মনে করেন কবিত্বের উল্টো। এবং বাংলায় জীবনানন্দ দাশই নিঃসন্দেহে কুলীন প্রতীকী। অর্থাৎ শব্দবিহ্বল কবিদের মধ্যে অনেকেই যদিও অল্পবিস্তর প্রতীকী তবুও তাঁদের কারুরই ভাবাবেগের রাজ্য এতটা গূঢ় ও ব্যক্তিগত নয়, কারুর কবিতাই কথার নেশায় অর্থের দিক থেকে এতখানি সর্বস্বান্ত হয় নি। "It is a complicated association of ideas represented by a medley of metaphors"—এ কথা জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

প্রবন্ধ

সাহিত্যিক বিচারেই মূল্যবান এমন প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের পর লেখেন প্রমথ চৌধুরী আর তাঁর সবুজপত্রের দল' যথা, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (এখন পণ্ডিচেরির), ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তবে এঁদের সকলের লেখাই এখন ক'মে এসেছে। এখন যাঁরা বাংলায় ভাল প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও বুদ্ধদেব বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অন্তত ভাষার দিক থেকে সুধীন্দ্র দত্তর "স্বগত" আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সসম্মান প্রচার দাবী করে। তাঁর ভাষা নিটোল জমাট, কোথাও একটুও ঢিলে নয়, একটুও অনর্থক শব্দব্যবহার নেই। তাঁর পরের প্রত্যেক লেখকদের উচিত তাঁর লেখা অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করা। এতে অন্তত ভাষা জমাট হবে, আলুথালু ভাবালুতা দূর হবে। "স্বগত" শুধুই সুসাহিত্য নয়, সুশিক্ষারও পন্থা।

শ্রীযুক্ত আইয়ুব অবশ্য লিখেছেন খুবই কম, এবং এ পর্যন্ত, অনেক অপেক্ষার পরও, তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্রিত হয়ে পুস্তকারে প্রকাশিত হল না। তবে অতিভাষণের দোষদুষ্ট না হয়েও নিশ্চয়ই বলা যায় যে তাঁর যে-ক'টি প্রবন্ধ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে হাল বাংলার সাহিত্যে তা সম্পদবিশেষ। একদিকে তাঁর চিন্তাধারায় জড়তা নেই একটুও, অপরদিকে তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে শিথিলতার একান্ত অভাব। তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের ছাত্র, তবু শিল্পে ও সাহিত্যে তাঁর আন্তরিক অনুরাগ। এ দুয়ের দুর্লভ সম্মিলন বাংলায় খুব কমই ঘটেছে।

বুদ্ধদেববাবুর প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে প্রধান কথা তাঁর হাল্‌কা ঝরঝরে ভাষা যা কোথাও তরল হয়ে পড়ে নি। গুমোট নেই, তবুও দমকা ঝড়ের মত আবেগের জঞ্জাল উড়িয়ে আনে না। তাছাড়া তাঁর মতবাদও ভারি উদার: রবীন্দ্রনাথের অত বড় ভক্ত আমি আর দেখি নি, এদিকে সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত—এ সকলেরই নানান ধরণের কবিতা তিনি গ্রহণ করেছেন অকুণ্ঠিত মনে, ভাল বলেছেন মুক্তকণ্ঠে। সুখের বিষয় তিনি "কবিতা"য় প্রায় সমস্ত আধুনিক কবিকে নিয়েই সমালোচনা করেছেন, এবং এগুলি গ্রন্থকারে একসঙ্গে প্রকাশিত হলে আধুনিক বাংলা কবিতার উপর প্রথম ভাল বই বেরুবে।

বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্ররচনাবলীর যে ধারাবাহিক সমালোচনা করছেন তাও বিশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভাল বইএর একান্ত অভাব: অধিকাংশ

বইই ভাবালুতায় জোলো, আর না হয় নীরস অধ্যাপকের মাঝারিগোছের টীকা। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত-সংখ্যা যতই গৌরবের হোক না কেন, সহৃদয় পাঠক একান্ত বিরল। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ল সম্প্রতি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলোম, এই প্রথম। আশা ছিল আর কিছু দেখি বা না দেখি অন্তত রবীন্দ্র-সাহিত্যের চর্চ্চা দেখব প্রচুর। শান্তিনিকেতন আমার খুব ভাল লাগল, অনেক কিছুই দেখলুম, তা ছাড়া সবাই খুব সহৃদয় ও অতিথিবৎসল। কেবল দেখলুম না রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় পাঠক। আমারই দুর্ভাগ্য বোধ হয়: কিন্তু আমার সঙ্গে যাঁদের আলাপ হয়েছিল তাঁরা অধিকাংশই এ সম্বন্ধে মর্ম্মান্তিক মৌন। কলকাতাতেও হয়ত তাই। বাস্তবিক ক'জনই বা আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রকৃত ভক্ত। আর তাঁর উপর ভাল বইই বা ক'খানা? রচনাবলীর সমালোচনাগুলি একত্র হ'য়ে যখন প্রকাশিত হবে তখন এ দৈন্য অনেকটা কমবে নিঃসন্দেহে।

বাংলা প্রবন্ধের অভাব অবশ্য অনেক দিক থেকেই। বৈজ্ঞানিক রচনা রামেন্দ্রসুন্দরের পর বলতে গেলে হয়ইনি। এতদিন না-হয় বলা চলত বৈজ্ঞানিক ভাষা নেই বাংলায়—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি একটি কাঠামো ত ক'রে দিয়েছেন। আসলে বোধ হয় বৈজ্ঞানিক মেজাজের অভাব: লোকে চায় না বিজ্ঞানের বই: লিখতেও না, পড়তেও না। প্রমথ চৌধুরীর ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির মতো এমন অপূর্ব্ব রচনা—তাই বা ক'জন পড়েছে?

তা ছাড়া দর্শন, ইতিহাস রাজনীতি ইত্যাদি সব কিছুরই বাংলায় বই খুব কম। এ দিকের হালে লেখা ভাল বইএর কথা বলতে গেলে শুধু সুশোভন সরকারের "মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপ", হুমায়ুন কবিরের "ইম্যানুয়েল কাণ্ট", মহেন্দ্রনাথ সরকারের "উপনিষদের আলো" এমনি মুষ্টিমেয় কয়েকটি বইএর নাম করতে হয়। বাঙালীরা যে এ সব দিকে বই লেখেন না তা নয়, কিন্তু অধিকাংশই ইংরাজীতে। ইংরাজী পাঠকের সংখ্যা ও শিক্ষা অনেক বেশী মানি, কিন্তু বাংলায় বই যদি বেরুতে থাকে তা হলে ক্রমশ পাঠকও বাড়বে নিশ্চয়ই।

হালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ দিক থেকে উল্লেখযোগ্য একটি বই প্রকাশ করেছেন—শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের "বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস।" সুখের বিষয় শ্রীকুমারবাবু আধুনিকদের অস্পৃশ্য মনে করেন না। অবশ্য আধুনিক ঔপন্যাসিকদের প্রতি সুবিচার হয় নি। যেমন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মতে ও অনেকেরই মতে আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, কিন্তু শ্রীকুমারবাবু এঁকে খানিকটা যেন তুচ্ছই করেছেন। তা ছাড়া বইটি যখন উপন্যাস ও ছোট গল্প উভয় সংক্রান্তই তখন এর নাম "বাংলা কথাসাহিত্যের ধারা" বা

ওই ধরণের কিছু হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় হত না? আর আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম না-করাটা তো অমার্জনীয়ই বলা যায়।

বাংলায় 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ ও ভালো ভ্রমণকাহিনীও দেখা দিয়েছে, এ সুখের কথা। (এ ক্ষেত্রেও অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচনা বাদ দিয়েই বলছি।) অন্নদাশঙ্কর রায়ের "পথে প্রবাসে", বুদ্ধদেব বসুর "হঠাৎ আলোর ঝলকানি," শিবরাম চক্রবর্ত্তীর "আজ ও আগামী কাল" বা প্রবোধ সান্যালের "মহাপ্রস্থানের পথে", এই বই ক'খানির কথা আজ বোধ হয় সকলেই জানেন। সাম্প্রতিক প্রকাশের মধ্যে শুধু বুদ্ধদেববাবুর "সমুদ্রতীর," "আমি চঞ্চল হে" উল্লেখযোগ্য। এ ধরণের প্রবন্ধ লেখার ক্ষমতা আছে ব'লে মনে হয় অনেকেরই: যেমন অমিয় চক্রবর্ত্তী, অজিত দত্ত, লীলা মজুমদার, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিবরাম চক্রবর্ত্তী, জ্যোতির্ম্ময় রায়। এঁরা নিজ নিজ ধরনে প্রবন্ধাদি বেশি ক'রে লিখলে প্রবন্ধের উপভোগ্যতা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকও হয়তো একদিন নিঃসংশয় হবেন।

নাটক

আধুনিক বাংলা নাটকের প্রায় সমস্ত আলোচনাই অভাব অভিযোগের আলোচনা, কারণ, বাংলা সাহিত্যে ভাল নাটক আজ প্রায় দেখাই যায় না। এবং হালে ভাল নাটক লিখেছেন বাংলায় এমন লেখক মাত্র দুজনের নাম করা যায়: "বনফুল" আর প্রমথ বিশী। "বনফুলে"র "শ্রীমধুসূদন," অভিনেয়তার দিক থেকে স্টেজ অপেক্ষা ফিল্মের বেশি যোগ্য হলেও, উপাদেয় হয়েছে; আর প্রমথ বিশীর 'মৌচাকে ঢিল', 'পরিহাসবিজল্পিতম' ইত্যাদি রচনায় নাটকের আঙ্গিক নিখুঁত, হাসির খোরাকও যথেষ্ট, যদিও সে-হাসি শ-র অনুকরণে ভাঁড়ামি হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। প্রমথবাবু শ-র অমন অন্ধ অনুকরণ না-করলেই ভালো করতেন।

বড় নাটক যদি যথেষ্ট বাজে না হয় তা হলে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাই ভালো লেখক বড় নাটক লেখবার উৎসাহ পান না। তবে একাঙ্ক নাটক, পদ্যে নাটক লেখা হতে পারে, এবং এগুলি অভিনীত হোক আর নাই হোক, সাহিত্যের একটা বিভাগ হিসেবে পাঠ্য নিশ্চয়ই। তা ছাড়া অভিনয়ই বা করা চলবে না কেন? দেশে একটা 'Little theatre'-এর পরিকল্পনা কি একান্তই অচল?

উপন্যাস ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রোত্তর যুগে সব চেয়ে স্মরণীয় সময় বোধ হয় "কল্লোল" আর "প্রগতি" বেরুবার পর থেকেই। অন্তত বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পের কথা মনে

রাখলে এ সম্বন্ধে সংশয় সম্ভব নয়। কারণ, আধুনিকদের মধ্যে যাঁরা ভাল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন তাঁরা প্রায় সবাই সে সময়কার (একটু আধটু এদিক ওদিক হতে পারে হয়ত)। সে সময়ে যে ছোটগল্প ও উপন্যাসে নতুন চেতনা এসেছিলো তার প্রমাণ শুধু তখনকার লেখকরাই কথা-সাহিত্যে নতুন নতুন পরীক্ষা করেছেন, এবং অনেক সময়ই সফল হয়েছেন। আজ বাংলা কবিতায় যে ধরণের নতুন উদ্যম আছে বাংলা কথা-সাহিত্যে তার আংশিক উৎসাহও নেই। তবে সুখের বিষয় "কল্লোল" ও "প্রগতির" সময়ের লেখকরা এখনো অবিশ্রান্ত গল্প উপন্যাস লিখছেন।

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যকে মোটামুটি এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত বনেদী জীবন ও ধনী সমাজ নিয়ে লেখা, দ্বিতীয়ত মধ্যবিত্ত নিয়ে লেখা। মোটামুটি এই দুই ভাবধারাকে আশ্রয় করেই সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে মোটামুটি দুটি ধারা প্রত্যক্ষ: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী যথাক্রমে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

শরৎচন্দ্রের কথায় আধুনিক মন অনেক সময় সায় দেয় না, মানি। নায়ক-নায়িকার পালা করে ভুল বোঝা ও আনুষঙ্গিক বিরহ ইত্যাদির ঝামেলায় আজকের পাঠক হয়ত হাঁপিয়ে ওঠেন। কিন্তু তবুও ঐতিহাসিক ভাবে রবীন্দ্রনাথের পরই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত, (তাঁর প্রথমদিককার বই বিশেষ করে) এবং বনফুল ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (মোটামুটিভাবে) এঁদের গল্প হয়ত সম্ভব হত না। আজ যে বাংলা কথাসাহিত্য নতুন উপাদান সংগ্রহ করতে পারছে নিম্নমধ্যবিত্ত ও এমন কি কৃষক মজুরদের শ্রেণী থেকেও, তার জন্যে শরৎচন্দ্র আংশিক দায়ী নিশ্চয়ই।

অপরদিকে কিন্তু ঝোঁকটা বেশী পড়েছে লেখবার ধরণের উপর, দৃষ্টিভঙ্গির উপর নয়। এদিকের কথাসাহিত্যের চরম উৎকর্ষ প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প। প্রমথবাবু গল্পের চেয়ে গল্প বলার ধরণে বেশী জোর দিয়েছেন, দৃষ্টি তাঁর সম্পূর্ণ আভিজাত্যিক। মণীন্দ্রলাল বসু, অন্নদাশঙ্কর রায় ও বুদ্ধদেব বসুর কথাসাহিত্য এ দিকেরই। এঁদের নায়ক নায়িকারা অনেক সময়েই ঘটনার ঘূর্ণিপাকে আবদ্ধ নন, কথার জাল বুনতেই ব্যস্ত।

অবশ্য উক্ত দুই দল লেখকই দুঃখের বিষয় এখন লেখা অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। তাই মনে হয় রবীন্দ্রোত্তর যুগে কথাসাহিত্যের দিকে ঝোঁক কমে কবিতার দিকে দৃষ্টি পড়ছে বেশী। তবু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সরোজ

কুমার রায়চৌধুরী, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল—কথাসাহিত্যের আসর এঁরাই এখনো জমিয়ে রেখেছেন। মাণিকবাবুর উপন্যাস 'সহরতলি' ও তাঁর ছোটগল্প 'বৌ' এবং 'মিহি ও মোটা কাহিনী' তাঁর পূর্ব্ব প্রতিভার সম্মান দেয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বাংলার দেশের ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের ছবি আঁকায়। তাঁর গল্প 'জলসাঘর' এ দিক থেকে প্রায় ক্লাসিক, এবং তাঁর হালের উপন্যাস "কালিন্দী"তেও এর প্রমাণ রইল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আজকাল নজর দিয়েছেন প্রধানত মফঃস্বল জীবনের দিকে, এবং তাঁর হালের দুটি বই—'ডবল ডেকার' আর 'পলায়ন' গল্পসাহিত্যে নতুন সুর আনল। বুদ্ধদেববাবুর 'পরিক্রমা'র পর উপন্যাস আর বেরোয় নি। অনেকে নিশ্চয়ই এর জন্যে ক্ষুণ্ণ, তবে তাঁর গল্পের বই 'ফেরিওলা' পড়ে এঁরা সান্ত্বনা পাবেন। বনফুলের ছোট্ট গল্পগুলি ছিল ভারি উপভোগ্য এবং বাংলা সাহিত্যে একেবারে অভিনব। কিন্তু তিনি আজকাল উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন: 'নির্ম্মোক'। 'কিছুক্ষণে'র ভক্তরা নতুন আনন্দ হয়ত পাবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'ধূলিধূসরে'র পর আর কথাসাহিত্যে তেমন উৎসাহ দেখান নি—সিনেমার সিনারিওর তাড়া কি তাঁকে অল্প অবসরও দেবে না? তাঁর প্রতিভা অল্প সময়েও দুর্মূল্য গল্প রচনা করতে পারে। অন্নদাশঙ্করের 'এপিক' উপন্যাস ত প্রায় শেষ হয়ে এল: খুবই সুখের কথা সন্দেহ নেই। এবং আশা করা যায় এবার তিনি ছোট গল্পের দিকে আবার নজর দিতে পারবেন। তাঁর 'প্রকৃতির পরিহাস' প'ড়ে ঐ ধরণের আরো গল্প পড়বার লোভ বাস্তবিকই সামলানো যায় না।

আরো সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে জ্যোতির্ম্মালা দেবী দু'চারটি খুবই ভালো গল্প লিখেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় দু'চারটি লিখেই থেমে গেলেন। তারপর সেদিন মাত্র সুবোধ ঘোষের রচনায় নিঃসংশয় ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেলো। তিনি এখন পর্য্যন্ত ছোটো গল্পই শুধু লিখেছেন, সংখ্যায় হয়তো সব সুদ্ধ গুটি চারেক মাত্র। তবু তিনি চারদিকেই আলোচিত হচ্ছেন তাঁর 'ফসিল' গল্পের জোরে। 'ফসিল' নিয়ে এতখানি হৈ-চৈর কারণ খানিকটা অবশ্য তার বিষয়বস্তু, তবে সুবোধবাবুর অন্য গল্পগুলিতেও বোঝা যায় যে তিনি ছোটো গল্প ভাবতে ও লিখতে জানেন।

কথাসাহিত্যে নতুন আবির্ভাবের মধ্যে আর-একজন লেখক অল্প সময়েই খ্যাতিলাভ করেছেন: জ্যোতির্ম্ময় রায়। তাঁর 'দৈনন্দিনে'র গল্পগুলিতে অন্তর্দৃষ্টি ও লিপিকুশলতা দুই-ই ধরা পড়ে, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের গল্প তাঁর বিশেষত্ব। দু'তিন পাতার মধ্যে গল্প ফাঁদতেও তিনি জানেন, অতি দুঃখের মধ্যেও হাসেন ও হাসান, কথোপকথন লেখেন খুবই ভালো। তাঁর সম্বন্ধে

বিশেষ সুখের কথা এই যে তাঁর গল্প দিন-দিনই ভালো হচ্ছে ; কিছুদিন আগে 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'বঞ্চনা' গল্পটি যে-কোনো গল্পসঙ্কলনে যাবার যোগ্য।

বাংলা কথা-সাহিত্যের অভাব অভিযোগ অবশ্য অনেক : প্রথমত ভালো হাসির গল্প খুব কম। পরশুরামের পর এদিকে ভালো বই বেরিয়েছে শিশু-সাহিত্যেই, অথচ শিশুসাহিত্যে সব রকম হাসির জায়গা নেই। এদিক দিয়ে বড়দের উল্লেখযোগ্য বই হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বুমেরাং" আর শিবরাম চক্রবর্ত্তীর "মেয়েদের মনে"র নাম করতে হয়। শিবরামবাবু বাস্তবিক শক্তিশালী লেখক। শিশুসাহিত্যে হাসির গল্পে তিনি প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, এবং বড়দের গল্পও যে ভাল লিখতে পারেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বড়দের গল্প তাঁর আরো লেখা উচিত। শিবরামবাবুর ভাষাটা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার : কারণ বাংলা ভাষায় প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব যদিও একদিক থেকে খুবই ব্যাপক তবু শিবরামবাবুই বোধ হয় ভাষার দিক দিয়ে তাঁর একমাত্র direct disciple।

হাসির গল্প ছাড়াও বাংলায় ভাল ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প ও (mystery, horror-এর গল্পও) এত বিরল যে মাত্র একজন লেখকের নাম এ দিক থেকে করা সম্ভব : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। (অবশ্য শিশু-সাহিত্যের কথা আলাদা।) তা ছাড়া এ ধরণের বই আজকাল যা বেরুচ্ছে তা প্রায়ই অপাঠ্য ও অশিক্ষিত। অথচ বিক্রী হয় ত শুনি। চাহিদা যদি থাকে তা হলে ভাল বই বেরুবে না কেন ?

শিশু সাহিত্য

শুনতে পাই ছোটদের বই বাজারে চলে খুব, অবশ্য ছাপাতে হয় ছবি দিয়ে আর দাম করতে হয় খুব সস্তা। তবে বিক্রী থাক আর নাই থাক, ছোটদের ভাল বই আছে অজস্র। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদই দিলাম, তবুও সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যা লিখেছেন তারই বা মূল্য কম কী ? সুকুমারবাবুর কয়েকটি গল্প একসঙ্গে বার হল'—'পাগলা দাশু"। খুবই সুখের কথা। কিন্তু তাঁর আরো গল্প প'ড়ে রয়েছে, নাটকগুলিও এখনো একসঙ্গে বের করা হল না।

সম্প্রতি বাংলা শিশুসাহিত্যের বিরাট পুরুষ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের মৃত্যু হয়েছে। পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত সব বয়সের শিশু ও বালক-বালিকার জন্য গদ্য ও পদ্য এত ভালো লেখা যিনি লিখেছেন পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই তিনি মহা গৌরবের অধিকারী হতেন, কিন্তু আমরা কী সম্মান দিয়েছি ? কিছুই না। তবে এখন তাঁর স্মৃতিকে সম্মান করার কিছু ব্যবস্থা

তাঁকে তো হতে পারে, তাঁর একটি মূর্ত্তি হতে পারে, তাঁর নামে শিশুসাহিত্যের লাইব্রেরি হতে পারে, হওয়া উচিতও নিশ্চয়ই, কিন্তু এ দুর্ভাগা দেশে কিছুই কি হবে ?

সম্প্রতি যাঁরা ছোটদের গল্প লেখায় মন দিয়েছেন তাঁদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করলে সুবিধে হয় : নিছক হাসির গল্প লেখেন একদল, যেমন শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও লীলা মজুমদার, এবং তারপর রবীন্দ্রলাল রায় ও গৌরাঙ্গ-প্রসাদ বসু। আর কয়েকজন প্রধানত ঝোঁক দিয়েছেন mystery, horror, detection, adventure ইত্যাদির দিকে, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি (অবশ্য এঁরা অন্য ধরণের লেখাও প্রায়ই লিখে থাকেন।) আর একদল লেখকের বিশিষ্ট কোনো ঝোঁক নেই, তাঁরা হাসির গল্পও লিখেছেন, ঘরোয়া গল্পও লিখেছেন, অ্যাডভেঞ্চারও বাদ নি, যেমন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

লীলা মজুমদার ছোটদের একটা সম্পূর্ণ নতুন জগৎ গড়েন যেন, তাঁর বলার ভঙ্গি, ভাষা, খুঁটিনাটি পর্য্যবেক্ষণ সবই সে জগতের সঙ্গে আশ্চর্য্য খাপ খায়। কিন্তু শিবরামবাবুর হাসি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের, হাসি তাঁর প্রধানতই কথার কারিগরিতে। এবং হাসাতেই যেহেতু তিনি চান,—শুধু হাসাতে আর কিছু নয়,—যে-কোনো আজগুবি পরিস্থিতির আশ্রয় নিতে তিনি দ্বিধা করেন না।

রোমাঞ্চকর গল্প সম্বন্ধে অবশ্য সত্যিই মনে হয় যে শিশুমন প্রায়ই নির্ব্বিচারে এদিকে লাফিয়ে ওঠে, এবং এই মনোভাবের অন্যায় সুযোগ নিয়ে শিশুসাহিত্যে এক ধরণের বর্ব্বরতা আজ চলেছে। মূর্খ ও অশিক্ষিত গল্পে বাজার গেছে ছেয়ে। কিন্তু সুখের বিষয় এই জঞ্জালের ভিড় ঠেলেও ভাল বই চিনে নেওয়া কঠিন নয়। যেমন ধরুন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোমাঞ্চ গল্প, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ডিটেকটিভ গল্প বা বিভূতিভূষণের adventure কাহিনী "চাঁদের পাহাড়"।

ছোটদের জন্য ভালো প্রবন্ধ উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায়চৌধুরীর পরে বড়ই কমে এসেছে। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে ছেলেদের পত্রিকাগুলি গল্পই মূল সম্বল করেছে। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও সুবিনয় রায়চৌধুরী প্রবন্ধ লেখার রেওয়াজটা রাখছেন এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ দিতে হয়। এঁরা বিজ্ঞানের কথা এত সরল আর এত মনোরম ভঙ্গিতে ছেলেদের বলেন যে ছেলেদের শুধু জ্ঞানই বাড়ে না, তাদের রুচিও সংস্কৃত হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব খুব বেশি : অজস্র ও বিচিত্র প্রবন্ধ তিনি ছোটদের জন্য লিখেছেন ও লিখছেন এবং যে-কোনো বিষয়কেই সত্যি সরস করবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

ছোটদের জন্যে বাংলায় ভাল কবিতারও অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, যোগীন্দ্র সরকারের ছড়া বা সুকুমার রায়চৌধুরীর "আবোল তাবোল" বাদ দিলেও আজ সুনির্মল বসু, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসু প্রচুর ভাল কবিতা লিখেছেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ও কয়েকটি লিমেরিক লিখেছিলেন ভালো। সম্প্রতি অবনীন্দ্রনাথের চট্‌জলদি কবিতাগুলিতে অদ্ভুত ও নতুন একটা রস পাওয়া গেলো। তবে এসব কবিতা প্রধানতই প্রকাশিত হয় মাসিকপত্রের পাতায়। কোনো প্রকাশক কি কোনোদিন এগুলির anthology বার করবেন না একটা ?

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ছবি

ছাপের ছবির কথা

ছাপের ছবির সম্বন্ধে কয়েকবার লিখেছি, কোথাও কোথাও ব'লে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। বিদেশে এই ছাপের ছবির জন্য জনসাধারণের মধ্যে যেমন একটা আগ্রহ দেখেছি, এদেশে জনসাধারণের মধ্যে তা নেই, শিল্প-সমালোচকদের এমন কি শিল্পীর মধ্যেও তা দেখিনে। Print বললেই যেন ছবির মর্য্যাদা কমে গেল। একজন দর্শক একটি etching দেখছেন, হয়ত ছবিটি তাঁর ভালই লাগল, কিন্তু যেই জানলেন যে সেটি ছাপের ছবি অমনি বললেন—'ও এটা একটা Print, আমি ভেবেছিলাম হাতে আঁকা বুঝি!' কাঠ-খোদাইয়ের রঙীন চিত্র সম্বন্ধেও তাই, কিনে আবার ফেরত দিয়ে গেছেন এমন খদ্দেরের নামও জানি, কারণ তিনি orinigal ছবি চান, Print চান না। কোনো শিল্প-সমালোচকের লেখায় দেখেছি তিনি আমার কোনো রঙীন কাঠখোদাই চিত্রে খুব জোর তুলির টান দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এই অবস্থায় যারা এই ছাপের ছবির কাজ করে থাকেন তাদের অবস্থা কি, সকলেই বুঝতে পারেন। তবুও আশা করতে ইচ্ছা হয় এ বিষয়ে ক্রমে লোকে বুঝবে ও আদর করতে শিখবে।

শিল্পীরা কারিগর, তাদের হাতে তুলি ও বুলী-যন্ত্র চলে, লেখনী তত্টা চলে না। এজন্য শিল্পীদের উপর অনুযোগের অন্ত নেই। অন্যান্য দেশে দেখা যায় যে শিল্পের প্রচারকার্য্য চালায় শিল্পী ছাড়া অন্য লোক ; তারা ব্যবসা করে,

এবং তাতেই শিল্প বেঁচে থাকে, জনসাধারণের সঙ্গে তারাই নিয়ত যোগ রক্ষা করে। এই প্রচারের কাজ শিল্পীদের করতে হয় না, তাদের দিয়ে শুধু কাজ করিয়ে নেওয়া হয় এবং তাদের কাজ লোকের কাছে তাদের পরিচিত করায়। ছাপের ছবি আজকাল illustration হিসাবে যে কতভাবে ব্যবহার হচ্ছে তা এদেশে প্রকাশকেরা কল্পনা করতে পারবেন না। এখানে সবই মামুলী। নূতন কোনো কিছু করা অসাধ্য। প্রকাশকেরা বলবেন wood-cut-এ illustration হলে মশাই কেউ বই কিনবেন না, আমরা ব্যবসা করি, বুঝছেন না, বই ছেপে ফেলে রাখতে তো পারব না।' Line block এ নানা রঙের screen দেওয়া ছাড়া, এবং সস্তা black and white illustration ছাড়া কোনো ছেলেদের বই ও চিত্রিত বই চলবে না তা তাঁরা নিশ্চিতজানেন। যাক, এসব কথা ছেড়ে দিয়ে আমার কাজের কথা বলি, ছাপের ছবির কাজে শিল্পীকে যে কতখানি হাতে কাজ করতে হয় তার একটা আভাষ দেব।

কাঠ-কাটাই (Wood-cut)

গাছ থেকে লম্বালম্বিভাবে কেটে যে কাঠ বের করা হয় তারই টুকরোতে এ কাজ করা হয়। তার আঁশ ঠাস হওয়া চাই। অর্থাৎ ছাঁপা হলে যেন দাগ দাগ না দেখা যায়। কাঠের টুকরোটিকে ছবির মাপে কেটে নেওয়া হয় এবং তার যে-দিকটায় ছবিটি কাটা হবে সে-দিকটা শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘ'ষে বেশ মসৃণ করতে হবে। প্রথম wood-cut-এর নক্সাটি কালো শাদায় কাগজে করতে হয়। তা থেকে কাঠের উপর তাকে trace ক'রে আবার কালিতে কাঠের উপর এঁকে নিতে হবে। তারপর নানারকমের ছুরি ও বাটালী দিয়ে কালো লাইনগুলি না কেটে শাদা জায়গাগুলি কেটে নীচু করে দিতে হবে। কাটা সম্পূর্ণ হলে ছাপবার কালি ছোট roller এর সাহায্যে blockটিতে লাগিয়ে তার উপর ছাপবার কাগজ রেখে চামচের পিঠ দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে ছাপটি তুলতে হবে। এরূপ ছাপ বেশী তোলা যায় না কারণ কাঠ থেকে ছাপ অনবরত ঘ'ষে তোলার জন্য তা ভোঁতা হতে থাকে। ২০ কি ২৫টি ভাল ছাপ ওঠে, কাজেই এর প্রত্যেকটিই মূল ছবির মত (original print)। কাঠ আমাদের দেশে অনেক আছে তবে এর উপযুক্ত কাঠ মোটে দু' তিন রকম দেখেছি। বিলিতি কি জাপানী কাঠ খুব ভাল, তবে তার দাম খুব বেশী আর সেজন্য এখানে পাওয়া যায় না।

রঙীন কাঠখোদাই চিত্র (Colour Woodcut)

এও woodcut-এরই মত, তবে নানা রঙে পর পর ছাপতে হয়।

সাধারণত ৬।৭ খানা block কাটতে হয়, আরো বেশী blockও প্রয়োজন মত কাটা যেতে পারে, এ করতে অত্যন্ত ধৈর্য্যের প্রয়োজন। কোন রঙের উপর কোন রঙ পড়বে তা পূর্ব্বে কাগজে এঁকে ঠিক করতে হবে, প্রত্যেকটি রঙের জন্য আলাদা আলাদা ব্লক কাটতে হবে। ছাপবার সময় দেখতে হবে প্রত্যেকটি রঙ ঠিক ঠিক জায়গায় পড়ছে কিনা, একটু সরে গেলে printটি একেবারে মাটি হবে। ভাল রঙীন woodcut-এর print উপভোগ করবার জিনিষ। কি ভাবে শিল্পী রঙের পর রঙ ছেপেছেন, কোথায় রঙ ঘন হতে পাতলা হয়ে মিশে গেছে, কত কম রঙে কত জমাট পরিকল্পনা শিল্পী করেছেন, কত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, তা ভাষায় বুঝিয়ে বলার নয়। যে বোঝে সে-ই জানে।

কাঠখোদাই (Wood Engraving)

গাছের গুঁড়িকে টুকরো ক'রে যেমন আঁক কাটে তেমনি ক'রে কেটে নেওয়া হয়। সেই কাঠে বুলী দিয়ে খোদাই কাজ করতে হয়। সূক্ষ্ম, মোটা রকমারি বুলীর ব্যবহার করতে হয়। এসব যন্ত্র দিয়ে যে খোদাই কাজ করা হয় সেই খোদাইগুলি ছাপবার সময় শাদা দেখাবে, অন্য জায়গাগুলির কালো ছাপ উঠবে। কাঠখোদাইয়ে যদিও শাদা কালোর ছবিই হয় তবে সূক্ষ্ম আলো ছায়ার কাজ এবং নানা প্রকার texture করতেও এ খুবই উপযুক্ত। সেজন্য পরিকল্পনাটি প্রথম থেকেই wood engraving-এর বিশেষত্বের উপর নির্ভর ক'রে করতে হবে।

এচিং

এচিং হয় তামার পাতে। এর অবশ্য নানা পদ্ধতি আছে, সব এখানে বলবার প্রয়োজন দেখি না। তামার পাতে মোমের প্রলেপ দিয়ে ছুঁচের মত একটি যন্ত্র দিয়ে ছবিটি তার উপর আঁচড় কেটে লাইনে আঁকতে হয়। তামার পাতটি লাইনগুলোর ভিতর দিয়ে দেখা যায় কারণ প্রত্যেক আঁচড়েই মোমের প্রলেপটি উঠে যায়। ছবিটি এইভাবে সম্পূর্ণ আঁকা হ'লে nitric acid-এর জলে ডেবাতে হয়। Acid-এ তা ডোবান মাত্র তামার পাতটি লাইনগুলির ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হতে থাকে। এজন্যই এর নাম etching। কতক্ষণ acid-এর মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে কতখানি ক্ষয় হবে শিল্পীকে তা অনেক নাস্তানাবুদ হয়ে শিখতে হয়। ক্ষয়ের কাজ হলে পর তখন আবার ছাপবার পরীক্ষা। মনে রাখতে হবে যে ক্ষয়-হওয়া লাইনগুলো কিন্তু কালো উঠবে। Wood engraving-এ যেমন নীচু জায়গাগুলি শাদা হয়, এতে হয় ঠিক

উল্টো। অর্থাৎ তামার পাতে কালি লাগান হলে মুছে মুছে surface-এর কালিটি তুলে ফেলতে হয়। এইভাবে মুছতে মুছতে গভীর লাইনগুলির মধ্যে কালিটি আটকে থাকে। Etching Press-এ এখন একে ছাপতে হবে। Pressটিতে দুটি মোটা লোহার roller আছে এবং মাঝখানে একখানা লোহার মোটা পাত আছে। Plateটি pressএর মোটা পাতের উপর রেখে ছাপবার কাগজ plateটির উপর রাখতে হয় এবং চাকা ঘুরিয়ে plateটি দুটি roller-এর ভেতর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়। তাতে কাগজে প্রত্যেক লাইন-এর কালিগুলি উঁচু (embossed) হয়ে ওঠে। এই হলো etching-এর মোটামুটি প্রণালী। সব ছাপের ছবি তৈরী করতে শিল্পীকে সব কাজ নিজে করতে হয়। এই কয়েক রকম ছাপের ছবির সম্বন্ধে খুব মোটামুটি বলা হল।

কোনো কোনো পাঠক হয়ত ভাবতে পারেন ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতে এইসব ছাপের ছবির চলন পূর্ব্বে ছিল কিনা—অর্থাৎ, বাঘ গুহা কি অজন্তার যুগে কি রাজপুত বা মোগল কলায় এ-সব প্রথার ব্যবহার ছিল কিনা। যদি না থেকে থাকে তবে আমাদের দেশে এ সব ম্লেচ্ছ শিল্পের চলন ক'রে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির অবমাননা করা অন্যায়। তাদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে আমাদের চতুর্দিকে যে বিচিত্র বিষয়বস্তু আছে তার প্রতি শিল্পীরা উদাসীন থাকতে পারে না। নানা প্রকার পদ্ধতিতে তা প্রকাশ করার তাৎপর্য্য আছে। শুধু mythology এবং আলঙ্কারিক চিত্র ছাড়াও আমাদের দেশের জল, মাটি, আকাশ বাতাসে এমন জিনিষ আছে যার তুলনা নাই। দেখা জিনিষই আমরা দেখি না। আমাদের কাছে সহজভাবে কোন জিনিষ ধরা দেয় না। যা বোঝা যায় তাই সব চাইতে কম বোঝা আমাদের স্বভাব। অর্থাৎ সব কিছুতেই তার ভেতরকার idea বের করতে হবে, হিং-টিং-ছটের মত। তা না হলে ছবির বিশেষত্ব কি, আমরা বুঝি না। এই সব ছাপের ছবিতে অসাধারণ বিষয়বস্তুর রূপ যে ভাবে প্রকাশ করার সুবিধা হয় রঙীন ছবিতেও তা সব সময় সম্ভব হয় না। এক একটি ছাপের ছবিতে এক এক প্রকার রসের প্রকাশ পাওয়া যায়। অনেক দেখে দেখে এ বিষয়ের জ্ঞান ও ঔৎসুক্য জন্মাতে থাকে।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সাম্প্রতিক চিত্রকলা

প্রদর্শনী

পর পর অনেকগুলো চিত্র-প্রদর্শনী কলকাতায় খোলা হয়েছে। এর ভেতর শিল্পী-বিশেষের প্রদর্শনীই বেশী, যৌথ-প্রদর্শনীর মধ্যে 'অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস'-এরটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। অন্য যৌথ প্রদর্শনীগুলোকে 'অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্'-এর ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবাদ হিসেবেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। অ্যাকাডেমী সাংবৎসর সাড়ম্বরে এই প্রদর্শনী খুলে আসছেন, কিন্তু তার বয়োবৃদ্ধিজনিত উন্নতি বা পরিপুষ্টি পরিলক্ষিত হচ্ছে না মোটেই। এবারকার প্রদর্শনীতে চিত্রসম্ভারের গুণগত দারিদ্র্যটা ছিল কর্কশ রকমে স্পষ্ট। শুধু স্বনামধন্য দু'একজন শিল্পীর, যেমন, অতুল বোস, মুকুল দে, এঁদের চিত্রই প্রদর্শনীর মান রেখেছে। অ্যাকাডেমীর চিত্র-নির্ব্বাচন ও চিত্রের সংস্থাপন চিত্রের গুণাগুণ ব্যক্ত করে না, ব্যক্ত করে শিল্পী কতটা করিৎকর্ম্মা শুধু সেইটুকু। অতি-সাধারণের ভিড়ের মধ্যে সাধারণও শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করবার সুযোগ পায়—পুরস্কারপ্রাপ্তিটাই সে-ক্ষেত্রে যথেষ্ট; আলোচ্য বিষয় হবার মত গুরুত্ব আরোপ করাটা সমীচীন মনে করি না।

চিত্রে প্রগতি ও শিল্পী যামিনী রায়

শিল্পী-বিশেষের প্রদর্শনীগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের প্রদর্শনী। কারণ অবনীন্দ্র ও গগনেন্দ্রনাথের পরে প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে একমাত্র যামিনীবাবুকে নিয়েই বাঙলা দেশ গৌরব করতে পারে, আর সকলেই কম-বেশি টেক্‌নিশিয়ান। আমাদের চারুকলার ক্ষেত্রে কৃতীশিল্পীর অভাব নেই, অভাব প্রতিভার—আঙ্গিককে যিনি অতিক্রম ক'রে যেতে পেরেছেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর মধ্যে প্রতিভার যে চমক দেখা গিয়েছিল তা স্থির দীপ্তি নিয়ে তাঁর তুলিকে আশ্রয় করেছে বলে মনে হয় না।

অবিশ্যি শিল্পী অতুল বোস-এর কথা ভিন্ন, এ প্রসঙ্গে তিনি আলোচ্য বিষয় না হলেও তাঁর ক্ষেত্রে তাঁকে সার্থক শিল্পী হিসেবে মানতেই হবে। প্রতিকৃতি অঙ্কনে বাস্তবের সঙ্গে চিত্রের আত্মিক মিতালিটা বড়ো কথা হতে পারে কিন্তু অঙ্গাঙ্গি সখ্যও অপরিহার্য্য। এমন কি পিকাসো এবং এপস্‌টাইন দু'জনেই যে-যাঁর স্ত্রীর যে ছবি আর মূর্ত্তি রচনা করেছেন তাতে তাঁদের অভিনব 'ইসম্' একেবারেই অনুপস্থিত (অবিশ্যি এর নেপথ্য-কারণটি হয়তো দাম্পত্য কলহের ভয়)।

যামিনীবাবু প্রৌঢ়ত্বের সীমা-রেখায় এসে পৌঁচেছেন, তবু তুলি তাঁর আজও সামান্যতম মন্থর হয় নি, এবং চলার পথটাকে কেবলই অভিনব ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ

ক'রে চলেছেন। এই প্রগতি, নূতন পথে চলবার এই সম্পদ ও সাহস আমাদের আর কোনো শিল্পীর মধ্যেই নেই। যামিনীবাবুর চিত্র সম্পর্কে বিচার-বিতর্কের অন্ত নেই। তিনি তাঁর পূর্ব্বপদ্ধতি ছেড়ে অধুনা যে-সব প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকছেন, এখনকার বিতর্কের বস্তু দাঁড়িয়েছে সেগুলো। শিল্পীদের মধ্যে এমন লোকও দেখেছি, যিনি যামিনীবাবুর প্রদর্শনীতে ঘুরে সাগ্রহে ও সপ্রশংস ভাষায় দর্শকদের সঙ্গে চিত্রের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, আবার নিজের বারবাড়ী ব'সে ভ্যান গগের তহবিল-তস্রুপের অপবাদ আরোপ ক'রে জ্ঞান-জগতের গোয়েন্দাগিরিতে কৃতিত্ব অর্জ্জনের চেষ্টা করছেন। বিশেষ ক'রে শিল্পীদের মধ্যে, ফিসফাস আরও মন্তব্য শোনা যায়—ফাঁস ক'রে দেওয়ার মত এ-ধরণের অনেক তথ্য নাকি তাদের হাতে আছে। শুধু চৌর্য্যবৃত্তিতে অপারগ বলেই যাঁরা এমনভাবে পেছিয়ে আছেন তাদের কাছে বক্তব্য আমার কিছুই নেই। কিন্তু এর সংক্রম আরও অনেকের মনকেই স্পর্শ করছে। যামিনীবাবুর ছবি দেখবার পর হয়তো তারা ভ্যান গগকে চিনেছে, এবং যামিনীবাবুর উপর তাঁর প্রভাবটা মনে মনে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। কিন্তু এটা বোঝা উচিত যে গতিশীল মনের গ্রহণশীলতা বেশি; গত ও উপস্থিতকে অমন ক'রে গ্রহণ করতে পারে ব'লেই এঁরা তাকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। তা ছাড়া ভ্যান গগের প্রকৃত নকল যে করতে পারে, নকল করবার প্রয়োজন তার হয় না। যামিনীবাবু শুধু এই কারণেই অভিনন্দিত হওয়া উচিত যে এদেশে একমাত্র তিনিই আধুনিক জীবন ও তার চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

এ নিয়ে তাঁর প্রতিভার পরীক্ষাগারে যে আশ্চর্য্য রকমের একটা ছাঁটাই-বাছাই চলছে তা তাঁর ক্রমবিকাশের মধ্যেই মূর্ত্ত হয়ে আছে। যামিনীবাবুর ছবির আলোচনায় মুখ্য হয়ে দেখা দেয় তাঁর আঙ্গিক, ও বাস্তবগঠনের বিকৃতিজনিত দুর্ব্বোধ্যতা। যামিনীবাবু আকৃতিকে গঠনের গণ্ডিরেখায় আবদ্ধ করেন না, সেটা সত্যি—পরিচয়কে অক্ষুণ্ণ রেখে পরিধি সেখানে গতিশীল। যামিনীবাবুর চিত্রে দর্শকের মনই শুধু মুক্তি পায় না, দৃষ্টিও একটা সবাধ-মুক্তির সুযোগ পায়; অবশ্যি মুক্ত-পরিসর-পরিক্রমণের ক্ষমতাটা দর্শকের মধ্যে থাকা চাই। 'আহা মরি' ধরণের ছবি না আঁকার অপরাধ-স্খালনের যুক্তি হিসেবে এ-সব কথা নেহাৎই বাকচাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়, সেটা মানতেই হবে।

যামিনীবাবুর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলোর প্রশংসা সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত ভাবেই করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কোনো সমালোচকের হাস্যকর একটা অভিমত পড়েছিলাম। যামিনীবাবু ঘরে ব'সে প্রাকৃতিক-দৃশ্য আঁকেন, এই সমালোচকের

মতে প্রথম শ্রেণীর প্রাকৃতিক-দৃশ্য আঁকবার পক্ষে এ পন্থাটাই নাকি অনুকূল; বাইরে ঘুরে আঁকলে অতি বেশি বাস্তব হয়ে ছবি-ছবি হয়ে পড়ে। তিনি বোধ হয় খোঁজ রাখেন না যে ক্যালেণ্ডারের দৃশ্যগুলো সব ঘরে ব'সেই আঁকা হয়—কিন্তু সেগুলো প্রথম শ্রেণীর হয় না তার কারণ তারা কেউ যামিনী রায় নয়, এমন কি চিত্র বলেই গণ্য হয় না কারণ তারা কেউ শিল্পীই নয়। যামিনীবাবুর সমপর্য্যায়ের শিল্পী কোথায় ব'সে কি আঁকলে তা প্রথম শ্রেণীর হবে তা নিয়ে কোন রকম নির্দ্দেশ দিতে যাওয়াই নিছক বাতুলতা। পাশ্চাত্যের কোনো এক নাম করা লেখকের ভাল ক'রে লেখাই বেরুতো না পায়ের তলায় বরফ বিছিয়ে না নিলে—অপরের পক্ষে মাথায় চাপালে যদিও বা কিছু হয়, পায়ের তলায় বিছিয়ে দিলে আর কোনো ভরসাই থাকবে না।

আমাদের শিল্পীদের এই প্রদর্শনীগুলোর আলোচনায় এ কথাটাই সব চেয়ে বড়ো ক'রে স্বীকার করা উচিত যে, সর্ব্বসাধারণকে তাদের চিত্রসম্ভারের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দিয়ে তাঁরা ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এভাবে সাধারণের মনে চিত্র সম্পর্কে সত্যিকারের রুচি যদি তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন তা হলে শিল্পীরা নিজে এবং সর্ব্বসাধারণ, দু'পক্ষই বিশেষ লাভবান হবেন সন্দেহ নেই।

ব্যবহারিক চিত্রকলা

চারুকলার যে-অংশটা ব্রহ্মণ্যভ্রষ্ট হয়ে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করেছে তাকেই বলা যায় ব্যবহারিক-চিত্রকলা। অপার্থিব আনন্দ বা রস পরিবেশন যার কাজ মানুষের দৈনিক প্রয়োজনে ও টাকা-আনা-পাই-এর ব্যাপারে নাক গুঁজতে এসে তার কৌলীন্য ভঙ্গ হয়েছে। নিজকুলে অপাংক্তেয় এই ভঙ্গ-কুলীন আজ ব্যবসার জগতে দিন-মজুরী খাটছে তাই ইংরিজিতে একে বলা হয় 'কমার্শিয়াল আর্ট' বা 'ইনডাস্ট্রিয়াল-আর্ট', আমরা বলবো ব্যবহারিক-চিত্রকলা।

যন্ত্র-যুগে সব শিল্পই উন্নত হয়েছে এবং প্রসার লাভ করেছে। যন্ত্রের কল্যাণে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রটাও দেশের সীমা ডিঙিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক। যন্ত্রের উৎপাদনী ক্ষমতা বেশী এবং একই শিল্পের বিভিন্ন উৎপাদক ও ব্যবসায়ীর সংখ্যাও প্রচুর, তাই প্রতিযোগিতাটাও বেশ তীব্র। তা ছাড়া রয়েছে নিত্য-নূতন প্রয়োজন অনুযায়ী যত সব জিনিষের আবিষ্কার, বা কোনো এক আবিষ্কৃত জিনিষ অনুযায়ী প্রয়োজনবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা, যা প্রচারকার্য্য ছাড়া চলতে পারে না। অভিনব শিল্প এবং প্রতিযোগিতা, দু'টোর বেলায়ই জানান দেওয়ার কাজটা অপরিহার্য্য। কিন্তু জানাতে চাইলেই বা ক্রেতাদের শুনবার ফুরসৎ কই—এ-যুগে ব্যস্ততা তাদের কম নয়।

এই ঘড়ি-ধরা ব্যস্তবাগীশদের নজর কাড়বার জন্যেই কলালক্ষ্মীকে আজ বাজারে নাবানো হয়েছে।

এই নজর কাড়বার কাজটি অতি কঠিন। ক্রেতারা যে-যার কাজ নিয়ে, যে-যার ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত, তার উপর লক্ষ-ব্যবসায়ীর লক্ষ রকমের কথা পাশাপাশি ভিড় ক'রে আছে, এরই মধ্য থেকে নাক বাড়িয়ে নিজের কথাটি চোখের সামনে তুলে ধ'রতে হবে—শুধু তুলে ধরলেই হলো না, অপর দশজনের হাতকে ঠেলে দর্শকের মনে একটি ঢেরা কেটে আসতে হবে—তুলে ধরার সার্থকতা সেখানে। নিজের বক্তব্যকে সার্থক করবার উদ্দেশ্যে শিল্পীরা সুন্দর, সকৌতুক, উদ্ভট, নানা ভঙ্গীই অবলম্বন করছেন। কি ক'রে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী স্বল্পে বা সুষ্ঠ ভঙ্গীতে নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করা যেতে পারে তা নিয়ে পাশ্চাত্যের এক শ্রেণী শিল্পী বিশেষ চিন্তাশীলতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, ব্যবহারিক চিত্রের রচনাপদ্ধতি ও তার নানা দিককার আলোচনার উপর তাদের ভালো ভালো সব বই রয়েছে।

শুধু ব্যবসা নয়, যে-কোনো প্রচারকার্য্যেই বিজ্ঞাপনী-চিত্র একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে বসেছে। সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে, সাধারণকে উত্তেজিত করতে বা ভয় দেখাতেও বিজ্ঞাপনী-চিত্র খুবই কার্য্যকরী—'বসন্তের টিকা লউন' থেকে লড়াই ও তার চাঁদা চাওয়া কোনোটাই আজ এ না হলে চলে না। বিজ্ঞাপনী-চিত্র ব্যবহারিক চিত্রকলার একটা দিক, তার অপর দিকটা হলো প্রয়োজনীয় বস্তুকে রূপ দেওয়া—যেমন, শাড়ীর রঙ, পাড়ের নক্সা, বইয়ের মলাট, আসবাবপত্র ইত্যাদি বহু রকমের ব্যবহার্য্য বস্তুর নামই উল্লেখ করা যেতে পারে। সব দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে দেখা যায় ব্যবহারিক চিত্রকলা আধুনিক জগতের দৈনন্দিন ব্যাপারে মস্ত একটা স্থান জুড়ে বসেছে, এবং সেই কারণে উপজীব্য হিসেবে বিশুদ্ধ-চারুকলার চেয়ে সে আজ অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। তাই সব দেশেরই সাধারণ শিল্পীরা ব্যবহারিক-চিত্রকলার দিকে ঝুঁকে পড়েছে বেশি। আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যেও এদিক দিয়ে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ব্যবহারিক-চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক হলো ব্যাবসায়ীরা—অধুনা এখানে বিলাতি এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্ব্বভারতীয় ব্যবহারিক-চিত্রকলার এক উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এ প্রদর্শনীর আউটডোর সেকসানএ শ্রীযুক্ত ধরণী সেন সর্ব্বভারতে দ্বিতীয় এবং বাঙলা দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তা ছাড়া প্রদর্শনীর সবগুলো সেকসান-এর, বাঙলার শিল্পীদের মধ্যে মিলিত প্রতিযোগিতায় তিনি পেয়েছেন প্রথম পুরস্কার। তার বর্ণ-বিন্যাস, সহজ-সরল ভঙ্গী এবং দেশ-কাল ও পণ্যোপযোগী পরিকল্পনা খুবই

প্রশংসনীয়। ভারতের ব্যবহারিক-চিত্রকলায় ধরণী সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বই-এর প্রচ্ছদপট অঙ্কনে তেমন সুদক্ষ শিল্পী বাঙলা দেশে কেউ নেই বললেই চলে। এদিক দিয়ে শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য একটা নূতন ধরণের প্রচলন করেন এবং ভালো প্রচ্ছদশিল্পী বলতে একমাত্র তাকেই বুঝায়। অক্ষর-লিখনে দক্ষ হলে এবংপরিকল্পনা বাহুল্যবর্জ্জিত হলে কাজ তাঁর আরো উন্নত পর্য্যায়ের হতো। একই ধরণ-এর পুনঃকৃতি সম্পর্কে শিল্পীর অবহিত হওয়ার মতো সময় এসেছে বলেই আমার মনে হয়। ধরণী সেন প্রচ্ছদপট খুব কমই এঁকেছেন, তবে দু'একটি কাজ যা দেখেছি তাতে এ-পর্য্যায়কে সমৃদ্ধ করবার ক্ষমতা সুস্পষ্ট। এদিকটায় তিনি যত্নবান হলে আমরা লাভবান হবো বলেই আশা করা যায়।

গল্প-চিত্র (বুক ইলাস্ট্রেসান) আঁকার দিক দিয়ে আমাদের সাধারণ স্টানডারডটা মোটেই উন্নত নয়। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা কয়েকখানা বই অবশ্যি আছে যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'সে' ও 'খাপছাড়া'য় তাঁর নিজের আঁকা যে-সব ছবি রয়েছে সেগুলোকে বলা চলে অদ্ভুত এবং অনবদ্য—দেশের একটা বিশেষ সম্পদ হিসেবেই শুধু সেগুলোকে গ্রহণ করা চলে। রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলো দেখলে চেস্টারটনের কথা মনে পড়ে, তিনি এক জায়গায় বলেছেন, তাঁর নাকি ভারি ইচ্ছে হয় খুব লম্বা একটা পেনসিল পেলে শুয়ে শুয়ে সিলিঙ-এ ছবি আঁকতে। তিনি চিত্রকর নন সেটা স্বীকার ক'রে তারপর বলছেন, 'I cannot draw a cow, but I can draw the soul of a cow.' রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কেও এ কথাই বলতে হয় যে কাঠামোটি তাঁর যত ঢিলে, যত বেপরোয়াই হোক আত্মার রূপায়নটি হয় যথার্থ। ইংরিজি ওমর খৈয়াম-এ অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁর 'ছড়া ও ছবিতে' নন্দলাল বসু, সুকুমার রায় চৌধুরীর 'হ য ব র ল' ও 'আবোল তাবোল'-এ তাঁর নিজের আঁকা ছবি এবং পরশুরামের গড্ডলিকায় যতীন সেন যে-সব ছবি এঁকেছেন তার সবগুলোই গল্প-চিত্র হিসেবে সার্থক এবং উল্লেখযোগ্য। যতীন সেনের অনুকরণে নেহাৎই ধ'রে ধ'রে আঁকা যে-সব রেখাচিত্র গল্প-চিত্র হিসেবে বাজার ছেয়ে ফেলেছে সেগুলো বড়ই অকিঞ্চিৎকর। 'পন্‌চ' ও অন্যান্য বিলিতি কাগজে হামেসাই যে ধরণের রেখাচিত্র আমরা দেখতে পাই, সযত্নকৃত রেখাচিত্র ছাড়া কলমের সহজ স্বচ্ছন্দ গতির ভেতর দিয়ে ও রকম ছবি আঁকতে আমাদের শিল্পীদের মধ্যে কেউই আজ পর্য্যন্ত সক্ষম হলেন না। রাজনৈতিক বা ব্যঙ্গচিত্রেরও এত অভাব যে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। উপরোক্ত অভাবগুলো পূরণের চেষ্টায় আমাদের শিল্পীদের যত্নবান্ হওয়া উচিত।

আলোকচিত্র

আধুনিক ক্যামেরা যন্ত্র হিসেবে খুবই উন্নত। প্রতিচ্ছবি নেবার এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী শুদ্ধ মাত্র যান্ত্রী নয়, অতি গুণী লোকের হাতে পড়ে এমন সব জিনিষ দিচ্ছে যা আজ নেমন্তন্ন পাচ্ছে উন্নাসিক চারুকলার আসর থেকে। এ-নিমন্ত্রণে ক্যামেরার ছবি কৃতার্থ হতে পারে কিন্তু গৌরব বোধ করতে পারে না। নিমন্ত্রিত-অস্পৃশ্যের মত যাকে এক কোনে পাত পেতে দিতে হবে তাকে ডেকে এনে এই অবহেলা না করাই ভালো—আলোকচিত্রেরও এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত নয়। ফটো, সে যত বড় গুণীর হাতে যত উন্নতই হোক চিত্রকলার সঙ্গে তার নাম উল্লেখটাই বাতুলতা—দু'টো সম্পূর্ণ দু' জিনিষ। চিত্রকলার দীপ্তির আওতায় টেনে আনলে আলোকচিত্রের আলোটুকু যায় মিলিয়ে, সেখানে সে চোখেই পড়তে চায় না—বিজলী বাতির জৌলুস দেখাতে হলে চাই রাতের আসর।

ক্যামেরার মারফৎ একজন গুণী তাঁর শিল্পী-মনের পরিচয় দিতে পারেন শুধু আলো-ছায়ার জ্ঞান ও দৃশ্যরচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে। যান্ত্রিকতার এই সামান্য অবকাশে শিল্পীরা অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; তাঁরা যে শুধু যন্ত্রী নন, তার চাইতে বেশী কিছু, তার পরিচয় পাওয়া যায় ঐখানেই। য়ুরোপের আলোকচিত্রশিল্পীরা নিজ শিল্পের আত্ম-পরিসরে চরম সব বিস্ময়ের সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। যে অর্থে বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনের গণ্ডিতে পা বাড়িয়েছে, তাদের কাজ দেখলে তেমনি বলা যেতে পারে আলোকচিত্র চারুকলা হিসেবে পরিচয় দেবার মতো স্তরে উন্নীত হয়েছে। য়ুরোপীয় আলোকচিত্রের সঙ্গে এ দেশের তুলনা যদিও চলে না, তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে উন্নতিটা বেশ দ্রুতই হচ্ছে। ভারতে এদিক দিয়ে অগ্রণী বোম্বাই প্রদেশ; অধুনা বাঙলা তার প্রায় সমকক্ষ হ'য়ে উঠেছে ব'লেই বলা যেতে পারে। বাঙলার আলোক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে বিমল মুখার্জ্জি, রবীন রায় ও শম্ভু সাহার নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতির্ম্ময় রায়

সংগীত

প্রাথমিক সংগীত বিজ্ঞান

ছেলেবেলায় বাবার মুহুরির মুখে অবাক হয়ে শুনেছিলুম কে যেন লিখতে জানে, পড়তে জানে না। ক্রমে বুঝলুম ব্যাপারটা এই যে লোকটি কোনোরকমে নাম সই মাত্র করতে শিখেছে, আর কিছু শেখেনি। তাই তার নিজের নামই অন্য ভাবে লিখে দিলে তাও পড়তে পারে না। এর তাৎপর্য্যটা এখন বুঝি: অনেক জিনিষ লোকে মুখস্থ ক'রে শেখে, কিন্তু কী শেখে জানে না। কলেজের ছাত্র যে কারণে অনেক সময় প্রশ্ন ঘুরিয়ে দিলেই ঘাবড়ে যায়।

গানের জগতেও এই রকম চলেছে। ওস্তাদরা কয়েকটি গান শুধু শেখেন, সংগীত বিজ্ঞান শেখেন না। ভাষা যেমন বিজ্ঞান, সংগীতও সেইরকমই বিজ্ঞান। ভাষার যেমন নিয়ম-কানুন আছে, সংগীতেরও সেই রকম নিয়ম কানুন আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ জানেন, দেশে ও কালে যে ভাষার পরিবর্ত্তন অপভ্রংশ হয় তার কারণ, আমরা খুঁজি সব চেয়ে আয়েসের পথ। সংগীতেও তাই হয়। দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কল্পনা করা শক্ত "ওঝা" কথাটি "উপাধ্যায়" থেকে এসেছে। তেমনি মূল যে সব ঠাট ছিল সেগুলি অপভ্রংশ হয়ে আজ যে আকার ধারণ করেছে তা প্রায় চেনাই যায় না। **মমা ধা না সা, মমা ধা পা সা**—যখন আস্তে এ দুটি স্বরবিন্যাস উচ্চারণ করা যায় তখন কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু দ্রুত উচ্চারণ করলে প্রথমটির শুদ্ধ নিখাদ কোমল নিখাদে পরিণত হয়ে যেতে যায়।

এই অপভ্রংশ হয় কেন? যেখানে শুধু শ্রুতির উপর নির্ভর—লিখিত কিছু নেই—সেখানেই অপভ্রংশ হয়। ভাষা লিখিত থাকে, শ্রুতির উপর নির্ভর করে না, তাই মুখের ভাষার অপভ্রংশ হলেও মূল রূপগুলি হারিয়ে যায় না, সাহিত্যে পাওয়া যায়। ভারতীয় সংগীতে বিভিন্ন ওস্তাদের মুখে একই গানের বিভিন্ন রূপ পাচ্ছি। মূল রাগ একই ছিল কিন্তু শুধু শ্রুতিনির্ভর বলে এই বিভিন্নতা। এখন এই জিনিষটাই ঘরোয়ানা নামে চলছে। লিখিত জ্ঞানের ভিত্তি নেই বলে' বিশৃঙ্খলা বেড়ে চলেছে। একে এখন থামাতেই হবে। ভারতীয় সাংগীতিকরা সকলে একত্র হয়ে অন্তত মুখ্য রাগগুলিকে standardise করবার চেষ্টা করবেন না কি?

মুখের ভাষা যেমন বর্ণমালায় ও ব্যাকরণে নির্দ্ধারিত ও লিপিবদ্ধ, সংগীতও তেমনি নির্দ্ধারিত ও লিপিবদ্ধ হয় সঠিক স্বরলিপিতে। কিন্তু আমাদের দেশে

স্বরলিপি এখনো অপরিণত। এখন সুবিস্তৃত গায়কী স্বরলিপির একান্ত দরকার, যাতে যে-কোনো গান মোটামুটি ভালোভাবেই শেখা যায়। অনেকে বলেন, স্বরলিপি দেখে গান শেখা যায় না। এ কথা বলাও যা ছাপার বই দেখে ভাষা শেখা যায় না বলাও তা-ই। শুধু বই পড়ে শিখলে ভাষায় সম্পূর্ণ দখল যে হয় না তা ত সকলেই জানি। আমাদের সব ইস্কুলে যে ভাবে ইংরেজী আর সংস্কৃত শেখানো হয় তা থেকেই কথাটা বোঝা যায়। এম. এ-তে প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন এমন ভদ্রলোকও হয়ত ইংরেজী দুটো কথা বলতে গেলে থমকে যান, এদিকে লোরেটোয় পড়া পাঁচ বছরের খুকিও চটপট ইংরেজী বলে। ভাষা বলতে গেলে কানে শোনা দরকার: গানেরও ঠিক তাই—intonation ধরতে হলে কানে না-শুনলে চলে না। কিন্তু ভাষাশিক্ষায় বইএর স্থান যে রকম মূল্যবান, সংগীতশিক্ষাতে স্বরলিপির স্থানও সেই রকম নিঃসংশয় হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় আমাদের স্বরলিপির পদ্ধতি এখনো নিতান্তই কাঁচা। গানের জগতে এত বিশৃঙ্খলতার প্রধান কারণ এইটাই।

ভারতীয় সংগীত কখনো যথেষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি বলেই আজকাল আমাদের গানে এত দুর্গতি। ওস্তাদরা সব সদারঙের নাম উঠলেই ভক্তি-বিগলিত ভাবে নাক-কান মলেন। কিন্তু সদারঙের একই গান বিভিন্ন ওস্তাদ বিভিন্ন সুরে গাইছেন, এ ত হামেসাই শুনি। সদারঙ ত একই গানের চার-পাঁচ রকম সুর দেননি। এর থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের ওস্তাদরা সদারঙএর প্রতি যে ভক্তি দেখান তা অজ্ঞতাপ্রসূত ও অনর্থক। তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা বোঝা যেত তাঁর নিজস্ব সুর বজায় রাখতে পারলে। কিন্তু তার উপায় নেই। সদারঙ যদি তাঁর কোনো গান শুনতে পেতেন তাহলে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে তিনি ভাবতেন কার গান এগুলো! নিজের সৃষ্টির বিকৃতি শিল্পীর পক্ষে সব চেয়ে ভয়াবহ পরিণাম। রবীন্দ্রনাথ তাই নিজের সুর সম্বন্ধে এত খুঁতখুঁতে, এত সচেতন। আমাদের এই অচেতন দেশে যদি তাঁর ভয় হয় যে তাঁর সুরেরও বিকৃতি ঘটবে, এ ভয় একটুও অন্যায় নয়।

শিশুকে যখন ভাষা শেখান হয় প্রথমে সে শুধু বর্ণমালা চিনতে শেখে। তারপর শেখে ছোট ছোট কথা, তারপর ছোট ছোট বাক্য—এইভাবে এক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তার শিক্ষা অগ্রসর হয়। তেমনি গান শিখতে হলেও প্রথমে শুধু স্বরগুলো শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হয়। তারপর স্বরগুলো মিলিতভাবে আয়ত্তে আনতে হয়। শুধু এইভাবে শিখলে সংগীতশিক্ষার ভিত্তি পাকা হয়। গান শেখবার এ ছাড়া উপায় নেই। অথচ আমাদের দেশে সঙ্গীতের কোনো রকম প্রাথমিক শিক্ষা না দিয়ে ওস্তাদরা প্রথম থেকেই বড়-বড় গান শেখান। এমনকি সঙ্গীতের মূল কথাগুলোর কোনো নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা পর্য্যন্ত নেই। মীড়,

গমক, ঠাট, মেল ইত্যাদি জিনিষগুলোর সংজ্ঞা এক একজন ওস্তাদ বা এক একজন লেখক এক এক ভাবে দিয়ে থাকেন। তাতে শুধু শিক্ষার্থীর নয়, সাঙ্গীতিকদেরও বিস্তর অসুবিধে। ইওরোপে যেমন ইতিহাস, ভূগোল, গণিতের মতোই সঙ্গীতের প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত বিবিধ পাঠ্যপুস্তক আছে যাতে সমস্ত সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, তেমনি আমাদের দেশেও সঙ্গীতের পাঠ্যপুস্তক হওয়া অত্যন্ত দরকার। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির বই বিলিতি ধরণের, গানের বেলায় তা না হবার কারণ কী? তাতে ভারতীয় সঙ্গীতের মর্যাদার কোনো হানি হবে না, বরং তার মর্যাদা ঠিক কোথায় তা বুঝতে শিখব। এই ধরণের পাঠ্য বই লেখা হলে ও সংগীতমহলের সকলে সেই বইএর সংজ্ঞাগুলি স্বীকার করে নিলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংগীতও অনেকখানি এগিয়ে যাবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীতকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মেয়েদের জন্যে একটি বিষয় হিসেবে ঢুকিয়ে সংগীতপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করার ব্যবস্থা কি উচিত ছিল না? এখন যে ক'খানা বই কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছেন তার কোনো লেখকের সঙ্গে কোনো লেখকের মতে মেলে না। তাই পরীক্ষার্থিনী, পরীক্ষক, প্রশ্নকর্তা প্রভৃতি সকলেই একটি বিরাট গোলমালে পড়েছেন। যতদিন না প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা হয় ততদিন এ পরীক্ষা প্রহসন মাত্র।

হিমাংশুকুমার দত্ত

থিয়েটর

আজকাল বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে যোগাযোগের অভাব অত্যন্ত প্রকট। সাহিত্যিক সাহিত্যের আওতাতেই আবদ্ধ, সাঙ্গীতিক গাইয়ে মহলেই ঘোরেন, চিত্রী ছবির রাজ্যের বাইরে বড়ো আসেন না। অথচ বিভিন্ন শিল্পীদের পারস্পরিক সংমিশ্রণে প্রত্যেক শিল্পেরই পরিপুষ্টি হয়, তার অভাবে সমস্ত শিল্পকলার, সমগ্রভাবে দেশের সংস্কৃতির ক্ষতি। ইওরোপীয় সমাজে এই সংমিশ্রণ বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার, আমাদের দেশেও তা ছিলো কিছুদিন আগেও। এখন যে তা নেই তার একটা কারণ আমার মনে হয় বাংলা থিয়েটরের মর্মান্তিক অধঃপাত। সমস্ত শিল্পকলার সঙ্গমস্থল একমাত্র রঙ্গমঞ্চতেই। ঐ একটিমাত্র জায়গা যেখানে লেখক ও চিত্রশিল্পী, সাঙ্গীতিক ও

নৃত্যবিদ সকলকেই ডাকতে হয়, অভিনয় ও প্রয়োগশিল্পের কথা ছেড়েই দিলাম। তাছাড়া বেশবিন্যাসী ও আলোকসম্পাতীর সগৌরব স্থানও রঙ্গমঞ্চেই। এতগুলো বড়ো ও ছোটো শিল্পকে যেখানে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করতে হয় সে যে প্রত্যেক শিল্পীরই চমৎকার শিক্ষাক্ষেত্র তাতে সন্দেহ কী?

শিশির ভাদুড়ী প্রথম যখন নাট্যমন্দির গড়লেন তখন তাঁর স্টেজ ছিলো কলকাতায় সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রস্থল। নাট্যমন্দির শিক্ষিত সমাজের মনে আশা জালিয়েছিলো যত উদ্দামভাবে, সে-আশা ভেঙেওছিলো তেমনি নির্মমভাবে। শিশিরবাবুর ব্যর্থতার মর্মবিদারক ইতিহাস আমরা সকলেই জানি। যিনি বাংলা থিয়েটরকে নবজীবন দিয়ে তার একটি দৃঢ় ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারতেন, তাঁর নাম থাকবে শুধুই একজন মহৎ অভিনেতা হিসেবে। এই একটি মানুষের ব্যর্থতায় বাংলা থিয়েটর একেবারেই মুষড়ে পড়লো।

তারপর বহু ঐতিহাসিক-স্মৃতি জড়ানো স্টার থিয়েটরের অস্তিত্বও লোপ পেলো। এখন তার নামমাত্র আছে, অপাত্রের হাতে প'ড়ে প্রাণ কিছুমাত্র নেই। শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহঠাকুরতা স্টার ছেড়ে দিয়ে মনোমোহন হাতে নিলেন, তারপর মনোমোহন থিয়েটর যখন সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউর অ্যাসফল্টে মিশে গেলো, নাট্যনিকেতনে আসর জমাবার চেষ্টা করলেন—প্রধানত আমেরিকা-ফেরৎ সতু সেনের সাহায্যে। আসর জমলো, কিন্তু ভালো ক'রে জমলো না, দেখতে-দেখতে যেন ভেঙে গেলো। সতু সেন রংমহলের আলো জ্বালালেন, 'রমা' দেখলুম, 'পল্লী-সমাজে'র নাট্যরূপ, ভাদুড়ীর অপূর্ব কণ্ঠস্বরে বুক-ভাঙা ডাক আবার শুনলুম। কিন্তু রংমহলও টলমল অবস্থায় পৌছতে দেরি করলো না। ধর্মতলায় একটা 'চীপ থিয়েটর' কিছুদিন চললো, পুরোনো অ্যালফ্রেড হ'লো নাট্যভারতী। ইতিমধ্যে অভিনেতা অভিনেত্রীরা চারদিকে বিস্রস্তভাবে ছড়িয়ে পড়লেন, প্রায় সকলেই সিনেমায় ভিড়লেন, রেডিওটাও রাখলেন হাতের পাঁচ, মাঝে-মাঝে নেহাৎই পুরোনো অভ্যেসের দোষে স্টেজের তক্তা ছুঁয়ে যেতে লাগলেন।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, যত চেষ্টাই করা যাক থিয়েটারকে আর বাঁচানো যাবে না, সে মরতে বসেছে। কোনো থিয়েটরের মধ্যে ঢুকলে তার ধূলি-মলিন জীর্ণ আসবাব, পানের পিক-মাখা মেঝে ও দেয়াল, রঙ্গমঞ্চে লক্ষপতির ড্রয়িংরুমে দু'খানা ভাঙা চেয়ার—প্রতিটি ছোটো জিনিস যেন হা-হা ক'রে বলে—নেই, নেই, কিছু আর নেই। এর কারণ কি সিনেমার প্রতিযোগিতা? কিন্তু যে-সব দেশে সিনেমার প্রচার ও প্রতিপত্তি আমাদের একশো গুণ, সেখানে তো থিয়েটরের এ-অবস্থা হয়নি: বরং নতুন নাটক, নতুন নাট্যকারের

কথাই শোনা যাচ্ছে। আসল কথা, আমাদের থিয়েটরে প্রাণ-বস্তু কিছু আর নেই, যাঁরা থিয়েটর চালান তাঁরা নিজেরাই নিরুৎসাহ। বক্স-আপিসে ঝনঝন না-বাজলে উৎসাহ আসে না, মানি, কিন্তু ঝনঝন আসবে কোত্থেকে? লোকে যাতে আনন্দ পায় তাতে তো পয়সা খরচ করবে। টিমটাম ক'রে যে-সব নাটক চলে তার বেশির ভাগই আখ্যান ও কথোপকথনের দিক দিয়ে এত অসম্ভব বাজে যে হাজার সাজিয়ে-গুছিয়েও (আর বলাই বাহুল্য, বাইরের সাজসজ্জাটাও ভালো হয় না) অত্যন্ত সাধারণবুদ্ধির দর্শককেও বেশিক্ষণ খুসি করতে পারে না।

কিছুদিন আগে 'রীতিমতো নাটক' বেশ একটা চমক লাগিয়েছিলো, কিন্তু সে-চমক নেহাৎই ক্ষণস্থায়ী। একটা অত্যন্ত সাধারণ প্যাঁচ বিলিতি বই থেকে নকল ক'রে দিলেই কি আর নাটক হয়? 'রীতিমতো নাটক' আসলে কোনো নাটকই নয়। থিয়েটরের যে-সব দোষ নিয়ে ঠাট্টা করা ওর উদ্দেশ্য, সে-সবগুলো দোষই তো ওতে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। এমন ছেলেমানুষি প্লট! আর শেষটায় ঐ করুণ মিলনদৃশ্য! ঠাট্টা করবার চেষ্টা না-ক'রে খোলাখুলি শস্তা মেলোড্রামা হ'লেও হয়তো একরকম উৎরোতো। তাছাড়া আর একটি কথা নাট্যকারের মনে রাখা উচিত ছিলো: 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের প্রগ্‌লভ ইংরিজি-বাংলা প্রলাপ আমরা মুগ্ধ হ'য়ে শুনি, তার কারণ ও-প্রলাপের লেখক দীনবন্ধু মিত্র। অক্ষম লেখকের হাতে ও জিনিস আবোল-তাবোল বকুনিমাত্র হয়, দু' মিনিটেই ক্লান্তি আসে।

আর ভাদুড়ীর পুরোনো দল, তাঁরা আজ কোথায়? শৈলেন চৌধুরী ফিল্‌ম-এ নষ্ট হচ্ছেন, তিনি যে সত্যি কত উঁচুদরের অভিনেতা তা তাঁকে যারা শুধু ফিল্‌মে দেখেছে তারা ধারণাও করতে পারবে না, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের মস্ত প্রতিশ্রুতি কোথায় মিলিয়ে গেলো কে জানে, বাংলার চিত্তহারিণী সীতা-রূপিণী শ্রীমতী প্রভা যখন অনতিক্ষীণ দেহ আর অনতিশুভ্র দন্তপংক্তি নিয়ে ফিল্‌মে দেখা দেন তখন 'সীতা' যে একবারও দেখেছে তার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে, আর কঙ্কাবতী আর শ্রীমতী চারুশীলা তো সমস্ত সমস্যার দায় এড়িয়েই গেলেন। একমাত্র যোগেশ চৌধুরী মশাই রঙ্গমঞ্চের প্রতি অক্ষুণ্ণ লয়্যালটি নিয়ে টিঁকে আছেন, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। তাঁর 'মাকড়শার জাল' মোটামুটি ভালো ডিটেকটিভ নাটক; আর সেদিন তাঁর 'পরিণীতা' দেখে বেশ ভালোই লাগলো। এক ধরণের পার্টে তিনি এখনো বাংলাদেশে অদ্বিতীয়, আর রঙ্গমঞ্চের পেশাদার নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র যাঁর নাটকগুলি মোটামুটি স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে লেখা।

নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রায়ই আমদানি হচ্ছেন ফিল্‌ম থেকে, কিংবা দু'চারদিন স্টেজে দেখা দিয়েই তারকা হবার মৎলবে টালিগঞ্জে ছুটেছেন। তারকা না-ব'লে তাড়কা বললেই ঠিক হয়; কারণ ফিল্‌ম্ আজ রাক্ষসীর মতো সমস্ত বাংলাদেশ গিলে খাচ্ছে। কেউ-কেউ হয়ত বলবেন, কেন, গুণী লোকেরা যদি ফিল্‌মে গিয়ে জোটেন তাহ'লে সিনেমাই কি সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হতে পারে না? এ-প্রশ্ন নিয়ে সাধারণভাবে অনেক বিতর্কই হ'তে পারে, তবে আমাদের দেশে এ-প্রসঙ্গই হাস্যকর, কারণ এখন পর্যন্ত বাংলা সিনেমা সংস্কৃতির প্রতিশ্রুত শত্রু হিসেবেই কাজ করছে। একে তো সিনেমা কোনোদিনই সাহিত্য চিত্রকলা কি সংগীতের মতো মহৎ শিল্পের পর্যায়ে পড়বে কিনা সন্দেহ, তার উপর বাংলা দেশের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। এখানে সাহিত্যিক কি সাঙ্গীতিককে ফিল্মওয়ালারা নেহাৎ না ডেকে পারেন না ব'লেই ডাকেন। কিন্তু গল্পরচনা বা সুরসংযোজনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেও ভোলেন না, কারণ তারা নিজেরাই সব বিষয়েই এক-একটি অথরিটি। কর্তৃপক্ষের এই দাম্ভিক মূঢ়তা তো আছেই, তা ছাড়া বাংলা ফিল্ম-জগতের সমস্ত আবহাওয়াটাই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সুরুচির ঘোর বিরোধী। গুণীরা সেখানে লাঞ্ছিত, অপমানিত, ও বিনষ্ট, তার সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ তো এই যে একাধিক পয়লানম্বরি গল্পলেখক সিনেমার সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত বাংলা সিনেমায় একটি সহনীয় গল্প দেখা গেলো না। আসলে শিল্পীরা নেহাৎ বাধ্য হয়েই ফিল্‌মে কাজ করেন, কাজে কোনো উৎসাহ পান না। বলা বাহুল্য, এ-ভাবে প্রকৃত শিল্পচর্চা সম্ভব নয়, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কথা তো ওঠেই না।

এই তো অবস্থা, এখন ব্যবস্থা কী? গতানুগতিক থিয়েটরের উপর ভরসা না-করাই ভালো, হয়ত মাঝে-মাঝে ভালো নাটক হবে, কোনো নাটক খুব চলবেও, কিন্তু সে নেহাৎ দৈবক্রমে, তাকে পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ মনে করা ভুল হবে। পুনরুজ্জীবন হবে তখন যখন গতানুগতিককে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে নতুন কোনো উদ্দীপনা দেখা দেবে, তার আগে নয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' ও নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' যখন দেখলুম তখন মন বিস্মিত আনন্দে ব'লে উঠলো, আমাদের দেশে এও সম্ভব! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো থিয়েটরের প্রতিষ্ঠা করলেন না, কোনো নাটকীয় ঐতিহ্য স্থাপন করলেন না, তাঁর নাটকের অপূর্ব রূপকল্প আবদ্ধ রাখলেন জোড়াসাঁকোয় আর শান্তিনিকেতনেই। তবু, রবীন্দ্রনাথের দু'একটি অভিনয় দেখেই বোঝা যায় যে শিড়দাঁড়া ছাড়া যেমন মানুষ দাঁড়ায় না, তেমনি সাহিত্য হিসেবে ভালো নাটকের নির্ভর ছাড়া থিয়েটরও দাঁড়াতে পারে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে-উদ্দীপনা ও বহুমুখী সক্রিয়তা চলেছে হয়তো তারই সংক্রমণে আমাদের থিয়েটর আবার

বেঁচে উঠবে। কিংবা কোনো যুগান্তকারী প্রতিভা এসে হয়তো তাকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা করার চাইতে নিজের হাতে সামান্য কিছুও করা ভালো। আমি প্রস্তাব করি আধুনিক লেখকরা মিলে যদি একটি লিট্‌ল্ থিয়েটর স্থাপন করেন ও তার জন্য নিজেরা নানা নতুন ধরণের নাটক লেখেন—যে-সব নাটকের প্রধান লক্ষ্য হবে ভালো সাহিত্য হওয়া—তাহলে হয়তো তা থেকেই থিয়েটরের নবজন্মের সূত্রপাত হতে পারে।

লিট্‌ল্ থিয়েটর আন্দোলন একবার সুরু করতে পারলে না-চলবার কোনো কারণ নেই, কারণ আমরা যে মনে-প্রাণে থিয়েটর ভালোবাসি তার প্রমাণ তো আমাদের অসংখ্য সৌখিন নাট্যসম্প্রদায়। বাংলাদেশের এমন কোনো কলেজ বোধ হয় নেই, মফস্বলের এমন কোনো শহর নেই যেখানে বছরে দু' একবার নারীভূমিকায় গোঁফ-কামানো পুরুষ নিয়ে নাটকের পালা না হয়, তার জন্যে খরচও করা হয় বিস্তর, খাটবার লোকেরও অভাব হয় না, অনেকেরই তাতে প্রচুর উৎসাহ দেখা যায়। এই সৌখিন দলগুলিতে ভালো অভিনেতা যে না পাওয়া যায় এমন নয়, (স্বয়ং শিশির ভাদুড়ী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট থেকে আমদানি), কিন্তু এক হিসেবে এ-পালাগুলি একেবারেই ব্যর্থ, কারণ এগুলি পেশাদার স্টেজের পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। কলকাতার স্টেজে যে-সব নাটক খুব চলতি, সৌখিন দল সেগুলোই লুফে নেন, অভিনয়পদ্ধতিতেও পেশাদার নটনটীদের অন্ধ (অনেক সময় হাস্যকর) অনুকরণ ছাড়া আর-কিছু পাওয়া যায় না। নতুন ধরণের নাটক ও অভিনয়ের নতুন আঙ্গিক সৌখিন স্টেজই পারে অনায়াসে বরণ করতে, পেশাদার স্টেজকে অনেক জিনিস শেখাতেও পারে হয়তো (একবার খিদিরপুরে এক বক্তৃতায় শিশিরবাবু এ-কথা বলেছিলেন), কিন্তু আমাদের সৌখিন নাট্যদলগুলি পেশাদারদের চেয়েও বেশি রক্ষণশীল—কিংবা তাদের নিজেদের কোনো চিন্তাশক্তিই নেই, হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে রংমহল নাট্যনিকেতনের দিকে। আসলে যে-জিনিস পুরোপুরি সৌখিন, নিছক খানিকটা আমোদের জন্য করা, তা থেকে কোনো বড়ো জিনিস কখনো জন্মাতে পারে না। বড়ো কাজ হয় আদর্শের প্রেরণায়, অর্থোপার্জনের তাগিদেও হয়, সুদ্ধু সখের খাতিরে হয় না। লিটল থিয়েটর বলতে যা বুঝি তা commercial হবে না, কিন্তু amateurishও হবে না : খাঁটি ব্যবসায়ীর নির্বিবেক পয়সা-পুজো থাকবে না তাতে, আবার সৌখিন দলের গা-ছাড়া ঢিলেঢালা ভাবটাও থাকবে না ; commercial না-হ'য়েও professional হওয়া যায়। সত্যি বলতে যে-কোনো দিকে স্থায়ী কিছু কাজ করতে হ'লে professional না হ'লে, অন্তত professional মনোভাব না থাকলে, চলে না ; যেটা নেহাৎই সখ সেটা উঁচুদরের ফাজলেমি মাত্র। ছোটো-ছোটো স্বাধীন নাটুকে দল গ'ড়ে থিয়েটরকে যদি বাঁচাতে হয়, কোনো বিষয়েই ব্যবসায়ী স্টেজের নকল করলে চলবে না, তবে পেশাদারের সীরিয়সনেস থাকা চাই।

বুদ্ধদেব বসু

সিনেমা

শিল্পকলার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে বলা হয় synthetic art। অভিনেতা, যন্ত্রী, আসবাবপত্র, আখ্যানভাগ এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য, এ সবই তার মালমশলা মাত্র। এ-সব মালমশলা নিয়ে রস সৃষ্টি করেন পরিচালক। ঔপন্যাসিকের সঙ্গে পরিচালকের সামান্য একটু মিল আছে—দু'য়েরই রসোপকরণ হলো সামাজিক পরিবেষ্টনে লোক-চরিত্র। অবিশ্যি ঔপন্যাসিকের বেলায় উপকরণের সূক্ষ্মতম ভগ্নাংশের স্রষ্টা তিনি নিজে, এবং কৃতিত্বও তাঁর ; কিন্তু পরিচালকের উপকরণের প্রতিটি অংশের একটা নিজস্ব মূল্য আছে। অভিনেতাদের চোখের সামনে দেখতে পায় ব'লেই সাধারণের মাতামাতিটা তদের নিয়েই বেশী, আসলে তাদের কৃতিত্বটা আংশিক, এবং পরিচালকের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অভিনেতার ব্যক্তিগত প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয়ের ক্ষেত্র চলচ্চিত্র হতে পারে না, সেটা সম্ভব শুধু রঙ্গমঞ্চে—অবিশ্যি প্রতিভা থাকলে তার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বেই। রাশিয়ায় নতুন পরিকল্পনার সাফল্য চলচ্চিত্রকে একদিন যদি উঁচু শ্রেণীর শিল্পকলায় উন্নত করে, তবে ভবিষ্যতে চলচ্চিত্রকলার প্রধান গুণীর আসন পাবেন পরিচালক। বিরাট ব্যাপ্ত আয়োজন ও যান্ত্রিকতার ভেতর দিয়ে অভিনেতাদের ব্যক্তিগত প্রতিভার বিশুদ্ধ বিকাশ সম্ভব নয় ব'লে অভিনয়ের দিক দিয়ে ছায়াচিত্র যেমন চারুকলার জগতে উঁচু আসন দাবি করতে পারে না, তেমনি আবার পরিচালককে তাঁর উপকরণের গুণাগুণের উপর অতি বেশি নির্ভরশীল হতে হয় ব'লে তিনি শিল্পসমাজে পাংক্তেয় হবেন বটে তবে আসনটা সুউন্নত পর্য্যায়ে পড়বে না।

বাঙলা ছবি ও তার পরিচালক

চারুকলার আসরে চলচ্চিত্রের আসন যেখানেই পড়ুক, শিল্পকলার সস্তা-সংস্করণ হিসেবে সে আজ বাজার জাঁকিয়ে বসেছে। তবু এরই মধ্যে বিলিতি ছবির কথা বলতে গেলে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতে হয়, কিন্তু

বাঙলা বাকচিত্রের সমালোচনায় প্রতিকূল আলোচনাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। চিত্রজগতের চাঁই যাঁরা, তাঁরা এই প্রতিকূলতাকে ভালো মনে গ্রহণ করেন না—এ নাকি দেশজ শিল্পে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশূন্য এক শ্রেণী লোকের নিছক উন্নাসিকতা। কিন্তু স্বাদেশিকতা বা প্রাদেশিকতার দোহাই দিয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করবার বয়স যে বাঙলা ছবি পার হয়ে এসেছে এ বিষয়ে আজও তাদের চেতনা হলো না। অবিশ্যি এটা ঠিক যে নূতন কোনো শিল্পের জন্মকালে সহানুভূতির ধাত্রীত্ব এবং শৈশবে অন্ধ-স্নেহের লালন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভুললে চলবে কেন যে শৈশব সীমাবদ্ধ, তারপর এমন একটা দিন আসে যখন সময়ের দানকে সহজভাবে অঙ্গে ও অন্তরে পুরোপুরি গ্রহণ করবার অক্ষমতা কৌতুক ও করুণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অনেকে সব দায়টা গুঁজে দিতে চান মূলধনীর ফাঁকা মস্তিষ্কে; তার পুষ্ট-পকেটের তলায় নাকি পরিচালকদের কলা-সমৃদ্ধ মন পঙ্গু হয়ে থাকে। পুনর্জন্মের থিওরী অনুযায়ী মূলধনীদের মস্তিষ্কটা ফাঁকা হওয়াই স্বাভাবিক। মেদলোভী মনুষ্যজিহ্বার তৃপ্ত্যর্থে নিজের মেদকে যে-জীব বিলিয়ে দেয়, মহৎ এই সেবা-কর্ম্মের ফল স্বরূপ তারাই পরজন্মে মনুষ্যজীবন লাভ ক'রে বহু মেদ ও বহু অর্থের অধিকারী হয়—শুধু মস্তিষ্কে গত জন্মের প্রভাবটা একটু থেকে যায়; ওখানটায় এক জন্মের কর্ম্ম নয়। পূর্ব্বজন্মের মহাদানের কথা স্মরণ ক'রে এদের এই মহা-অপরাধকে অনায়াসেই ক্ষমা করা যায়। কিন্তু পণ্ডিত পরিচালকরা মূর্খ মূলধনীর আওতার বাইরে তথাকথিত শিক্ষিত গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের সুপক্ক চারু-রম্ভা প্রদর্শনের সুযোগ অনেকই পেয়েছেন—তাদের নিজস্ব কৃতিত্ব আর গোপন নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের পরিচালকরা দোহাই দেন অর্থের অনটন ও অপরিমিত অসুবিধার। কিন্তু তাদের ছবি দেখতে ব'সে সুযোগের অভাবের চাইতে সুযোগের অপব্যবহারটাই চোখে পড়ে বেশি। মূর্খ জনগণের মুখরোচক করবার উদ্দেশ্য আরোপ করা হয় অনেক সঙ্গতিহীন মোটা রকমের সংযোজনার উপর। দেশের মূর্খ লোকেরা শ্রেণীবিশেষের এতটা উপকারে আসছে জানতে পারলে তারা সন্তুষ্ট হত। বিলিতি ছবির পরিচালক ও পরিবেশকগণ এত অতিবিজ্ঞ এবং ব্যবসায় বুদ্ধি তাদের এত কম, অন্তত ভারতে যে-ছবি পাঠানো হয় তাকে মূর্খ জনগণের আন্দাজ করবার মত মূর্খতাও তাদের ঘটে নেই। বাঙলা ছবির পরিচালক ও তার তারক-তারকার কথা ভাবতে গেলে আবার সেই কর্ম্মফলের কথা স্মরণ হয়। পরমব্রহ্মের আত্মা-তৈরীর কারখানা সৃষ্টির সুরুতে যে-রকম দুরন্ত ভারে চালু ছিল সে-তুলনায় এখন প্রায় বন্ধ বললেই চলে; তবে অবসর মত দু'চারটে নূতন আত্মা এখনও যে তিনি তৈরী করেন তার একটা বড় প্রমাণ

আমাদের স্টারস্ এণ্ড ডিরেক্টারস্। কোনো কর্ম্মফল নিয়ে ওরা আসে নি, তাই বিদ্যা, বুদ্ধি, গুণ ও রুচিহীন হয়েও অর্থ, সুখ ও সুনাম না হ'ক "কে বিদেশী"-র মতো পপুলারিটি অর্জ্জন ক'রে এ জীবনটা আপাতসুখে কাটিয়ে যাচ্ছে।

পরিচালকদের সম্পর্কে আমার এই তিক্ত অভিমত পোষণের কারণ বাঙলা ছবির দর্শকদের কাছে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর কোনোই দরকার বোধ করি না, যে কোনো চক্ষুষ্মান দর্শকই আমার সঙ্গে একমত হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিচালকের ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে অবিশ্যি এটা প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু অসংখ্য নম্বরী অপদান-এ (যাকে বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলা হয় অবদান) অর্ব্বাচীনতার এত ছড়াছড়ি যে সেগুলো নজির হিসেবে চোখের সামনে ধ'রে দিতে কুড়িয়ে জড়ো ক'রতে যাওয়াও আর এক রকমের অর্ব্বাচীনতা। মোটা রকমের যে দোষ-ত্রুটিগুলো সব ছবিতেই সমানভাবে বিদ্যমান, এই স্বল্প-পরিসরে তা নিয়েই সংক্ষেপে দু'-এক কথা বলা যেতে পারে।

বাঙলা ছবির অভিনয় চ'লে যাচ্ছে অভিনেতা এবং অভিনেত্রী ছাড়াই—এ-কথাটা বিশেষ দ্রষ্টব্যে স্থান পাবার মতো। তারক-তারকারা সবাই গাইয়ে কিন্তু অভিনেতা বা নেত্রী নয়। অভিনয়ের উচ্চশিখরে এখানে উঠতে হয় সুরের সিঁড়ি বেয়ে; নায়ক-নায়িকার নির্ব্বাচনও নির্ভর করে, গাইতে পারে কেমন তার উপরে। প্রথম চিত্রে খামোকা যে-লোকটি ভাটিয়ালী গেয়ে নাও ভাসালো, দ্বিতীয় চিত্রে দেখা গেল গলার জোরে পাড়ি জমিয়ে দিব্য এসে নায়কের গদিতে চ'ড়ে বসেছে। এর জন্যও দায়ী পরিচালকরা; যাদের কান দুটোই বড়, পিঠ পেতে যারা কেবল গায়ক বইতেই ব্যস্ত। উঁচু দরের অভিনয় করবার মতো গুণী লোকের অভাব এদেশে নেই, এমন কি চিত্র জগতেই এমন অনেক শিল্পী রয়েছেন যাঁরা সত্যিকারের সুযোগ ও শিক্ষা পেলে অভিনয়ে কৃতী হিসেবে গণ্য হ'তে পারেন—কিন্তু গান গাইতে পারেন না ব'লে পরিচালকের সুনজরে তাঁরা পড়েন না। দিন-কে-দিন বাঙলা ছবিতে গান একটা আতঙ্কের বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কে কোথা দিয়ে গান গেয়ে উঠবে তা নিয়েই হয় ভাবনা। সুটকেস গুছাবার সময় নায়িকার হয়তো গুনগুন ক'রে একটু গাইবার কথা, তার জায়গায় দেখা গেল হঠাৎ নায়িকার মুখ-চোখ গম্ভীর হলো, সুটকেসের-ডালা-ধরা হাতের মুঠোটা হলো শক্ত—বোঝা গেল একটা পুরো গান সে গাইবে। অনেক ক্ষেত্রে লম্বা গান শেষ করতে গিয়ে প্রলম্বিত হাত দু'খানা ফালতু হয়ে পড়ে; অনভ্যস্ত অভিনেতার মত ওদুটোকে নিয়ে রীতিমত বিব্রত হতে দেখেছি—শেষ পর্য্যন্ত এটা-ওটা বা আসবাবের গায় হাত বুলিয়ে তার একটা গতি করতে হয়। গানের খাতিরে ভিখিরী ও বাউলের অসঙ্গত আবির্ভাব তো হামেসাই

হচ্ছে। নায়ক বা নায়িকার মনের ভাব ও ভাষা নিয়ে গান বেঁধে রাস্তার ভিখিরী গান গেয়ে ওঠে—অর্থাৎ পরিচালক পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করেন। এক স্থগায়কের নাম-ভূমিকা অভিনয়ের কথা মনে পড়ে। ছবির প্রথমার্দ্ধ তাঁর আকৃতি ও অভিনয় দৃষ্টিকে রীতিমত পীড়িত ক'রে তুলেছিল; শেষার্দ্ধে কাহিনীর কল্যাণে তাঁর মুখে দাড়ি গজালো, সুদীর্ঘ সেই দাড়ি গোঁফের তলায় চাপা পড়লো তাঁর নব্বুই ভাগ অভিনয়—বিষয়টা আংশিক সহনীয় হ'লো। গানের বাহুল্য, অপপ্রয়োগ ও তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের মাত্রা এমন চরমে এসে পৌছেছে যে শুধু সঙ্গীতহীনতাই আজ বাঙলা ছবির একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

উচ্চশিক্ষিত এক পরিচালকের রুচির একটা পরিচয় দিচ্ছি। কোন নম্বর 'অপদান' ঠিক স্মরণ নেই—যার নায়ক ও নায়িকা উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং উভয়েই অভিজাত ধনী পরিবারের— অর্থাৎ কিনা খাঁটি 'এ্যারিস্টক্রাট'। সেই 'অ্যারিস্টক্রাট' নায়ক (নায়কের ভূমিকায় পরিচালক নিজে) তার প্রেমিকাকে সুর ক'রে ডাকছেন 'আয় না!'—অবিশ্যি 'মাইরি' কথাটা উচ্চারণ করেন নি, সেটা ছিল ভঙ্গীতে। রুচি, অপ্রাসঙ্গিক সংযোজনা এবং অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতির নজির টেনে আলোচনা অসম্ভব। বাঙলা ছবির সামনে ব'সে শুধু মনে হয় তথাকথিত শিক্ষিত একটা শ্রেণীর মূর্খতা ও অজ্ঞতা আর্কেল্যাম্পের সামনে ধ'রে পরদায় পরিবর্দ্ধিত আকারে নিক্ষেপ করা হয়েছে—আলোছায়ার ভেতর দিয়ে তার বিভিন্ন বিকাশ ব'সে ব'সে সহ্য করতে হবে।

সুবোধ্য ও সুপরিচিত নিজেদের জীবনের প্রতিচ্ছবির প্রতি সকলেরই সহজ একটা আকর্ষণ আছে তাই ব্যর্থ হবে জেনেও সাধারণ দর্শক বাঙলা ছবি দেখবার জন্যে ছুটে যায়। সর্ব্বসাধারণের মূর্খতা নয়, তাদের এই নাড়ীর টান আছে ব'লেই বাঙলা ছবি আজও বাজারে কোনোরকমে চ'লে যাচ্ছে। কতক ছবি চলে ধর্ম্মের নামে—ফঁচকে ছোঁড়া কৃষ্ণ সেজে ইয়ার্কি দিলে প্রাণ গদ্‌গদভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এমন নরনারীর সংখ্যা এদেশে স্বল্প নয়। সর্ব্বোপরি রয়েছে মহিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা—টিকিট ঘরের প্রাণ তাদের ভ্যানিটি-ব্যাগ আর ঝাঁপির ভেতর। মাতৃভাষা—অর্থাৎ কিনা তাঁদের ভাষা, (পুরুষ শুধু তা সমৃদ্ধ করে, মালিকানা স্বত্ব নারীর) তার টান দুর্দ্দমনীয়।

দেখে শেখবার ক্ষমতাটাও এ-দেশের পরিচালকদের নেই। সব দিক দিয়ে সুসমৃদ্ধ বিলিতি ছবিগুলো নাকের সামনা দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে, তা থেকে আমাদের পরিচালকরা যেটুকু গ্রহণ করে তা চোখে, উপলব্ধিতে নয়—তার পরিচয় পাওয়া যায় হাস্যকর অনুকরণে। বাঙলা ছবির আখ্যান ভাগ

সংলাপ, সংযোজনা, দৃশ্যের পরিকল্পনা ও রচনা, সব কিছুর ভেতর দিয়েই পরিচালকদের অজ্ঞতা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। অভিনয়ের জগতে এত সব অর্ব্বাচীনতা অমার্জ্জনীয়। একমাত্র অভিনয়ের আওতায় সকল শ্রেণীর শিল্পীর সমাবেশ সম্ভব ও প্রয়োজন। এটাই একমাত্র শিল্পকলা যার মধ্যে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, সুরশিল্পী, স্থপতি, যন্ত্রী, সকলকেই অংশ গ্রহণ করতে হয়। এতগুলো শিল্পীর সমন্বয়ে ও যৌথ প্রয়াসে যে-বস্তু রূপায়িত হয়, সে হবে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চরম পরিচায়ক। সেখানে জনমনের অজ্ঞতার দোহাই অচল—সাধারণের রুচিকে গ'ড়ে তোলবার দায়িত্বও যে শিল্পীদের হাতে। দেশীয় চলচ্চিত্রের এ-দোহাই পাড়তে হয় কারণ তাদের তহবিলে আছে শুধু গুটিকয় যন্ত্রী ও সঙ্গীতজ্ঞ। চলচ্চিত্রের জন্মকাল থেকে এঁরা ঘাঁটি আগলে ব'সে আছেন। সত্যিকারের শিক্ষা ও শিল্পী-মন নিয়ে যে প্রবেশ করে সে স্বস্তি বোধ করে না। তার রুচির বিকাশ তো দূরের কথা, বিদগ্ধ মন তার অজ্ঞতার আবহাওয়ায় ক্লিষ্ট হয়ে পরিত্রাণের পথ খোঁজে। অজ্ঞতার সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা হলো বিজ্ঞতাকে বাগে পেলে পীড়ন করা।

সব সমস্যার সমাধান অপেক্ষা করছে শক্তিমান পরিচালকের—যার নির্ব্বাচনের চোখ আছে, গ'ড়ে তোলবার ক্ষমতা আছে, সর্ব্বোপরি আছে শিক্ষা, সুরুচি, সামঞ্জস্য ও মাত্রাজ্ঞান।

এ তো গেল বাঙলা বাক্‌চিত্রের আমোদ-প্রমোদের দিক। এর আর একটা দিক সম্পর্কে আমাদের চিত্রজগত এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন। ফিল্ম কোম্পানি-গুলোর উচিত বিলিতি 'নিউজ রীলের' মতো দেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনার ছবি নেওয়া—বার্ত্তাবিস্তারেও সেটা যেমন কাজে আসে, স্মরণীয় ঘটনার প্রতিকৃতি ও প্রতিশব্দকে অমর ক'রে রাখার দিক দিয়েও তার মস্ত একটা মূল্য থাকে। শুধু বার্ত্তা কেন, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের উপায় হিসেবেও বাকচিত্র অসাধারণ রকমে কার্য্যকরী হতে পারে—শিশুদের শিক্ষার বাহন হিসেবে কোনো-কোনো দিক দিয়ে বলা যায় অতুলনীয়। শিক্ষামূলক চিত্র উক্ত ফিল্ম কোম্পানীগুলোর কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়; তবু রস পরিবেশনের ব্যর্থ চেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে এই নীরস কাজে একটু মনোযোগ দিলে অনিবার্য্য অকাল-মৃত্যুর পর নরলোকে জবাবদিহি করবার মত সামান্য সম্পদ অন্তত হাতে থাকবে।

জ্যোতির্ম্ময় রায়

THE SARADA CHARAN ARYAN INSTITUTION
LIBRARY
&
READING ROOM
CALCUTTA

রেডিও

প্রথমে যা মনে হয় তা নয়। এমন নয় যে নিজে রেডিও না-রাখলেও চলে। প্রথমটায় মনে হয় বটে যে কলকাতায়, অন্তত দক্ষিণ কলকাতায়, পাশের বাড়ির (কি পাশের ফ্ল্যাটের) রেডিওর মারফৎই নিখরচায় গান শোনা হ'য়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ পাশের বাড়ির যন্ত্রটার গলা বন্ধ করবার জন্যই নিজে রেডিও কিনতে হয়। কেত্তন ও ভাটিয়ালি, কাব্যসংগীত (কী জিনিস?), ভাবগীতি (কাকে বলে?) ও থিয়েটরের প্রেম-করার মতো ভাববিহ্বল স্বরে ও সুরে উচ্চারিত বাংলা খবর—প্রতিবেশীর উপভোগ্য এ-সব বস্তু থেকে আত্মরক্ষার সব চেয়ে ভালো উপায় নিজে একটি তামাম-দুনিয়া সেট রাখা। আর যখন সহ্য হয় না, তখন উনিশ কি পঁচিশ মিটারে লণ্ডন কি মস্কো কি বাটাভিয়া কেউ না কেউ আপনাকে ত্রাণ করবেই। অর্কেস্ট্রার সংগীতে ডুববে পাশের বাড়ির গোলমাল।

কথাটা হয়তো চালিয়াতির মতো শোনালো। আমি যদি বলি যে দিশি গান-বাজনার চাইতে নিগ্রোর গলার গান, ইহুদির হাতের বেহালা ভালো লাগে, আমাকে তবু চালিয়াৎ ব'লে গাল দিতে পারেন, কিন্তু যাদের বাড়ির পাঁচশো-সাতশো টাকা দামের সেটের কাঁটাটি বারো মাস তিরিশ দিন কলকাতাতেই ধরা থাকে তারা যে গাল দেবারও যোগ্য নয়। আর দুঃখের বিষয় এ-রকম লোকই আমাদের মধ্যে বেশি; যে-কোনো সন্ধ্যাবেলা বালিগঞ্জের যে-কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে তার প্রমাণ পাবেন। রেডিওর সব চেয়ে বড়ো সুবিধে যে এই যে ঘরে ব'সে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায় এ-কথা ছেলেমানুষেও বোঝে, কিন্তু কাজের বেলা এই অন্ধ একনিষ্ঠতা কেন, কেন গৌড়ীয় শ্রোতারা পারতপক্ষে দিল্লি বোম্বাই লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত ধরেন না, কলকাতা থেকে কাঁটাটি যদি বা সরে বড়ো জোর ঢাকা পর্যন্ত, কারণ ঢাকা বাঙালদেশ হ'লেও বাংলাদেশ।

এর কারণ যদি জানতে চান তবে খোঁজ নিন রেডিও কারা শোনে। প্রধানত বুড়োরা, বালক-বালিকারা ও স্ত্রীলোকেরা। বাড়িতে রেডিও না-থাকলে আজকাল মান থাকে না, বাবু তাই একটি যন্ত্র কেনেন। কেনেন বেশি দাম দিয়েই, তা না হ'লেও ভালো দেখায় না। তারপর তিনি আপিসে যান, আপিস থেকে ফেরেন, ছুটির দিনে তাস খেলেন, দিনে ঘুমোন, তাছাড়া আছে ঘোড়দৌড় ফুটবল সিনেমা। এদিকে রেডিওর মনে রেডিও বাজে। বুড়ো মা আছেন, তিনি পালা-কেত্তন শোনেন; প্রায়-যুবতী মেয়ে আছে, সে

কবিতা-ভবন

প্রকাশিত

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

নতুন পাতা ২৲
(গদ্য কবিতা)

কঙ্কাবতী

ও

অন্যান্য কবিতা ২৲

সমুদ্রতীর

অভিনব ভ্রমণকাহিনী ১৲

বন্দীর বন্দনা (২য় সং)

(ডি, এম, লাইব্রেরি) ২৲

গ্রহণ

ও

অন্যান্য কবিতা

সমর সেন

দাম এক টাকা

পদাতিক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দাম এক টাকা

পাতালকন্যা

অজিত দত্ত

দেড় টাকা

মৈনাক

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এক টাকা

চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়—বর্ষশেষ—মূল্য দেড় টাকা।

আধুনিক কবিতা

অজিত দত্ত

কুসুমের মাস ১।০

বিষ্ণু দে

উর্বশী ও আর্টেমিস ১৲

চোরাবালি ১৸০

জীবনানন্দ দাশ

ধূসর পাণ্ডুলিপি ২৲

সমর সেন

কয়েকটি কবিতা ১।০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সংক্রান্তি ১৲

অমিয় চক্রবর্ত্তী

খসড়া ১৷৷০

এক মুঠো ১৲

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

স্বপ্ন-কামনা ১৲

সকল সম্ভ্রান্ত বইয়ের দোকানে পাবেন

আপনার প্রতিষ্ঠানের আভিজাত্য
আপনার রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ
নির্ভর করে
কোন্ প্রেসে আপনার
ছাপার কাজ হয়!
তার ওপর
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার
ফোন ঃঃ কলিকাতা ঃঃ ৩৫১১

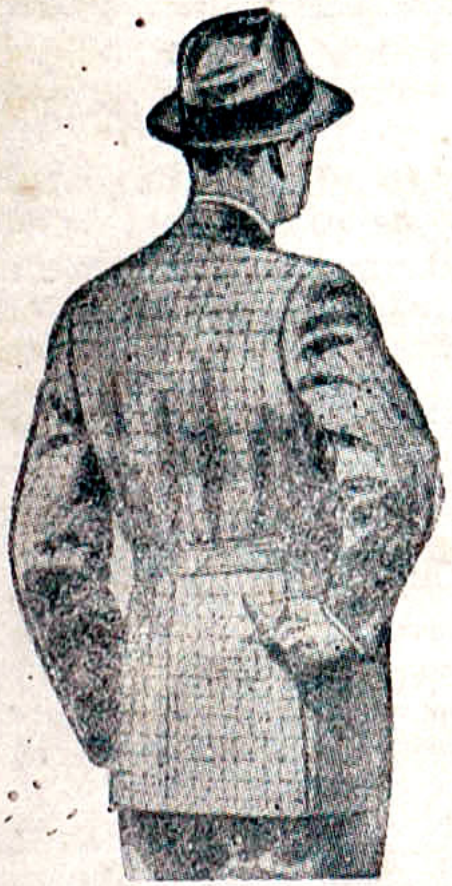

TRY US
FOR
SUMMER SUITS AND
SHIRTS

MAXIMUM SATISFACTION GUARANTEED AT A MINIMUM COST

MODERN
CUTTERS & TAILORS
LTD.
CIVIL & MILITARY TAILORS,
1, Chowringhee Place,
CALCUTTA.

রবিবার সকালে পঙ্কজ মল্লিকের কাছে গান শেখে, আবার বিকেলের দিকে 'দাদুমণির'র প্রোগ্রামও মন দিয়ে শোনে, এবং সেই নিরাকার দাদুমণির উদ্দেশ্যে লম্বা চিঠি ছোড়ে; স্ত্রী শোনেন 'মডার্ন' গান, এমনকি মহিলা-মহলের আলোচনাতেও মাঝে-মাঝে কান পাতেন, কেননা তিনি 'শিক্ষিতা', আর কলেজে-পড়া ছেলে যদি থাকে সে হঠাৎ সকলকে হটিয়ে দিয়ে দেশ-বিদেশের খবর শোনে, এই যুদ্ধের বাজারে গরম-গরম খবরের চড়া চাহিদা। বয়স্ক ও শ্রমজীবী পুরুষমানুষ ব'সে-ব'সে রেডিও শুনছে এটা আমাদের দেশে বেশি দেখা যায় না; যদি কারো সম্বন্ধে সে-রকম শোনা যায় আমরা মনে-মনে বলি —লোকটার আর তো কাজ নেই, রেডিও নিয়েই সময় কাটায়।

সত্যি কথা এই যে রেডিওর আলো জ্বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই রুচিসম্পন্ন লোকের মুখ কালো হয়। যাঁরা শোনেন তাঁদের রুচির বালাই নেই, তাই কিছুতেই অরুচি ধরে না। গান নামের কিছু একটা হ'লেই হলো, কথা কিছু হ'লেই হ'লো। যন্ত্রটা যে চুপ ক'রে নেই তাতেই তাঁরা খুসি। ঠিক এঁরাই বই যখন পড়েন, 'একখানা নভেল' পড়েন, সে-নভেলটির লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ'লেও চলে, প্রসন্ন তালুকদার হ'লেও আপত্তি নেই। খুব-ভালো আর খুব-খারাপ, মন্দ-কী আর বেশ ভালো সব সমান। ব্যবহারের অভাবে ফাঁকা-হ'য়ে-যাওয়া এঁদের মস্তিষ্কে সবই সহজে ঢুকে আরো সহজে বেরিয়ে যায়, তক্ষুনি আবার ঢোকাবার মতো টাটকা মাল চাই, কেননা Nature abhors vacuum।

আর শোনান যাঁরা? তাঁরা বলেন, আমাদের কী দোষ, পাব্লিক যা চায়, আমরা তা-ই জোগাই। ভাবতে হবে এই পাব্লিকটি কে? রেডিও-কর্তৃপক্ষের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি অবশ্যি আসে, তাতে কড়া-কড়া কথাও থাকে অনেক, কিন্তু তার ফলে কর্তারা একটুও হেলেন না, না ডাইনে না বাঁয়ে। আপনি যদি কোনো প্রিয় রেকর্ড, কিংবা শচীন দেববর্মণের মুখে তাজমহল গানটি **আরো** একবার শুনতে চান, তা নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন, কিন্তু এগুলো খুব ছোটো কথা। রেডিওর পরিচালনার মূল নীতিতে তাদের কি কোনো হাত আছে যারা বছর বছর লাইসেন্সের ফী গোনে? বলতে পারেন, থাকবেই বা কেন? আট আনা দিয়ে একটি মাসিক পত্র কিনলে কি এ-কথা বলবার অধিকার জন্মায় কোন লেখা তাতে ছাপা হবে? কিন্তু বেশি-কাটতির মাসিকপত্র কম-বুদ্ধিওলা গড়পড়তা একটি পাঠক অনুমান ক'রে নিয়ে তাকে খুসি করে যতরকমে পারে, কেননা খুসি না-করতে পারলে সে বাঁচেই না। কিন্তু রেডিওর সে-দায় নেই; রেডিও তো ব্যবসা নয়, সরকারি সম্পত্তি। সাময়িক পত্রিকার ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ির ভিড়েও মাঝে মাঝে এমন দু' একটি দেখা দেয় নগদ বথশিষের লোভ না-ক'রে যে লোকশিক্ষার

দুঃসাহসী ভার নেয়—দুর্ভাগা বঙ্গভূমেও রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা', প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' হ'য়ে গেছে, এখনো সে জাতের দু' একটি পত্রিকা যে না আছে তা নয়। অথচ আধুনিক যুগে লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় যে রেডিও, তা কেন দিনের পর দিন বঙ্গীয় পাতিবুর্জোয়ার অশিক্ষিত রুচির হুকুম তামিলই শুধু করছে? রেডিও লোকশিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় দুটি কারণে: প্রথমত ছাপার বই মনে-মনে পড়ার চাইতে জ্যান্ত গলা স্বকর্ণে শোনার প্রোপাগাণ্ডা মূল্য বেশি; দ্বিতীয়ত রেডিওর মালিক কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, কোনো লিমিটেড কোম্পানিও নয়, স্বয়ং গবর্মেণ্ট, অতএব এতে মুনাফা লাগাবার প্রশ্ন ওঠে না। বই, থিয়েটর, সিনেমা—এ সবেরই একটা ব্যবসার দিক আছে, তাঁবেদারি কিছু না-করলে এদের চলেই না; রেডিও স্বাধীন। অশিক্ষিত রুচির গোলামি না ক'রে সাধারণের রুচিকে উঁচু করার, গ'ড়ে তোলার জরুরি কাজে তাই রেডিয়োর দায়িত্বই সব চেয়ে বেশি।

অবশ্য এখন পর্যন্ত মানুষ সামান্যই সভ্য হয়েছে, তাই ঠিক ছাপাখানা চলতি-ছবির ক্যামেরা কি বেতারযন্ত্র—এ-সব যুগ-বদলানো আবিষ্কারের কোনোটিই সম্পূর্ণ কালচারের কাজে লাগানো হচ্ছে না। সব দেশেই রেডিও মুখ্যত সরকারি প্রোপাগাণ্ডার বাহন; অবসর-রাঙানো গান-বাজনা গল্প-নাটকের টোপ না-থাকলে পাব্লিক-মাছ নেহাৎই বঁড়শি গিলবে না, তাই ও-সব থাকে। তবু অন্যান্য দেশে অবসর-রাঙানোর দিকটা, এমনকি কালচারের দিকটা একেবারে বরবাদ হয় না; বি. বি. সি.র স্বদেশের প্রোগ্রামে মগজ-ওলাদের শোনবার মতোও কিছু থাকে। আমাদের দেশে যে মগজের চর্চা নেই এ-কথা নিশ্চিন্তমনে মেনে নিয়েই রেডিও-কর্তারা রাঁধাবাড়া করেন, তাঁদের নেমন্তন্নে পাত পাততে হ'লে হয় অতি ভোঁতা-মগজের হ'তে হয়, নয় মগজ রেখে আসতে হয় দরজার বাইরে। অথচ ইচ্ছে করলে তাঁরাই পারেন আমাদের মগজে শান দিতে, কালচারের কত বড়ো একটা যন্ত্র তাঁদের হাতে, অথচ কী তার ব্যবহার!

অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ করলে দু'একটা অদ্ভুত অসঙ্গতি প্রথমেই নজরে আসে। ইস্কুলের জন্য আর পাড়াগাঁর জন্য আলাদা প্রোগ্রাম ভারতবর্ষের সব ক'টা বেতার-কেন্দ্রেই আছে; কিন্তু ক'টা ইস্কুলে রেডিওসেট আছে বলুন তো? ইস্কুলই বা ক'টা? জমির মাপে জর্মনির সমান এই বঙ্গদেশে ইস্কুল তো শো বারো, তার মধ্যে দুশো বুঝি সরকারি। সেই দু'শোর কোনো-এক ইস্কুলে রেডিওসেট এলে খবরটি কাগজে বেরোয়! আর পাড়াগাঁ! বাংলার চাষি, যাদের সচ্ছলতার ধারণা রোজ একবেলা ক'রে নুন-ভাত খেতে পাওয়া, তাদের আমোদ ও শিক্ষার জন্য রেডিও প্রোগ্রাম! জন্মে যে রেডিওসেট চোখে দেখেনি, ইলেকট্রিকের আলো

জ্বালেনি, একটি ব্যাটারি সেটের দাম যে সারা-জীবনেও রোজগার করে না, তাকে এ-কথা ব'লে লাভ কী—'তোমার জন্যে ক্যায়সা সব প্রোগ্রাম পাকাচ্ছি দেখছো তো—মন দিয়ে শুনো; অজ্ঞান অন্ধকার দূর হবে।' মানবচরিত্রের আশ্চর্য একটা ব্যাপার এই যে পেট ভ'রে খেতে না পেলে শিল্পকলা বলুন, জ্ঞান-বিজ্ঞান বলুন কিছুতেই উৎসাহ হয় না, তাছাড়া অবিশ্যি অর্থনীতির মূলনীতি অনুসারেই ও-সব জিনিস ক্ষুধিতের আয়ত্তের বাইরে। গেয়ো গান, গেঁয়ো ভাঁড়ামি, পাটের চাষ সম্বন্ধে বক্তৃতা—যাদের নাম ক'রে এ-সব হচ্ছে তারা হয়তো জানেও না যে তাদের জন্য মহামান্য ভারত-সরকারের কী বিপুল আয়োজন। তারা যাতে শিক্ষায় ও সামর্থ্যে রেডিও শোনবার যোগ্য হ'তে পারে, সে-ব্যবস্থা গবর্মেণ্টে যতদিন না করেন ততদিন এই বেতার বার্তা বাতাসেই মিলোবে।

একেবারে বাতাসে মিলোলে তবু ভালো ছিলো: কিন্তু বেতারের শ্রোতার কখনোই অভাব হয় না ব'লে ব্যাপারটি আরো জটিল হয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে কলকাতার ফ্ল্যাটে বিজলী-পাখার তলে ব'সে সংসার থেকে পেন্সন-পাওয়া বৃদ্ধারা পল্লীমঙ্গল শুনছেন; বিদ্যার্থী মণ্ডলে পৃথিবীর বয়স কি অজন্তা-গুহার ছবি সম্বন্ধে আলোচনা যাদের কানে ঢুকছে তারা ইস্কুলে-পড়া ছেলেদের ইস্কুল-শেষ-করা মা। মায়েরা শিক্ষিত হ'লেও মন্দ লাভ, কিন্তু যাঁরা সবই শোনেন, তাঁরা মন দিয়ে কিছুই শোনেন না। অনেক বাড়িতেই সেটটি কলকাতায় ধরাই থাকে, যে যার মনে সংসারের কাজকর্ম করছে, কেউ কিছু শুনছে না, বাড়িতে যে একটা গোলমাল চলেছে এটুকুই সুখ।

তবু কানের কাছে প্রতিদিন একটা বিরামহীন ঘ্যানঘ্যানানি চলতে থাকলে কিছু-না-কিছু কানে ঢুকবেই, আর তার ভালো-মন্দ ফলও ফলবে। যেমন ধরুন, শহুরে লোকের গ্রাম সম্বন্ধে যা ধারণা তাই হ'লো রেডিওর পল্লীমঙ্গল, পাড়াগাঁর লোকের তা কোনো কাজেই লাগছে না, অথচ শহুরে লোকের মনে গ্রাম্যতা ঢোকাচ্ছে। সত্যি বলতে, পল্লীমঙ্গলের গান কি নাটক কি রসিকতা কিছুই পাড়াগাঁর নয়, তাতে জনগণের সরল বলশালিতা নেই, আছে গ্রাম্যতা, ন্যাকামি, শহুরে মনের গ্রাম সম্বন্ধে ভাববিলাস—এক কথায় ভালগারিটি। ও-জিনিস বেশি শুনলে স্বল্প-শিক্ষিত নাগরিক-নাগরিকার রুচিবিকার ঘটবেই। ঘটছেও। গ্রামের নামে ন্যাকামি ছড়ানোর চাইতে ঢের ভালো শহুরে শ্রোতাকে কেতাদুরস্ত শহুরে ক'রে তোলা, কেননা sophistication অন্তত সভ্যতাকে স্বীকার করে, vulgarity হ'লো শিক্ষিত বর্বরতা। কিন্তু sophistication ও আমাদের দেশে নেই, অন্তত রেডিওতে নেই; রেডিও-মার্কা sophisticatiou তো ফিল্মের ঠুনকো গান।

ন্যাকামির চরম উদাহরণ অবশ্যি কলকাতার ছেলেমেয়েদের প্রোগ্রাম। প্রথমত, ব্রাহ্মসমাজের বালক-বালিকা সম্মিলনী যে-অর্থে বালক-বালিকার নয়, সে-অর্থে এই আসরটিও ছেলেমেয়েদের নয়। এমনিই তো বাংলাদেশ বুড়ো খোকার দেশ; তার উপর বুড়ো খোকা-বুড়ি খুকিদের আধো-আধো বাধো-বুলি মাইক্রোফোনে সপ্তাহে দু'দিন ক'রে দেশময় ছড়াতে থাকলে খুবই ভয়ের কথা। দাদুমণি যিনি, তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর, পুঁজি যথেষ্ট, তাছাড়া তিনি লেখেন ভালো; সত্যি বলতে তিনি যথার্থই রেডিওর উপযোগী বক্তা, কিন্তু তাঁর এত গুণ চাপা পড়েছে তাঁর একান্ত ভাববিহ্বল কথা বলার ধরণে। আর ঐ চিঠি পড়া! 'ভাই লীলা, তোমার চিঠি পেয়েছি···' 'ভাই বেলা, তুমি লিখেছো···,' 'ভাই মীরা, তুমি কি রাগ করছো ভাই?' এত বেশি ভাই-ভাই ভাব আমাদের ভালো মনে হয় না। এই ভায়েদের চিঠিতে সারবস্তু কিছুই থাকে না, থাকে শুধু প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাস, এ থেকে অনুমান করা শক্ত হয় না এই ভ্রাতৃকুলে কেউই ঠিক খুকু নয়। এ-সব চিঠি কেন যে পড়া হয়, আর ছোটোদের আসরে এ-সব শাড়ি-পরা ভ্রাতৃস্থানীয়ারা আসেনই বা কোন অধিকারে এ-প্রশ্ন তোলা অবৈধ হয় না। বিশেষত যখন দেখি এই চিঠির ব্যাপারটা দুর্দান্ত ছোঁয়াচে রোগের মতোই চারদিকে ছড়াচ্ছে, এই ন্যাকামি ঢুকেছে পঙ্কজ মল্লিকের রবিবাসরীয় আসরে, ছেয়েছে বাংলাদেশের প্রতেকটি শিশু-পত্রিকা, এক 'রামধনু' ছাড়া তখন মনে হয় কোনো একটা তরফ থেকে তীব্র প্রতিবাদ না-জানালে আর চলছে না।

শোনা যায় দাদুমণির আসরই নাকি কলকাতার রেডিওর সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান, ছেলেমেয়েদের দিদিরা মায়েরাও হাঁ ক'রে দাদা-ভাইয়ের কথা গেলেন। তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ মনের বয়েসের দিক থেকে দশ বছরের মেয়ে আর তার তিরিশ বছরের মায়েতে বিশেষ তফাৎ নেই বাংলাদেশে। (বাপের মানসিক বয়েসও যে দশের বেশি তা সব সময় নয়, তবে দাদুমণির আসরের সময়ে তিনি আপিস থেকে ফেরেন না, এই যা বাঁচোয়া)। কিন্তু অবাক না হ'য়ে পারিনে যখন শুনি শুক্রবার সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টাব্যাপী নাটকই হ'লো জনপ্রিয়তায় রঙের টেক্কা। রঙ্গমঞ্চের পুরোমাপের নাটক রঙ্গমঞ্চেরই অভিনেতা অভিনেত্রী দিয়ে যদি অভিনয় করাতে হয়, তবে মাইক্রোফোন কেন, স্টেজই তো রয়েছে। আমাদের রেডিও শুধু নয়, আমাদের সিনেমাও রঙ্গমঞ্চের হুবহু নকল ক'রে চালাচ্ছে এখনো, এই বীভৎস বিশদৃশতা কারো চোখেই কি ধরা পড়ে না? কলকাতার স্টেজে কেউ পার্ট মুখস্থ করে না, প্রমটারের কথা শোনবার জন্য থেমে-থেমে টেনে-টেনে কথা বলাটা স্টেজের একটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেই থামা-থামা টানা-টানা ঘোরানো প্যাচানো কথা বলবার ধরণ সিনেমাতেও শুনবেন, যেখানে পার্ট

মুখস্থ না-করলেই চলে না, রেডিওতেও শুনবেন, যেখানে কাগজ দেখে-দেখে পড়তে হয়। স্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিক কথোপকথনের সুরে সব কথা বলা যায়, সিনেমা আর রেডিওর এটাই মস্ত সুবিধে, চ্যাঁচাতে হয় না, নিঃশ্বাসের সুরে কথা বললেও শোনা যায়, অথচ বাংলা সিনেমা রেডিওর কর্তাদের বোধ হয় ধারণা যে নাটুকেপনা না হ'লে নাটকই হয় না, এমনকি রেডিওর আলোচনায়, খবর-পড়ায় সুদ্ধু কিছু নাটুকেপনা থাকলে ভালো হয়। বিভিন্ন মিডিয়ম বিভিন্ন টেকনীকের দাবি রাখে; স্টেজের, পরদার ও মাইক্রোফোনের নাটক আলাদা-আলাদা ধরনে রচিত ও অভিনীত হওয়া দরকার: বঙ্গরঙ্গমঞ্চের একশো বছর আগেকার গতানুগতিক টেকনীক সিনেমা কি রেডিওর ঘাড়ে চাপালে ফল এই হয় যে প্রত্যেক নাটকই করুণ প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। তাই হচ্ছে আমাদের এখানে প্রতিদিন। বিশেষ এক ধরণের নাটক হ'তে পারে যা রেডিওতেই চমৎকার জমে; আধ ঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় নেবে না (রেডিওতে দু'ঘণ্টার নাটক নিছক বর্বরতা!) অভিনয় ও প্রযোজনায় সেই জিনিসগুলোর উপরই জোর দেয়া হবে যা রেডিওর নিজস্ব বিশেষত্ব। শুনে যেন শ্রোতাদের মনে হয় এ-জিনিস রেডিওতে ছাড়া সম্ভব হ'তো না। কিন্তু এখানে হচ্ছে ঠিক উল্টো: শ্রোতাদের বলা হয়, আপনারা রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট, অভিনেতা অভিনেত্রীর চেহারা ও হাবভাব কল্পনা ক'রে নিন, বাকি সব আমরা জোগাচ্ছি। এমনকি কিছুদিন আগে নাকি সীন ওঠবার ঘণ্টা পর্যন্ত বাজানো হ'তো!

সম্প্রতি ঢাকা ও কলকাতার বেতার কিছু-কিছু ছোটো নাটক ছড়াচ্ছেন; কিন্তু শুক্রবারের বর্বরতা কবে দূর হবে? এ-প্রসঙ্গে একবার ইণ্ডিয়ান লিসনারের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলো যে কম-সময়ের আন্দাজি নতুন নাটক যথেষ্ট পাওয়া যায় না ব'লে বিখ্যাত বাংলা উপন্যাসগুলির নাট্যরূপই রেডিওতে দিতে হয়েছে। কথাটা হাস্যকর, কারণ বাংলাদেশে, আর যা-ই হোক, লেখকের অভাব নেই, এমনকি ভালো লেখকেরও অভাব আজকাল নেই। সত্যি চাহিদা থাকলে নতুন নাটকের অভাব হয় না, নতুন লেখকও দেখা দেয়। আসলে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও এ-বিষয়ে অলস ও খানিকটা মামুলি-ভাবের; নতুন লেখা ও নতুন লেখক খুঁজে বার করবার শ্রমটুকু তাঁরা স্বীকার করবেন না; কিংবা হয়তো তাঁরা সস্তায় বাজি মারতে চান, ভালো লেখার বদলে খোঁজেন কম-মজুরির লেখা। যে-সব জাত-লিখিয়ে না হ'লে উঁচু জাতের লেখা বেরোয় না, রেডিওর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নামমাত্র, আর সেজন্য রেডিওই দায়ী, লেখকরা নয়।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা রেডিওর বিচ্ছেদ সত্যি লক্ষ্য করবার।

শুধু রেডিও শুনে কোনো বিদেশী যদি বিচার করে, তার নিশ্চয়ই ধারণা হবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পর কিছুই হয়নি। আর এ-কথাই যদি ওঠে, রবীন্দ্রনাথের গলাই বা রেডিওতে ক'দিন শোনা গেছে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে যাঁর আসন, এমন একজন আমাদের মধ্যে, আমাদের হাতের কাছেই আছেন, অথচ রেডিও-কর্তারা তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় ক'রে নেবার কোনো চেষ্টাই করেননি। অল-ইণ্ডিয়া রেডিও স্থাপিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে যোগাযোগ-স্থাপন ও রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি, গল্প নাটক পড়া ও কবির নতুন গান শোনানোর ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যেতো, আর সেটা হ'তো সমস্ত পৃথিবীর শোনবার মতো অনুষ্ঠান। কিন্তু এ-বিষয়ে রেডিও পরম উদাসীনতাই দেখিয়েছেন। এতদিনে যদি বা ট্রাঙ্ক-টেলিফোন হ'লো, হ'লো এমন সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখ থেকে কিছু শোনবার আশা আর করা যায় না।

অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও অনেক বিষয়েই বি.বি.সি.-র নকল করেন, শুধু বিশুদ্ধ ভারতীয়ভাবে এড়িয়ে চলেন ওদের আধুনিকতা। লণ্ডন থেকে শোনা যায় শুধু ইএট্‌স-এর, এলিয়ট-এর নাটক কি বর্নার্ড শ'র, ডি লা মেয়ারের কথা নয়, অডেন-ইশরউডের নাটক, ডে লুইসের কথা, এমনকি ডে লুইস **সম্বন্ধে** আলোচনাও শোনা যায়, যদিও ঐ লেখক সবে তিরিশ পেরিয়েছেন। এদিকে কলকাতার রেডিও বোধ হয় জানেন না, কি মানেন না (অবিশ্য না-জানলেই না-মানা সহজ হয়) যে বাংলাদেশে শরৎচন্দ্রের পর কোনো গল্পলেখক কি নজরুল ইসলামের পর কোনো কবি জন্মেছেন; 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নাম দিয়ে যে-সব আলোচনা মাঝে-মাঝে থাকে, তার অনেকগুলিই বঙ্কিম-রবীন্দ্রের কথাতেই শেষ হয়! অবশ্য আধুনিক লেখকের কেউ-কেউ মাঝে মাঝে রেডিওতে বলেন, কিন্তু তাঁদের মুখে স্বরচিত রচনা শোনানোর বা সাহিত্য সম্বন্ধে সরস আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা খুব কমই হয়: তাঁরা যে-সব talk দেন সেগুলির বিষয়ই এমন যে তার মধ্যে ব্যক্তিটিকে প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। কবিতার প্রচারে রেডিও মস্ত সহায় হ'তে পারে, কারণ কবিতা কানে শোনবার জিনিস; কিন্তু যদিও দিল্লি-লক্ষ্ণৌ-লাহোরে উর্দু কবিদের সেকেলে ধরণের মুসায়েরা প্রায়ই হয় (এবং কলকাতা থেকে তা আবার রীলে করা হয়), কলকাতার রেডিওতে কবিতা পড়া হয় কদাচ, আধুনিক কবিতা তো কখনোই নয়। বেশি আর কী বলবো, কলকাতায় আজকাল বইয়ের রিভিয়ু পর্যন্ত হয় না, ভারতের অন্য প্রত্যেক বেতারে হয়। মোটের উপর দিল্লি বোম্বাই লক্ষ্ণৌ ও ঢাকা এ-সব বিষয়ে কলকাতার চেয়ে অগ্রণী সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ কলকাতায় নানাদিকের গুণী লোক যত বেশি আছেন ভারতের অন্য-কোনো নগরে বোধ হয় তা নেই। কলকাতার সুবিধে সব চেয়ে বেশি, তার বেতার ব্যবহার সব চেয়ে কম।

এমনকি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কোনো সচেতনতাও রেডিওর নেই। খবর যে-বাংলায় বলা হয় তা কোনো বাঙালির শুনতে পারা উচিত নয়, ঢাকা থেকে সাধুভাষায় talk মাঝে মাঝে শোনা যায়, আর ঢাকার কোনো-কোনো কথকের যা উচ্চারণ! সাধুভাষায় talk আর কাঁঠালের আমসত্ত্ব একই বস্তু, কারণ talk মানে কথা বলা, এবং সাধুভাষায় কেউই কথা বলে না। কলকাতায় যে-সব talk হয় তাতে বক্তৃতার কি ক্লাশ-পড়ানোর ঢং প্রায়ই ধরা পড়ে, কারণ নামজাদা অধ্যাপক কি বক্তাদেরই এ-কাজের জন্য সাধারণত ডাকা হয়। একেবারে গলাবন্ধ বক্তৃতা, নয় দাদুমণির কি পঙ্কজ মল্লিকের গা-খোলা গা-ঘেঁষা অন্তরঙ্গতা—এ দুয়ের মাঝামাঝি যে-সরস অথচ সংযত বলবার ধরণ, যাতে শিক্ষিত লোক বন্ধুদের মজলিশে কথা বলে, সে-ধরণ কমই শোনা যায়। এর কারণ কি এই যে রেডিওর কর্তারাই সেটা পছন্দ করেন না? এর মধ্যে দু'একজন মহিলার বলার ধরণ বরং ভালো: তার কারণ বোধ হয় এই যে তাঁরা ক্লাশ পড়িয়ে কি সভায় বক্তৃতা ক'রে অভ্যস্ত নন।

অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে অন্তত ভারতীয় অনুষ্ঠানের চাকুরেরা সকলেই পুরুষ। Announcer-এর ও খবর-বলার কাজে মেয়ে নেই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতীয় বেতারেই। সাইগঁ-তে, চুংকিং-এ আছে, পাশ্চাত্য দেশের কথা ছেড়েই দিলুম। পুরুষের গলা সারাক্ষণ শুনতে-শুনতে একঘেয়ে লাগে, অন্তত এইজন্যেও মাঝে-মাঝে মেয়ের গলা দরকার। মস্কৌ থেকে যখন পুরুষের মোটা গলায় আর মেয়ের সরু গলায় পর-পর খবর বলে, তখন বক্তব্য বাদ দিয়েও শুধু বলার ধরনের গুণেই জিনিসটি মনোহর শোনায়। এ-কাজের উপযুক্ত মেয়ে ভারতবর্ষে আজকাল পাওয়া যাবে না এ-কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব। আজকালকার আত্ম-অধিকার-সচেতন মেয়েরা এ-ক্ষেত্রে তাঁদের দাবি জানান না কেন সেটাও আশ্চর্য। রেডিও তো মেয়েদের খুবই উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র।

এত কথা হ'লো; শেষ কথা এই যে আমাদের রেডিওর কি কখনো উন্নতি হবে? কী ক'রেই বা তা হ'তে পারে? তার প্রথম সর্তই অবশ্য এই যে রেডিওর জন্য গবর্মেণ্টের আরো ঢের বেশি টাকা খরচ করবেন। কিছুদিন আগে রেডিও-সংক্রান্ত যে-সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে গবর্মেণ্ট নিজেই স্বীকার করেছেন যে এখন রেডিওর প্রোগ্রামের জন্য ঘণ্টা-পিছু খরচ মাত্র ৩৫৲ টাকা, আর এ-টাকা নিতান্তই কম, কারণ তেমন ভালো কোনো কথক ৩৫৲ টাকায় ১৫ মিনিট কথা বলতেও রাজি হবেন না। সরকারি মতই এই, অথচ কার্যক্ষেত্রে শুনি বাংলা কোনো talk-এর জন্যই ২৫৲ টাকার বেশি দেয়া হয় না, গানে নাকি ৫৲ টাকা থেকে রেট সুরু, তেমন হোমরা-চোমরা গাইয়ে হ'লে ৩৫৲ পর্যন্ত ওঠে, তাও ঘণ্টাখানেক গাইয়ে নেয়। (দিল্লি-বোম্বাইতে গানের হার অনেকটা বেশি ব'লে শোনা যায়।) আবার ইওরোপীয় প্রোগ্রামে খরচের হার বেশি, যদিও ভারতীয় শ্রোতার সংখ্যা যে

অনেক বেশি তা. না-বললেও চলে, এদিক দিয়েও মস্ত একটা অসঙ্গতি আছে। ভারতীয় বেতারগুলো প্রোগ্রাম চালায় মোটের উপর দশ কি এগারোটা ঘণ্টা, তার মধ্যে ঘণ্টা দুই গ্রামোফোনের রেকর্ড দিয়ে মেরে দেয়া হয়, তাছাড়া খবর আছে, সরকারি ফতোয়া আছে; ছাঁকা রেডিও-প্রোগ্রাম মাত্র সাত-আট ঘণ্টায় দাঁড়ায়। (ইওরোপের কোনো-কোনো মহানগরী আজকাল প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই প্রোগ্রাম ছড়ায়, সে-বৈচিত্র্য ও অজস্রতা আমরা কল্পনাও করতে পারিনে।) গবর্মেণ্ট নিশ্চয়ই বলবেন, লাইসেন্স বাড়ুক, তবেই আমরা আরো খরচ করবো, তবেই প্রোগ্রাম বাড়বে ও ভালো হবে। আমরা বলবো, ভালো প্রোগ্রাম দাও, তবেই লাইসেন্স বাড়বে। এ-বৃত্তাকার তর্কের শেষ নেই। তবে এ-কথা ঠিক এখন যে-টাকা খরচ হয় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, আর যেটুকু বুদ্ধি খাটালে এই অল্প টাকারও পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হয় সেটুকু অনেক-ক্ষেত্রেই খাটানো হয় না। ফিল্ম-স্টারদের দিয়ে ফিল্মের কোনো বই অভিনয় করানোয় এক ঘণ্টায় পাঁচ-সাতশো টাকা হয়তো অনায়াসে বেরিয়ে যায়, অথচ ভালো গান, ভালো কথকতা, ভালো লেখার বেলায় হাতের মুঠো অতি কষ্টে একটুখানি খোলে। এই টাকাতেই এর চেয়ে ঢের ভালো প্রোগ্রাম করা যায়, শুধু তার আগে একটু কষ্ট ক'রে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ তা বুঝে নিতে হবে। নিতে হবে লোক-শিক্ষার দায়িত্ব। একটা আনুমানিক পাব্লিক যা চায় নির্বিচারে তা না দিয়ে শুধুই ভালো জিনিস দিয়ে সকলকে শেখাতে হবে ভালো জিনিস চাইতে, ভালো জিনিস ভালোবাসতে। তা না হ'লে ব্যর্থ রেডিও।

বুদ্ধদেব বসু

সংবাদপত্র ও পত্রিকা

গত পঁচিশ বছরের মধ্যে আমাদের জীবনের নানাক্ষেত্রেই অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্য ও রাজনীতিতে আমরা যতটুকুই সার্থক কাজ ক'রে থাকি বা না-ই ক'রে থাকি, জাতীয় জীবনের এই দুই প্রধান ক্ষেত্রেই আমাদের চিন্তা আজ অগুন্তি নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে। চিন্তা ও ভাবনার দিক থেকে আমাদের জীবনে যখন এমন একটা বিরাট বিপর্যয়ের সূত্রপাত, তখন সাহিত্যেও যে তার ছায়া পড়বে এটাই স্বাভাবিক। অনেক ব্যর্থতা, অনেক নৈরাশ্য, অনেক আকাঙ্ক্ষা যেমন আমাদের সাহিত্যকে নাড়া দিয়ে নতুন করে' জাগিয়ে দিয়েছে, আধুনিক জগতে সাহিত্যের যা বাহন সেই সংবাদপত্র এবং পত্রিকার মধ্যেও তা'র কিছুটা আলোড়ন আশা করা হয়তো স্বাভাবিক। অথচ,—পত্র-পত্রিকার জগতে সে আলোড়নের চিহ্ন এতই ক্ষীণ যে আমরা আজ রীতিমতো শঙ্কিত।

সংবাদপত্র

আজকের পৃথিবীটা বড়ই ছোটো; তার এবং বেতারের কল্যাণে সারা জগতের আজ খবর সহজলভ্য। তার উপর গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং দুর্ঘটনা সংখ্যায় অত্যন্ত বেড়ে গেছে। যুদ্ধ আমাদের উপহার দিয়েছে অসংখ্য ism বা মতবাদ, সংগ্রাম-বিরক্ত জগতে যা সহজেই শিকড় গাড়ে। কাজেই খবরের কাগজের চাহিদা যে বাড়বে তাতে আর আশ্চর্য্য কী! কিন্তু চাহিদা বাড়লেও যে সব সময় আমদানি বাড়ে না, আমাদের জীবনে তার অনেক প্রমাণ আছে। সংবাদপত্রের বেলায় কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এর অন্তত খানিকটা ব্যতিক্রম দেখা গেছে।

বাংলা খবরের কাগজের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগই আনা যায়। বলা চলে সংবাদপত্রের ভাষা যথেষ্ট আধুনিক নয়, এবং যথেষ্ট ভালোও নয়। তা ছাড়া বাংলা খবরের কাগজ যে ইংরেজি কাগজের তুলনায় অনেক dull সেকথা না বল্লেও চলে। তা'র প্রধান কারণ দু'টি। প্রথম, খবর সাজাবার যে একটা কায়দা আছে, ইংরেজিতে যাকে বলে news editing সে সম্বন্ধে আমাদের কাগজ-ওয়ালাদের ভাসা ভাসা জ্ঞান আছে মাত্র। দ্বিতীয়, বাংলা সাংবাদিকতায় রিপোর্টারদের আজো যথেষ্ট মান নেই। রিপোর্টিং বলতে আমরা বুঝি কোনো সভায় বক্তৃতা হচ্ছে, সেই বক্তৃতা যথাযথ টুকে নেওয়া। সেইজন্য আমাদের সংবাদপত্রে ইংরেজি খবরের তর্জমা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপাঠ্য বিবৃতি এবং বক্তৃতা ছাড়া পড়বার জিনিষ খুব কমই থাকে। এমন বাংলা কাগজ আছে কিনা জানিনে যেখানে মাইনে করা লোক আছে দেশের বা শহরেরই ভিতরকার নতুন নতুন খবর জোগাড় করে আনবার জন্য। সেহেতু কলকাতার কাগজে কলকাতার খবর কমই থাকে—অবশ্য পুলিশ কোর্টের রিপোর্ট ছাড়া।

আজ যুদ্ধ বেঁধেছে, আন্তর্জাতিক 'পরিস্থিতি' তে লোকের কৌতূহল আজ উগ্র। কিন্তু যুদ্ধ আর কিছু চিরকাল থাকে না। তখন নিজের শহরের খবর পেলে লোকে খুশিই হয়। এইজন্যই যুদ্ধের খবর যখন ঝিমিয়ে আসে তখন খবরের কাগজ পড়বার উৎসাহও লোকের কমে আসে, আর তাই পাঠক গাঁথবার জন্য তৈরি করতে হয়—মেয়েদের বিভাগ, ছেলেদের বিভাগ, সঙ্গীত, ছায়াচিত্র এবং আরো অসংখ্য 'বিশেষ বিভাগে'র টোপ।

কিন্তু অনেক অভিযোগ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে বাংলাদেশের সংবাদপত্র গতিশীল, একেবারে স্থাণু, জরদ্গব নয়। বাংলা কাগজ আজকাল শিক্ষিত লোকেও পড়তে পারে, এর ভাষা আধুনিক না হলেও আধুনিক-মুখী।

খবরের কাগজ আজ যতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তার জন্য অনেকখানি ধন্যবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'কে দিতে হয়। 'আনন্দবাজার' যে এত অল্প

সময়ে এতখানি উঠেছিল, তার কারণ তাদের অগ্রসর নীতি। আনন্দবাজারই প্রথম একথা বুঝেছিল যে খবরের কাগজের জন্যও বাংলা লিখতে হলে, বাংলা জানাই উচিত। ভালো লোককে, অপেক্ষাকৃত ভালো মজুরি দিয়ে ভালো লেখাবার চেষ্টার ফলে কেবল যে 'আনন্দবাজারে'রই লাভ হয়েছে তা নয়। বাংলা সংবাদপত্রের আজ একটা standard দাঁড়িয়ে গেছে, যার নিচে নেমে কোনো কাগজের পক্ষেই আর টিকে থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য 'আনন্দবাজার' যার সূত্রপাত করেছিলো 'যুগান্তর' তাকে প্রথম থেকেই গ্রহণ করেছে বলে' আজকের দিনের সংবাদপত্রের উন্নতির জন্য সে-ও অংশত দায়ী। বাংলা সংবাদপত্রের জগতে আজ একটা রেষারেষির সৃষ্টি হয়েছে যেটা মাঝে মাঝে সেকেলে দুই সতীনের কোঁদলের মতো বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ালেও এর ফলটা হয় তো শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে। সেইজন্যই দেখতে পাই দৈনিকেও আজ সাহিত্যিকদের স্থান হচ্ছে। আশ্চর্য বই কি? এবং আরো আশ্চর্য এই যে দু'খানা দৈনিক তো আজ ভালোভাবে চল্‌ছেই, সুপরিচালিত হলে আরো দু'খানা কাগজ চলবার মতো ক্ষেত্রও আজ তৈরি হয়ে গেছে।

সাময়িক পত্রিকা

খবরের কাগজে যদি বা খানিকটা অগ্রগতির পরিচয় পাই পত্রিকাগুলো যেন ক্রমেই আরো পিছিয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে আজ সাপ্তাহিক আছে অগুন্তি কিন্তু তার প্রায় সবই সিনেমা সম্পর্কিত। তার কারণ সিনেমা-কাগজ-চালাবার সুবিধে অনেক। প্রথমত অভিনেত্রীদের ছবির ব্লক এন্তার বিনে পয়সায় মেলে। তারপর সমালোচনার নামে নির্বিচারে উচ্ছ্বাস ছড়াতে পারলে সমূল্য বিজ্ঞাপনও কিছু পাওয়া যায়। তার উপর বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রী এবং বেকার ও মহিলাদের মধ্যে কুৎসিত সব বাংলা ছবি ছড়ানোর ফলে ব্যাধিটা এখন বেশ তলিয়েছে। ঈষৎ কুরুচির ইঙ্গিত থাকলে অভিনেত্রীদের ছবি ভালোই কাটে। এবং সবচেয়ে যা বড় কথা, এ ধরণের কাগজ চালাতে পারলে সিনেমার পাশ মেলে, এমনকি ট্রেইড্‌শোতেও নেমন্তন্ন পাওয়া যায়। এত লোভ সাম্‌লানো কি সহজ? কাজেই রোজই দুটো চারটে সিনেমা কাগজ জন্মায়—আর জন্মানো মাত্রই আমাদের দেশের যারা ভবিষ্যতের ভরসা তাদের চরিত্র গঠনের কাজে লেগে যায়। এ-ধরণের যত কাগজ আছে তার মধ্যে তারতম্য করার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ সবগুলোই সমান অপাঠ্য। কেউ হয়তো লীলা দেশাইয়ের নামে গদগদ, কারুর বা উপাস্য কাননদেবী।

অবশ্য এর বাইরেও যে সাপ্তাহিক নেই তা নয়। কিন্তু যা আছে তা' এক আঙুলে গোণা যায়। পনেরো কুড়ি বছর আগেও বাংলাদেশে সাপ্তাহিক কাগজের এত দুর্দশা ছিলো না। 'আত্মশক্তি' বা 'বিজলী' মোটামুটি

...লা এবং বাঙালী পাঠকের কাছে সমাদরও পেয়েছিলো। ...র টি'কে থাকে নি, তার কারণ বাঙালী পাঠকের ঔদাসীন্য ... ভালো সাপ্তাহিক চলে না একথা আমি স্বীকার করতে ... যদি সে-রকম কোনো কাগজ সুপরিচালিত হয়েও না ...ে একথা মানা যায়। কিন্তু সম্প্রতি এ রকম চেষ্টা হয়েছে ...চ্ছে না।

...না-কাগজ বাদ দিলে উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক আছে 'দেশ', যার ...টা আধুনিক হলেও অন্তরটা উনিশ শতকের। 'দেশ' সহরে পাঠকের ...ায়া করে' বলে' মনে হয়না। তাই তার মনোবৃত্তিটা মাস্টারী। সাপ্তাহিক সংবাদ, সুনীতিপরায়ণ গল্প এবং গুরুগম্ভীর প্রবন্ধে কলেবর বোঝাই করে' সে মফঃস্বলে গিয়ে হানা দেয়, এবং সেখানে যে সে তারিফই পায় তা অনুমান করা চলে।

আর একখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক হচ্ছে 'সচিত্র ভারত'। "সচিত্র-ভারত" পরিচালকেরা বাংলাদেশে এক নতুন ধরণের কাগজ চালাবার চেষ্টা করছেন, এবং এ-চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। আগাগোড়া হাল্কা সুর বজায় রেখে সংবাদ পরিবেষণ থেকে আরম্ভ করে' সব কিছুই যে করা চলে—এটা তাঁরাই দেখিয়েছেন। রসিকতা, ছোটো গল্প এবং ছবি নিয়ে "সচিত্র-ভারত" অবসর যাপনের বেশ ভালো সঙ্গীই হতে পারতো যদি তার রুচিটা আরো একটু মার্জিত হোতো। হাল্কা মানেই খেলো নয়, একথাটা মনে রাখা ভালো। "সচিত্র ভারতের" যাঁরা পরিচালক অর্থ এবং মাথা-মসলার কোনো অভাবই তাঁদের নেই। তবুও "সচিত্র ভারত"কে তাঁরা একখানা প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক করে তুলছেন না কেন সেটাই আশ্চর্য্য। হাল্কা সুর রেখেও তা করা চলে।

মাসিক ও ত্রৈমাসিক

আমাদের মাসিক পত্রিকাগুলোর অবস্থাও কম শোচনীয় নয়। যে দু'খানা আট আনা দামের দশ হাজারী মাসিক আছে তাদের একনিষ্ঠতা অসাধারণ। পনেরো, কিংবা কুড়ি বছর আগে যে লেখকদের রচনায় এরা "সমৃদ্ধ" হোতো আজও তাঁরাই ভরসা। এমন অনগ্রসর নীতি বজায় রেখে এসব কাগজ যে কেবল টিকে আছে তা নয়, বেশ ভালোই আছে। এদের বাঁধা গ্রাহক কমে না, কেন না মাসিক কাগজ যাঁরা পড়তে চান, তাদের ও ছাড়া আর গতি নেই। তা ছাড়া এমন সর্বজনপাঠ্য পত্রিকা পৃথিবীর বোধ হয় কোথাও নেই। ধর্ম, সমাজ, স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, কবিতা, ফুটনোট ভারাক্রান্ত প্রবন্ধ, ছবি-সম্বলিত ভ্রমণকাহিনী, ঈষৎ 'মাইরি' প্যাটার্ণ ছবি, এবং—সবচেয়ে বড় জিনিষ—প্রচুর গল্প এবং উপন্যাস, সবই এদের আছে। বাংলাদেশে গল্প ভারাক্রান্ত

দু'খানি গল্প-কচ্ছপ মাসিক খা[illegible]তেও ভালো গল্প [illegible] করতে পারেন না, তার কারণ এসব কাগজের পরিচাল[illegible] তাঁরা এমনিতেই এত গল্প পান যে ছেপে উঠতে পারে[illegible] নিচে যদি ছোটো অক্ষরে "গল্প" কথাটি লেখা থাকে [illegible] পাঠক খুশি হন্। ছেলেবেলায় এক রাজার কথা পড়ে[illegible] মুড়ি আর মিছরি এক দরে বিকোতো। বাংলাদেশ কি সেই [illegible]

আসল কথা, বাঙালী পাঠককে এর চেয়ে ভালো জিনিষ দিচ্ছে [illegible] মাত্র 'প্রবাসী'ই এমন মাসিক যার বেশির ভাগ লেখাই অপাঠ্য নয়। [illegible] রবীন্দ্রনাথের লেখা বেরোয় এবং দ্বিতীয়ত রামানন্দ বাবুর সম্পাদকীয় উপ[illegible] বলে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে 'প্রবাসী'ই কিছু চলে; কিন্তু 'প্রবাস[illegible] ভালো হলেও সেকেলে; পঁচিশ বছর আগে যে-সব লেখক প্রবাসীর বৈশিষ্ট্য ছিলো, আজ তারাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভার। 'প্রবাসী' দেখলে মনে হয় বিগত-যৌবনা সুন্দরীর কথা, এককালে যার আকর্ষণ ছিলো দুর্নিবার, কিন্তু এখন আছে শুধু তার ক্ষীণ চিহ্নমাত্র। মাসিকের জগতে আজ একমাত্র আধুনিক, প্রথম শ্রেণীর কাগজ "পরিচয়"। কিন্তু "পরিচয়ে"র মত কাগজ কোনোদেশেই সর্বজনপ্রিয় হয়ে পারে না, এ কাগজ শুধু সংস্কৃতি-পরায়ণ লোকদেরই উপভোগ্য। অপেক্ষাকৃত ছোটো পাঠক-গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও 'পরিচয়' আমাদের সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে একদিন 'সাহিত্য' ও 'সবুজপত্রে'র সঙ্গেই স্থান পাবে এতে সন্দেহ নাই।

এখানে আমাদের শিক্ষিত ধনী শ্রেণীর প্রতি একটি কথা নিবেদন করতে চাই। বাংলাদেশে অসংখ্য মাসিক জন্মেই অকাল মৃত্যু লাভ করছে; কিন্তু এর থেকে প্রমাণ হয় না যে ভালো মাসিক চলে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কয়েকখানা ভালো মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ আজ খুব ভালোভাবেই চলতে পারে। হিন্দিতে যত ভালো পত্রিকা আছে বাংলায় তত নেই এটা আমাদের লজ্জার বিষয়। আজ কোনো শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ধনী অগ্রসর হলে দেশের এ অভাব দূর হতে পারে। একেবারে ভারতবর্ষ-বসুমতীর নকল না করে' (একেবারে নকল হলে' লোকে অভ্যস্ত পুরোনো জিনিষ ছেড়ে নতুন জিনিষ নেবে কেন?) ভালো জিনিষ দিলে তার সমাদর হতে বাধ্য। অবশ্য এ রকম কাগজের পুরোভাগে রাখতে হবে কোনো সাহিত্যিককেই, কেননা চাষা দিয়ে প্রতিমা গড়ার কাজ চলে না।

বাংলা দেশে কাগজ চালানো আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে হয় একটা ছিঁচকে ব্যবসা—মুদি দোকান বা চামড়ার ব্যবসার মতোই—নয়তো সাহিত্যিক-যশ-লোভী অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলেদের সখের জিনিষ। এ-ব্যবসা আজ যাঁদের হাতে, তাঁদের বিশ্বাস, ছাপার জন্য ছাপাখানা, ব্লক তৈরির জন্য বিশেষজ্ঞ এবং

[illegible] দরকার থাকলেও, লেখার [illegible] [illegible]া কয়েক দিনেই গুঁড়িয়ে [illegible] [illegible]খন। এ-ব্যবসাটার দিকে নজর দে[illegible] [illegible]যারা ভাবছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সত্য সাহিত্যিকের [illegible]রে' এ-সমস্যার আংশিক সমাধানের চেষ্টা ক[illegible]ওয়া চলে যদি [illegible] হয়েই বেরিয়েছিলো। [illegible]।

[illegible]ঙালী পাঠক যে আজ একেবারে অনুৎসুক [illegible] নয় [illegible] [illegible]রচয়" আজ দশ বছর চলছে; "চতুরঙ্গের" বয়সও দু'বছর হ'তে চললো, এবং "সমসাময়িক" নামে একখানি অতি-অভিজাত ত্রৈমাসিকও কিছুদিন হোলো ভূমিষ্ঠ হয়েছে। 'চতুরঙ্গে'র মত সুপরিচালিত কাগজ বাংলাদেশে চলবে এটা আশা করা যায়, কিন্তু "সমসাময়িকে"র দুখানা সংখ্যা বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা এখনও তা'র উচ্চতার পরিমাপ করে উঠতে পারিনি। কাগজখানা পড়ে মনে হয় "সমসাময়িক" হচ্ছে বাংলাদেশের মাস্টার মশাই। সর্ববিষয়ে বাংলাদেশকে শিক্ষিত করাই তা'র জীবনের ব্রত। গত ছ'মাসে এক সংখ্যা কাগজ বার করে পরিচালকেরা লিখেছেন যে ভালো লেখার নিদারুণ অভাবের জন্যই তাঁদের এ বিলম্ব। অর্থাৎ লিখবে কে? বাংলাদেশে "সমসাময়িকে"র মত কাগজ পড়বার যথেষ্ট পাঠক আছে একথা মনে করে [illegible] তাঁরা নিজেদের উপর অবিচার করেন নি?

এ-ছাড়া বাংলায় যে আজ দু'খানা কবিতার কাগজ চলছে এটা এ[illegible] মস্ত সুলক্ষণ। মাসিকের পাদপূরণের গ্লানি থেকে অব্যাহতি দিয়ে কবিতাকে যাঁরা নিজস্ব আসন দিতে চেষ্টা করছেন তাঁরা আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। "কবিতা" ত্রৈমাসিক তো ছ'বছর পেরুলো, এটা বাংলাদেশের পক্ষে গৌরবের কথা। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথমে 'কবিতা'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন, সম্প্রতি তাঁর সম্পাদনায় "নিরুক্ত" নামে যে ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্রিকা বেরিয়েছে আশা করা যায় সে-ও বাঙালী পাঠকের কাছ থেকে সমাদর পাবে।

ছোটদের পত্রিকা

বাংলাদেশের সাময়িক পত্রিকার মধ্যে ছোটোদের কাগজগুলোর অবস্থাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো। "মৌচাক" "রামধনু এবং "রংমশালে"ই তবু পড়বার মতো দুটো একটা লেখা চোখে পড়ে। ভালো লেখকরা বড়দের চেয়ে ছোটোদের কাগজেই যেন বেশি লেখেন, বোধ হয় সেখানেই তবু কিছু মূল্য পাওয়া যায়। ছোটোদের কাগজের আরো একটা আশাপ্রদ লক্ষণ এই যে গ্রাহক গ্রাহিকাদের মোটামুটি ভালো লেখাও এতে মাঝে মাঝে বেরোয়। এর থেকে বোঝা যায় বাঙালী ছেলেমেয়েরা আজ কাল বাংলা লিখ[illegible] শিখছে।

কিন্তু এ ... ভর অভিযোগ এ-সব পত্রিক
আনতে হচ্ছে। ... বাংলাদেশের ছেলেমে
বানিয়ে ছাড়বেন না। "দিদিভাই" "দাদাভাই" "
কী? বড় বড় ইস্কুল কলেজে পড়া ছেলেমেয়েরা নেকু
ফলাও করে তাদের নাম ছেপে তার জবাব দিতে হবে?
নাম ছাপার অক্ষরে গ্রাহক-গ্রাহিকারা দেখতে চায় এটা বুঝি।
যখন ছাপা যায় না, তখন নাম ছাপবার এটাই সহজ উপায় কিন্তু
কি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে না? "আনন্দবাজারে"র "আ
মেলাতে"ও দেখি গ্রাহক গ্রাহিকাদের নাম দেড় কলম জুড়ে থাকে। তা
উপর বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে যাদের জন্য এ-পৃষ্ঠা তাদেরকে পাঠ্য পরিবেশণ
করা হয় নাম মাত্র। সব কাগজেই দেখি কেবল ছেলে মেয়েদের 'মেলা'-ই
বসেছে। এ 'মেলা'য় ছোটোদের মগজটুকু হারিয়ে না যায়।

সমাপ্ত

... ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলকাতা থেকে বুদ্ধদেব বসু
প্রকাশিত ও ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেসে
ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক মুদ্রিত।